

# বিশ্বাসঘাতক

নারায়ণ সান্যাল





If the moon, in the act of completing its eternal way round the earth, were gifted with self-consciousness, it would feel thoroughly convinced, that it would travel its way of its own accord on the strength of a resolution taken once for all. So would a Being, endowed with higher insight and more perfect intelligen-

ce, watching man and his doings, smile about the illusion of his, that he was acting according to his free will.

Thou sawest the fierce strife of creatures, a strife that wells forth from need and dark desire. Cherishing these, thou hast served mankind all through a long and fruitful life, spreading everywhere a gentle and free thought in a manner such as the seers of thy people have proclaimed as the ideal.

*The Golden Book of Tagore : Ed : Ramananda Chatterjee, Cal. 1941.*



Gandhi is unique in political history. He has invented an entirely new and human technique for the liberation struggle of an oppressed people and carried it out with the greatest energy and devotion.

A leader of his people, unsupported by any outer authority : a politician whose success rests not upon craft nor the mastery of technical

devices, but simply on the convincing power of his personality; a victorious fighter who has always scorned the use of force; a man of wisdom and humility, armed with resolve and inflexible consistency, who has devoted all his strength to the uplifting of his people and the betterment of their lot; a man who has confronted the brutality of Europe with the dignity of the simple human being, and thus at all times risen superior.

Generations to come, it may be, will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth.

We are fortunate and should be grateful that fate has bestowed upon us so luminous a contemporary—a beacon to the generations to come.

*On the occasion of Gandhiji's seventieth birthday in 1939, later published in OUT OF MY LATER YEARS, New York, 1950.*



পৃথিবী পরিভ্রমণের ক্ষমতা যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাহলে সে কী প্রত্যয়ে এই সিদ্ধান্তেই আসত যে, সৃষ্টির প্রথম প্রকৃতির তরীকায় অনুসরণে সে যেভাবে এভাবেই চলতে থাকবে। প্রতিমহাবৎ—অর্থাৎ যিনি অতর্পূর্ণ সম্পন্ন, বিপুল প্রকারে অধিকারী—তিনি মানুষ আর তার কৃত্যকে গুরুত্বপূর্ণভাবে লক্ষ্যে রাখতেন। আমাদের বৈজ্ঞানিকচর্চায় ও জগতের মাঝে সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তিনি সহায়তদান। কুমি প্রত্যক্ষ করেছি জীবের

হৃদয়শক্তি—অতএব আর নীরস্ত কামনার উপস্থিতিতে যে সংগ্রাম তার অনিবার্য নিয়তি। কুমি তোমার বোধ দিয়ে তা উপলব্ধি করেছি, তারপর তোমার কর্মের দীর্ঘ জীবনে সেবার মাধ্যমে মানুষকে দেখিয়েছি মোহমুক্ত মুক্তির সরল পথ। আদর্শ মহাপ্রাণীর মতো—যে জাতের দোষী শুধু তোমার দেশেই সম্বৎ।

[‘যে গোষ্ঠেন কুক অব টেমার’ : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 1931]

ব্রাহ্মণীয়ের ইতিহাসে গান্ধী একমেবাবিতীতম। নির্দোষিত সমাজের জন্য তিনি আবিষ্কার করলেন একটি সম্পূর্ণ নতুন মানবিক পদ্ধতি। অপরিণীত উদ্যোগ আর নিষ্ঠায় দেখালেন তার প্রয়োগকৌশল।

এই জননায়ক কোনদিন কোনও বহির্বিক্তর সাহায্যপ্রার্থী নন। তিনি রাজনীতিশিল্পী অথচ কোন কপটতা অথবা কারিগরি-কৌশলে লাত করেননি তার সাফল্য। চরিত্রবলই তাঁর একমাত্র হাতিয়ার।

হিন্দুর প্রতি তাঁর আন্তরিক যুগ। চরিত্রে তাঁর প্রজ্ঞা আর বিনয়ের সহায়তদান। সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা আর অনমীয় বিশ্বাস নিয়ে তিনি স্বদেশবাসীর উন্নতিবিধানে নিয়োজিত করেছেন সর্বশক্তি। কবে ঐক্যবন্ধনে ইউরোপের সামরিকতার বিরুদ্ধে, একটি সরল মানুষের আত্মবিশ্বাস সম্বল করে, আর তাতেই তিনি সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী।

হয়তো অসামান্য প্রজ্ঞা বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে, এমন একজন বক্তৃতা-মানে গড়া মহামানুষ একদিন পৃথিবীতে হেঁটে-চলে বেড়াতেন।

আমাদের সৌভাগ্য, নিয়তির কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে, এমন একজন ইতিমানবের সঙ্গে আমরা একই কালে পৃথিবীদারী করে গেলাম—এমন একজন মানুষ যিনি অন্যায় অত্যাচার প্রজ্ঞার কাছে আলোকবর্তিকাক্রমে প্রতিভাত হতে থাকবেন।

[গান্ধীজীর সত্ত্বতীতম জন্মদিনে 1939 সালে রচিত প্রত্যর্থা, পরে ‘আউট অব মাই লেটার ইয়ার্স’, (নিউ ইয়র্ক, 1950) গ্রন্থে সংকলিত]



। এই 'কৈফিয়ৎ'টি আমি গ্রহণ করার পরে লিখেছিলাম 13.1.78 তারিখে। ঐতিহাসিক কারণে এটি অপরিবর্তিত আকারে ছাপা গেল। কিন্তু এ-গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ আঠারই মে 1978-এর পরে। ফলে এখন এই 'কৈফিয়তের একটি কৈফিয়ৎ' অনিবার্য হয়ে পড়েছে। ]

বাঙলা সাহিত্যে সাধারণ-বিজ্ঞান বা 'পপুলার-সাইন্স'-এর বই ইদানিং বড় একটা নজরে পড়ছে না। তার পিছনে আছে একটা বিবচন। সৌন্দর্য লেখেন না, কারণ দৃষ্টান্ত ছাপেন না, কারণ লাইব্রেরী ফেনেন না, কারণ পাঠক পড়েন না। তা-ছাড়া ইংরেজি ভাষার তুলনায় বাঙলা ভাষার পাঠক-সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য—তাদের একটা বিরাট অংশে বিজ্ঞানে উৎসুক নন। ফলে বিজ্ঞানের বই যা লেখা হচ্ছে তা পাঠ্যপুস্তক। না পড়লে পরীক্ষায় পাশ করা যায় না। সাহিত্যের বই অধিকাংশই অবসর বিনোদনের জন্য। যারা এ-দুটি বিষয়কে মেশাতে পারেন তাঁরাও সে চেষ্টা করেন না এই বিবচনের ভয়ে।

দুটি ব্যতিক্রম ব্যতী এ-কাহিনীর প্রতিটি চরিত্রই ব্যতী। সৌজন্যবোধে যে দুটি নাম আমি পরিবর্তন করেছি তার উল্লেখও 'পরিশিষ্ট-ক'তে দেওয়া হয়েছে, এছাড়া ঘটনার পরিবেশ, কথোপকথন ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে কল্পনা করে নিতে হয়েছে, কিন্তু বাস্তবতাকে কথাসাহিত্যের খাতিরে কোথাও আমি অতিক্রম করিনি। দশ-সারোটি স্মৃতিচারণ, জীবনী, বিজ্ঞানগ্রন্থ ও সরকারী রিপোর্ট এ-গ্রন্থে বর্ণিত বোধহয় ততখানি অধিকারও প্রয়োগ করিনি। শুধু একে স্ট্রীক্‌ বিদ্যুতি অবশ্যজারী হয়ে পড়েছে তার স্পষ্ট নির্দেশও গ্রহণেই দেওয়া হল।

পাঠকের সুবিধার জন্য দুটি তালিকা আমি যুক্ত করেছি। প্রথমত, গ্রন্থের শেষে একটি ক্যালান্দরমিক সূচী। কথাসাহিত্যের খাতিরে অনেক সময় অনেক ঘটনা আমাকে আগে-পিছে বলতে হয়েছে। পাঠকের যাতে কালভ্রান্তি না হয় তাই ঐ তালিকাটি। দ্বিতীয় তালিকাটিও গ্রন্থের শেষে দেওয়া হল। তার কৈফিয়ৎ দিই : এ-কাহিনীর সব চরিত্রই বিদেশী। বিদেশী নাম যে-স্থানানে দেওয়া হয়েছে হয়তো স্বদেশে তাঁদের নাম সে-ভাবে উচ্চারিত হয় না। প্রথমত অনেক বিদেশী নামের উচ্চারণ বাঙলা বর্ণমালাতে প্রকাশই করা যায় না, দ্বিতীয়ত বিদেশী ভাষা জানা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে আমাকে আশ্বাজে নামগুলি বাঙলা হরফে লিখতে হয়েছে। তাই এই তালিকার নামগুলি সাজিয়েছি ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে এবং যে স্থানানে তাঁরা এখানে উল্লেখিত হয়েছেন, তাও জানিয়েছি। প্রায় আড়াই ডজন নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত চরিত্র এ কাহিনীতে অংশ নিয়েছেন—তাঁদের নামের পাশে তারকাচিহ্ন দেওয়া আছে।

'পারমাণবিক শক্তি' ব্যাপারটির সম্বন্ধে আমাদের ভাষা-ভাষা ধারণা আছে। হিবোসিমা এবং নাগাসাকিতে তার নাককীত কাণ্ডকারখানার কথাও শুনেছি। কিন্তু মোক্সা ব্যাপারটা যে কী, তা আমরা জানতাম না। জানার প্রয়োজনও এতদিন বোধ করিনি। বা ছিল একান্ত গোপন তার অনেকটাই আজ জনসাধারণকে জানতে দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা-রাশিয়া-ব্রিটেন-ফ্রান্স ও চীন—পৃথিবীর পাঁচ পাঁচটি দেশ এ শুধু জেনে ফেলেছে, আটম-বোমা ফাটিয়েছে। বিদেশী ভাষার পপুলার সাইন্স জাতীয় বইয়ে এ আলোচনা দেখছি। বাঙলা ভাষায় সে আলোচনা আমার নজরে পড়েনি। গত পঁচিশ-বিশ বছর

এ-বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম—তা দুনিয়ার অনেক বৈজ্ঞানিক-তাণ্ডার বিষয়েই তো কিছু জানি না, কী ক্ষতি হয়েছে তাতে!—ভাবখানা ছিল এই। এতদিনে মনে হচ্ছে—ক্ষতি হয়।

এই 'কৈফিয়ৎ' লিখছি মোমবাতির আলোয়। বিজলি নেই। লোভশেভিৎ শুধু কলকাতায় নয়, ভারতবর্ষে নয়। পৃথিবী আজ অন্ধকার হতে বসেছে। কয়লার ভাঁড়ার ক্রমশঃ 'বাড়ল' হয়ে উঠছে, পেট্রোলের ভাঁড়ে 'মা ভবানী'-র পদধ্বনি শোনা যায়। কথায় বলে : 'বসে খেলে কবেকের ধনও একদিন ফুরায়।' পৃথিবীর অবস্থাও আজ তাই। দুনিয়ার অগ্রসর দেশগুলি তাই আজ শক্তির সম্মানে ইতি-উত্তি চাইছে—সূর্যালোকের শক্তি, জোয়ার-ভাটার শক্তি, পৃথিবীর আত্মকরীণ শক্তি এবং বিশেষ করে পারমাণবিক শক্তি।

যুদ্ধোত্তর ইংলেণ্ডে 'ক্যালডেন হল' সাফল্যমণ্ডিত হবার পর যেট ব্রিটেন একসঙ্গে অনেকগুলি পারমাণবিক শক্তি-প্রকল্পে হাত দিয়েছিল। বাটের দশকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকরা অগ্নি করেছিলেন—পরের দশকে ব্রিট-ব্রিটেনে ব্যবহৃত বিদ্যুৎশক্তির এক-তৃতীয়াংশ এ-ভাবেই পাওয়া যাবে। সে প্রকল্প কতদূর সাফল্যলাভ করেছে তার খবর আর পাইনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭২ সালে ছয়শত বিলিয়ন ডলারের চেয়েও বেশী খরচ করেছে নুতন শক্তি-উৎসের সম্মানে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ২৪টি পরমাণু-প্রকল্প ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে, ৪৭টিতে কাজ চলছে, আরও ৬৭টি পরিকল্পনার জন্য অর্ডার গেছে। একমাত্র গুরু-রীক প্রকল্পেই সেখানে পারমাণবিক শক্তির সম্মানে ব্যয় হবে শতাব্দী কোটি ডলার। মার্কিন সরকার আশা রাখেন ১৯৮০-র ভিতর যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ব্যবহৃত বিদ্যুৎশক্তির (৩.৭ লক্ষ মেগাওয়াট) ত্রিশ-শতাংশ ওয়া পারমাণবিক-শক্তি থেকে পাবে। কয়লা-বিদ্যুতের চেয়ে পরমাণু-বিদ্যুতের দামও নাকি পড়বে কম। রাশিয়া বা চীনের কথা জানি না, কিন্তু যে ভারতবর্ষ জগৎসভায় 'শ্রেষ্ঠ আসন লবে' বলে কুলে থাকতে কোরাস গান গাইতুম তার খবর কী! ১৯৭৭ সালে ডক্টর ভাবার সভাপতিত্বে পরমাণু-শক্তি কমিশনের প্রথম সভা হয়েছিল, তারপর রিসার্চ রিঅ্যাকটর 'অলরা'র উদ্বোধন হল, 'জারলিনা'র জন্ম হল, রাজস্থানে পরমাণুকেন্দ্র স্থাপনের একটি প্রকল্প শুরু হয়েছে, ট্রেনেতেও কাজ হচ্ছে বলে জানি। আজকের সংবাদপত্রে নারোয়ার চতুর্থ পরমাণু কেন্দ্রে শিলন্যাস হবার খবরও ছাপা হয়েছে—কিন্তু আসল কাজ কতদূর হয়েছে জানি না। যেটুকু জানি, তা হচ্ছে এই—মোমবাতির আলোয় এই কৈফিয়ৎ লিখছি। এটুকু বুঝি যে, আজ যদি আমরা চিত্তবিক্ষেপে বিদ্যুৎ-বাহিত রেলওয়ে এঞ্জিনের পরিবর্তে অবার বয়লার এঞ্জিন বানাবার চেষ্টা করি, পেট্রোল, কোলগ্যাস, কয়লা, কেরোসিন, রেডির তেল, কাঠ থেকে ধাপে ধাপে নামতে নামতে মা ভগবতীর অকুপণধানের ভরসায় বসে থাকি তবে আমাদের ন্যতি-প্রনতির কপালে পুণঃ আছে।

আজ তাই মনে হচ্ছে, গত পঁচিশ বছরে পারমাণবিক শক্তির বিষয়ে কোনও যোজ্ঞ-ব্যব না নিয়ে কাজটা ভাল করিনি। আর সেইজন্যই আপনাকে বলব—এ বইটি যদি না পড়েন তো না পড়লেন, কিন্তু আপনাকে যদি পড়েন তবে পাতা বান দিয়ে পড়বেন না।

আপনার 'প্রনতির' সোহাই।

around snags

## আশীর দশকের কৈফিয়ৎ

গ্রন্থরচনার দশ বছর পরে এই কৈফিয়ৎটি সংযোজন করা প্রয়োজন বোধ করছি। প্রথম প্রকাশকালেই গ্রন্থটি অধ্যাপক হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার গৃহান্মতিতে উৎসর্গীকৃত। দ্বিতীয় কথা, এ গ্রন্থের অষ্টো কাল কাঙ্ক্ষনিক চরিত্র। কোনও বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই।

আর একটি কথা। বিদেশী নাম এবং বৈজ্ঞানিক শব্দ বাঙলা-হরফে প্রকাশ করা খুব কঠিন; যদি লেখকের সেই ভাষাজ্ঞান বা বিশেষ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট পড়াশুনা না থাকে। ফলে, প্রথম প্রকাশকালে অনেক বিদেশী বৈজ্ঞানিকের নাম আমি বাঙলা হরফে ত্রিকমতো লিখতে পারিনি। সাহা ইন্দ্রচাঁটের অধ্যাপক রাজকুমার মৈত্র, সি. আর. এন. ও অধ্যাপক অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রজন ভট্টাচার্য স্বতঃপ্ররোচিত হয়ে এই জাতীয় ত্রুটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে অসীম কৃতজ্ঞতাশাশে আবদ্ধ করেছেন। অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক শ্রান্তিও তাঁদের কল্যাণে এবারে সংশোধন করা গেল।

নারায়ণ সাম্যাল

14.4.84





चित्र—(विज्ञान, एक ही दृष्टि (राम कलाकर्म))



জি. ডি. উডাল [ব্রিটিশ]  
1856-1940 [লো: পৃ: 1906]



মাক্স মার [জার্মান]  
1858-1947 [লো: পৃ: 1908]



ই. হামারফোর্ড [ব্রিটিশ]  
1871-1937 [লো: পৃ: 1908]



ফ্রান্স লে [জার্মান]  
1879-1960 [লো: পৃ: 1914]



অটো হান [জার্মান]  
1879-1968 [লো: পৃ: 1944]



জেমস ডায়ে [ব্রিটিশ]  
1882-1964 [লো: পৃ: 1925]



নীলস বোর [দেনেমার]  
1885-1962 [লো: পৃ: 1922]



জেমস চ্যান্ডলিও [ব্রিটিশ]  
1891-1974 [লো: পৃ: 1935]



হ্যারল্ড উরে [ব্রিটিশ]  
1833-1981 [লো: পৃ: 1934]



লেব জিলবার্ট  
1898-1964

[জার্মান]



১৯০০-১৯৫৮ [জার্মান]  
1900-1958 [জাঃ পূঃ 1945]



এনারকো ফার্মি [ইতালিয়ান]  
1901-1954 [জাঃ পূঃ 1938]



হাইডেনবোর্গ, ভাবলু [জার্মান]  
1901-1976 [জাঃ পূঃ 1932]



উইলবার্ড, হ. সি [জার্মান]  
1902—[জাঃ পূঃ 1963]



জিলাক সি [ব্রিটিশ]  
1902-1984 [জাঃ পূঃ 1932]



হাল কোথ [মার্কিন]  
1906—[জাঃ পূঃ 1967]



জ্যোনেইমার, জে [মার্কিন]  
1904-1967.



শ্রীমতী অধ্যাপক অটো হার্নের সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে কাজ করছেন 'প্রিভি-শিয়া' মেইটনার — 1933-এর আন্দোলনচিত্র।



হার্নের মেয়ে কুই [1867-1934, নোঃ পৃঃ 1903, 1911]  
কর মেয়ে আইরিন বিজ্ঞানসাহিত্যিক [1897-1956, নোঃ পৃঃ 1935] সারাজীবন  
'জেনিটিক-থ্যাকটিক' পদার্থ নিয়ে কাজ করার জন্যই ক্যাম্বোজে মারা গান। ছোট মেয়ে  
ইড [1904— ] বিজ্ঞানসাহিত্য করেমনি। তিনি বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ।





बाबा व मूई मिलित बालक माताका जवाना टिमोर 'विद्यालयवातावरण'



কে ?

পনেরই সেপ্টেম্বর ১৯৪৫।

অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে মাত্র একমাস আগে। ইউরেনিয়াম-বোমা-বিধ্বস্ত হিরোসিমা আর মুটেনিয়াম-বোমা-বিধ্বস্ত নাগাসাকির ধ্বংসাবশেষ তখনও সন্ধ্যায়ে যাবনি। জার্মানী, রাশিয়া, ফ্রান্স অথবা আপনাদের অধিকাংশ জনপদ মৃত্যুপূর্বীতে অপভ্রান্ত। বিশ্ব এক মহাশূন্য। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ পৃথিবীতে এতবড় ক্ষয়ক্ষতি আর কখনও হয়নি। সেই মহাশূন্যে শুধু গোনা যায় মিত্রপক্ষের বিজয়োদ্ভাসের উৎসব-ধ্বনি—যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে মাসেচুক শিবাকুলের উদ্ভাস।

শ্রিয়-পরিজনদের নিয়ে প্রান্তরশে বসেছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ স্টিমসন। ওয়াশিংটনের অনতিদূরে হাইহোম্পে, তাঁর বাড়ির ‘ডাইনিং হল’-এ। অশীতিপর রিক নন, হেনরী, এল. স্টিমসনের বাস ডিন-আলী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবীণ সমরসচিব—সেক্রেটারি অফ ওয়ার। এ বিশ্বযুদ্ধে ছিলেন আমেরিকার সর্বমুখ্য কর্তা। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের আমলের লোক—এই বয়সেও অবসর নেননি কর্মজীবন থেকে। নেবার সুযোগও হয়নি। তাঁকে এতদিন অব্যাহতি নিয়ে উঠতে পারেননি রুজভেল্টের ফলতিবিক্ত নৃতন প্রেসিডেন্ট—হারী ট্রুম্যান। অস্বস্তি যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

তা সেই বৃদ্ধ এতদিনে শেষ হল। এবার ছুটি মালী করতে পারেন বটে স্টিমসন। বিলম্বমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র আমেরিকার দৃশ্যে কোন লড়াই হয়নি—কতি হয়েছে, প্রচণ্ড ক্ষতি, আর্থিক এবং জনবলে; কিন্তু আমেরিকার মাটিতে কোন বস্ত্রপাত ঘটেনি। এজন্য নিশ্চয় অভিনন্দন মালী করতে পারেন যুদ্ধসচিব। শুধু তাই বা কেন? এ-যুদ্ধের যা চরম ডিভিডেন্ড—আগামী বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের টেকা—সেটা খেলার শেষে রয়ে গেছে তাঁরই আঙিনের তলায়। এটা যে কতবড় প্রাপ্তি তা শুধু তিনিই জানেন; আর বোধকরি জানেন—মহাকাশ।

হঠাৎ অনুধাবন করে বেছে উঠল টেলিফোনটা। স্টিমসন মুখ তুলে তাকালেন না। ছুরি-কাঁটার যেমন ছিলেন তেমনিই ব্যস্ত রইলেন। ট্রেনে নিলেম জোড়া প্যাচ-এব স্ট্রেটা। আবার কোথাও বিজয়োৎসবের আমন্ত্রণ হবে হয়তো। এখন ঐ তো পিড়িয়েছে একমাত্র কাজ। অর্কেন্টা-নাচ-টোস্ট আর পারম্পরিক পৃষ্ঠ-কণ্ঠস্ব—কম্মিউনিস্টস্ আর কনগ্র্যাচুলেশন্স। ঠাণ্ড নাওনি উঠে নিয়ে টেলিফোনটা ধরল, জানালো গৃহস্থামী প্রান্তরশে বাস। পরনুপন্থেই চমকে উঠল মেয়েটি। টেলিফোনের ‘ক্যা-মুখে’ হাত চাপা নিয়ে ফিসফিসিয়ে ওঠে। গ্র্যাণ্ড-প্যা। হটস্ ফ্রান্ হিম।

হিম। ছুরি-কাঁটা নামিয়ে রাখলেন স্টিমসন। এতো সর্বনামের সর্বজনীন ‘হিম’ নয়, এ আহ্বানে লেগে আছে হোয়াইট-হাউসের হিন্দীতল স্পর্শ। টেলিফোনের সঙ্গে যুক্ত ছিল অনেকখানি বৈদ্যুতিক তার—তাঁই পর্বতকেই এগিয়ে আসতে হল মহামুগ্ধ কাছে। যুদ্ধসচিবকে আর উঠে যেতে হল না। ন্যাপকিনে মুখটা মুখে নিয়ে যন্ত্রবিবরে শুধু কবলেন: স্টিমসন।

—আপনাকে প্রান্তরশের মাঝখানে বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত। একবার দেখা হওয়া মরকার। আসতে পারবেন?

—শ্যুওর। বলুন কখন আপনার সময় হবে?

—এখনই!

—এখনই! কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো...মানে, এখনই আসছি আমি।

—ধন্যবাদ।—লাইন কেটে নিলেন হারী ট্রুম্যান।

শিতার বয়সী প্রবীণ রাজনীতিককে প্রেসিডেন্ট ব্যারবরই কাগেট সম্মান দেখিয়ে এসেছেন। তাহলে এভাবে কথাই মাথখানে কেন লাইন কেটে দিলেন উনি? লৌহমানব পোড়খাওয়া স্টিমসন বুঝতে পারেন—ব্যাপারটা জরুরী, অত্যন্ত জরুরী। না হলে এতটা বিচলিত শোনাতে না প্রেসিডেন্টের কর্তব্য। কিন্তু কী হতে পারে? তৎকালীন পৃথিবীতে আজ এমন এমন কী ঘটনা ঘটেছে পারে যাতে অ্যাটম-বোমার একচ্ছত্র অধিকারী আমেরিকার প্রেসিডেন্টের গলা কাপবে? কী এমন দুঃসংবাদ আসতে পারে যাতে বিজ্ঞানী যুদ্ধসচিবকে অধীভূত আত্মরশ্মির টেবিল ছেড়ে উঠে দৌড়ে ছাড়া হয়?

সেই পরিচিত কক্ষ। পরিচিত পরিবেশ। সামনের ঐ গদি-আটা চেয়ারখানায় টুমানের পূর্ববর্তী কজডেন্টকেই শুধু নয়, আরও অনেক অনেকেও ওভারে বসতে দেখেছেন প্রবীণ স্টিমসন—এমনকি প্রথম যৌবনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অস্ত্রে উড়িয়ে উইলসনকেও।

গরে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। প্রেসিডেন্ট সৌজন্যসূচক সজ্জাবশেষ দ্বারা ঘিরেও গেলেন না। কয়েকো ঘণ্টাওটা আজ সু-প্রযুক্ত মনে হয়নি তাঁর কাছে। মনে হল তিনি বাস্তবিক উত্তেজিত। স্টিমসন তাঁর চেয়ারে ভাল করে শুঁড়িয়ে বসবার আগেই প্রেসিডেন্ট বলে ওঠেন, মিস্টার সেক্রেটারি! আপনি গোয়েন্দা গল্প পড়েন? কোনান ডয়েল, অগাধা ক্রিস্টি?

স্টিমসন নির্বাক।  
হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন টুমান। মীরকে পছন্দ রাখা শুরু করেন ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। স্টিমসন যেন লিংগং বেগা দেখছেন। একবার এদিকে ফেরেন, একবার ওদিকে। হঠাৎ পদচারণায় ক্ষান্ত নিয়ে প্রেসিডেন্ট বলে ওঠেন, আজ সকালে কানাডার রাষ্ট্রদূত আমাকে একখানি চিঠি দিয়ে গেছে। প্রাইম মিনিস্টার ম্যাকেনজি কিং-এর ব্যক্তিগত পত্র। আনি... আনি জড়িত হয়ে গেছি সেখানে পড়ে...

জড়িত হয়ে গেলেন স্টিমসনও। সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তিনি মনে মনে ভাবছিলেন—এই বিশ্বরাজ্যলিন নয়, চাটিল নয়—শেষ পর্যন্ত ম্যাকেনজি কিং! তাহেই এই বঙ্গভাষা দুনিয়ার একচ্ছত্র অধীশ্বর হাবী টুমান এতটা বিচলিত।

প্রেসিডেন্ট নিজ আসনে এসে বসলেন। বললেন, আপনি অবসর চাইছিলেন; কিন্তু এ ব্যাপারটাও ফায়ালো না হওয়া পর্যন্ত...

—কিন্তু ব্যাপারটা কী? কী লিখেছেন প্রাইম মিনিস্টার ম্যাকেনজি কিং?  
—একটা গোয়েন্দা গল্প। অসমাপ্ত কাহিনী। এ শতাব্দীর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনীর প্রথমার্ধ।

সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন মেলোড্রামটিক লাগল বাস্তববাদী স্টিমসনের কাছে। বললেন, বেশি চাঠিখানা?

টুমান টেবিলের উপর থেকে সীলমোহরযুক্ত একটি ভাটী খাম তুলে নিলেন। বাড়িয়ে ধরলেন স্টিমসনের দিকে। বললেন, মানহটান-প্রজেক্টের গোপনতম তথ্য ওয়া বার করে নিয়ে গেছে।

স্টিমসন জড়িত। অক্ষুণ্ণে বলেন: মানে?

—ইয়েস, মিস্টার সেক্রেটারি। এতক্ষণে হ্যাভো মস্তার বৈজ্ঞানিকেরা তা নিয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা করছেন।

বলিরেখাকৃত উন্মত্ত হাতটা ধীরে ধীরে নেমে এল স্টিমসনের। একটু নুকে পড়লেন সামনের দিকে। যেন এইমাত্র একটা .22 মাপের সীসের গোলকে বিদ্ধ হয়েছে বুকের শীর্ষভাগ। কঠিনে ওঠেন তিনি। বাট হাউ অন আর্থ কুড ম্যাকেনজি কিং নো ইউ?

ইন্টারকমটাও আর্ডনাদ করে উঠল। প্রেসিডেন্টের একান্ত-সচিব নিশ্চয় কোন জরুরী সর্বোদ্যোগে চান। কিন্তু জুকেপ করলেন না টুমান। পুনরায় বাড়িয়ে ধরলেন মোটা খামটা। বললেন, এটা পড়লেই বুঝবেন। নিন দরুন।

আদেশটা বোধহয় কানে যায়নি স্টিমসনের। গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেছেন তিনি। কপালে বেগেছে ভ্রুজ্ঞন। গোলা জানলা দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে বহুবুরে। প্রেসিডেন্ট পুনরায় বলেন: ইয়েস,

মিস্টার সেক্রেটারি! বিন্স অলসো রিসেয়ার্স একর্শন।

‘অলসো’। অর্থাৎ ইমিডে প্রেসিডেন্ট বুদ্ধিতে নিলেন—এ কোন বুঝাভাবী উক্তি নয়, ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিমাত্র। আর যে-ই তুলে থাক, যুদ্ধসচিব স্টিমসন তুলতে পারেন না ঐ উদ্ধৃতিটা। ঠিক ঐ চেয়ারে এসে আমেরিকার আর এক প্রেসিডেন্ট ঠিক ঐ কথা-বটাই বলেছিলেন একদিন। 1939 সালের এপ্রিলই জুলাইন। সেদিনও মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে ছিল এমনি একটি ভাটী খাম। সেবার সে পত্রখানি এসেছিল লঙ্ক-আইল্যান্ডে পরবাসী শুভকেশ এক বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে। স্থান আর কালের পরিচিত-কাটাকটি সেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকটি সেদিন মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধানকে সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ‘ইউরেনিয়াম পরমাণুর কুলকুলসিকারীকে জাগ্রত করার মহাসম্ভাবনা সম্ভবস্থিত!’ প্রেসিডেন্ট কজডেন্ট সেই উদ্বিগ্নানি ঠিক এমনি ভঙ্গিতে বাড়িয়ে ধরেছিলেন তাঁর মিলিটারী এ্যাটাশে জেনারেল ‘পা ওরটিনসের দিকে। অতি সংক্ষেপে শুধু বলেছিলেন: পা। বিন্স রিসেয়ার্স একর্শন।

আজ ছয় বছর পরে সেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিটাই পুনরুজ্জীবিত করলেন কজডেন্টের উত্তরসূরী হাবী টুমান। তাই ঐ ‘অলসো’। সেবার নির্দেশ ছিল সমুদ্র মধ্যন্তরে। সুদূরবর্তী মনোনে সমুদ্র মধ্যন্ত হলেছিল লন্ডন। তাই ‘আজ আমেরিকা বিশ্বরাস’। এবার আশেপাশ হল সেই সমুদ্রমধ্যন্তে উঠে আসা—না অমৃতভাও নয়, হল্যুৎ-অপহারককে খুঁজ বার করতে হবে!

অদ্বীতিশর তৎকালীন যুদ্ধসচিব তাঁর বলিরেখাকৃত হাতটি বাড়িয়ে দিলেন এবার। গ্রহণ করলেন। এই ব্যক্তিই।

এটিনেই। হটাচারেক পরে। ওয়ার অফিসের সামনে এসে ধাঁড়াল ছোট্ট একটা সিট্রন গাড়ি। পার্কিং জোনে গাড়িটি রেখে পিস বিতে বিতে নেমে আসে তার একক চালক। শ্রয়ত্রিশ বছর বয়সের একজন মার্কিন সামরিক অফিসার—কর্নেল প্যাশ। বুদ্ধিলাভ উজ্জ্বল চেহারা। সুগঠিত শরীর। সেখানেই মনে হয় ভীষনে সাক্ষ্যের সন্ধান সে পেয়েছে এই বয়সেই। তা সে সত্যই পেয়েছে। এফ. বি. আই-সের একজন অতি দক্ষ অফিসার। পদমর্যাদার প্রথম শ্রেণীর না তা বলে। কর্নেল প্যাশ ইতিপূর্বে বহুবার এসেছে ওয়ার অফিসে, যুদ্ধ চলাকালে। নানান দালায়। কিন্তু স্বয়ং যুদ্ধসচিবের কাছ থেকে এমন সরাসরি আশ্বাস সে ভীষনে কখনও পায়নি। পাওয়ার কথাও নয়। যুদ্ধসচিব এবং কর্নেল প্যাশ-এর মতবাদে-চার পাচটি ধাপ। ওর ‘বল’ কর্নেল ল্যান্ডডেলকেই কখনও যুদ্ধসচিবের মুখোমুখি হতে হয়নি। ওয়ার-সেক্রেটারির অধীনে আছেন চীফ-অফ-স্টাফ জেনারেল জর্জ মার্শাল। প্রয়োজনে বরাং তিনিই তাকে পরামর্শেন এফ. বি. আই-সের প্রধান কর্মকর্তাকে, অর্থাৎ কর্নেল ল্যান্ডডেল-এর ‘বল’কে। তাঁর নামটা আজও জানে না প্যাশ। চোখেও দেখেনি কোনদিন। ইচ্ছাকৃত যেমন চোখে সেবা যায় না, এক-এক বেশে তাঁর এক এক অভিনা—এফ. বি. আই-সের প্রধান কর্মকর্তাও যেন অনেকটা সেইরকম। সবাই জানে তিনি আছেন। বাস, ঐটুকুই। এ-ভাবেই যুদ্ধ-মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ বজ্জিত হত যুদ্ধসচিবেরাধীনীর। আজ স্বয়ং যুদ্ধসচিবের এডিকং ওকে টেলিফোন করায় তাই একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল কর্নেল প্যাশ। আজ হয়ে বলেছিল, আপনি ঠিক কখনেছেন তো? আমাকেই ঘোরে বলেছেন? ব্যক্তিগতভাবে?

—হ্যা, আপনাকেই। ঠিক দুটোর সময়।

—যুদ্ধসচিব নিজে ডেকেছেন?

—হ্যা, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?

কর্নেল প্যাশ শুভকেশ টেলিফোন করেছিল তার উপরওয়ালার কাছে। কিন্তু কর্নেল ল্যান্ডডেলকে করতে পারেনি তার অফিসে। অসত্যা গাড়িটা বার করে চলে এসেছিল যুদ্ধ-মন্ত্রকে। দুটো বাজার আর বাকিও ছিল না বিশেষ।

চতুর্থা সিটি নিয়ে উঠে আসতেই সেবা হয়ে গেল কর্নেল ল্যান্ডডেল-এর সঙ্গে। বড়ো গ্রাম আসে প্যাশ-এর। বলে, আরে, এই তো আপনি এখনে! আপনার অফিসে ফোন করে—

—জানি। রেডিও-টেলিফোনে ওরা আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল।

—কিন্তু কী ব্যাপার? হঠাৎ আপনাকে আর আমাকে—

যন্ত্রাঙ্গলিভের মত শিরশ্চালন করলেন চাঁচ। তাঁর জ্যাঁটাচি-কেস থেকে একটা মোটা খাম বার করে টেনিলের উপর রাখলেন। বললেন : সুখাব্দটা আমরা ভ্রেনেছি কানাডার প্রধানমন্ত্রী ম্যাকেল্লি কিং-এর একটি ব্যক্তিগত পত্র থেকে। তারিখ গতকালের। চিরিহানা ব্রেসিডেন্ট শেষেছেন আজ সকালে। চিরিহানা সঙ্গে আছে কানাডা-গুপ্তচর বাহিনীর প্রধানের একটি প্রাথমিক রিপোর্ট এবং রাশিয়ান-একাদশ

ডাইর গণেশমহাশয়ের একটি ইতিহাসও করে বলেন, মানহাটান-প্রকল্পে কয়েকশত এ জাতের গাভী কাজ করেছেন; কিন্তু তাঁদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক পদার্থবিজ্ঞানীকে আমরা প্রতিটি বিভাগে চূড়ান্ত অনুমতি দিয়েছিলাম। কলে তাঁরা নিজ নিজ বিভাগের সংবাদই রাখতেন। সব বিভাগের সব কাজ জানতে পারেননি। আপনারা জানেন, মানহাটান প্রকল্পের অধস্ত দশটি প্রধান শাখা তিন-চার হাত



মাইল দূরত্বে ছড়ানো ছিল। এমন একটি বিশেষত্ব তৈরী করতে হলে এই দশটি কেন্দ্রের অত্যন্ত সাতটিব খবর তাঁকে জানতে হয়েছে—সেই সাতটি কেন্দ্র হচ্ছে—কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, হানফোর্ড, শিকাগো, ওক রিজ, ডেট্রয়েট এবং লস এ্যাংলস। এমন ব্যাপক জ্ঞান সংগ্রহ করতে পেরেছেন দুইমের কয়েকজন মাত্র, গরন দশ-পনের জন। তার বেশী কখনই নয়।

—আপনি কি দ্বারা করে সেই দশ-পনের জনের নাম আমাদের জানাবেন?

—জানাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার পূর্বে আমি বলে রাখতে চাই কোন সন্দেশের কণবর্তী হয়ে আমি কিছু কারও নাম বলছি না। ঐসের প্রত্যেককেই আমি বৈজ্ঞানিক হিসাবে গ্রহণ করি এবং বিশ্বাসভাজন বলে মনে করি। এটা নিছক 'অ্যাকাডেমিক ডিসকাল্পন'—অর্থাৎ আমি উচ্চারণ করছি সেই কয়জন বিশেষী বৈজ্ঞানিকদের নাম, যারা ইচ্ছা করলে এমন একটি গোপন নবী প্রচ্ছন্ন কন্যার ক্ষমতা রাখেন। অর্থাৎ কোন কোন বিদেশী বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান এই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে—আর কিছু নয়।

—নিশ্চয়। আমরা বুঝছি, এ কোন 'অ্যাকাডেমিক' নয়। বসুন?

—হাফেরিয়ান পদার্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে আছেন তিনজন—জন নহমান, হুজিয়ার্ড এবং টেলার, রাশিয়ান দুজন—মার্ক কিসিয়ারকোভি এবং কোবিনোভিচ, জার্মানীর তিনজন—বিচার্ড হাইনম্যান, হাল বেসে, এবং জেন্স স্ট্রাঙ্ক। এছাড়া অস্ট্রিয়ান ডিট্র ওয়াইসব্রক, ইটালীর ফেরি, ব্রিটিশ জেমস চ্যাডউইক এবং ডেনমার্কের নীলস বোর। এই ব্যয়েজন।

বুড স্টিমসন দু-হাতে মাথা রেখে ঠোঁট বুজ বসেছিলেন। তিনি যে দুইমের পড়েননি তার সমস্ত পাওয়া গেল যখন হঠাৎ তিনি আপনমনে বলে ওঠেন, ও গড! ছোয়াট এ অ্যাক্সিমিসেস্ট লিস্ট টু ফাইন্ড আউট এ ট্রেইটার।

ডব্লিও ওপেনহাইমার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, বোগ হোর পার্ভান স্যার?

—বলছিলেন কি, এই ব্যয়েজনের কত পার্সন্টি নোবেল-লরিফেট?

—প্রায় ফিফটি পার্সন্টি স্যার! পাঁচজন।

—আপনি তো এই সঙ্গে প্রফেসর আইনস্টাইনের নামটা করলেন না ডব্লিও?

—না। তার কারণ, প্রফেসর আইনস্টাইন কোনদিন মানহটান-প্রজেক্টের কাটাডায়ের বেলা পাব হ'ননি। না হলে মানহটান প্রকল্পের চূড়ান্তত্ব অটপাতার ভিতর সাক্ষিয়ে দেখার ক্ষমতা আরও অনেকের কাছে। জার্মানীর অত্যন্ত পাঁচজন বৈজ্ঞানিক সে ক্ষমতার অধিকারী—প্রফেসর গট্টো হান, ম্যাক্স বর্ন, ম্যাক্স ওয়াইসব্রক, অথবা হাইজেনবের্গ। হয়তো আপনাদের প্রফেসর নিশিচ ও পড়েন।

—আই নী। বাই দ্য ওয়ে ডব্লিও—এবার যে নামগুলি বললেন তার কত পার্সন্টি নোবেল-লরিফেট?

—এই পাঁচজন জার্মান বৈজ্ঞানিকদের ভিতর চারজনই নোবেল-প্রাইজ পেয়েছেন স্যার।

বুড নিশপনে শুণু মাথা নাড়লেন। আবার জোশ দুটি ঝুঁকে দেল ঠীরে।

—এনি মোর কোয়েশেন?—প্রশ্ন করেন চীফ।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় কর্নেল শ্যাশ। সর্বকনিষ্ঠ সে—বসে এবং পরমর্শাণ। বলে, মাফ করতেন, কিন্তু বিশপোর্টের এই লাইনটা তো 'রেড-হেরিং'ও হতে পারে?

—কোন লাইনটা? আর 'রেড-হেরিং' বলতে—?

—এ যে বলা হয়েছে ডেব্রটারের মাতৃভাষা ইংরেজি নয়, ওটা হয়তো ওয়া ইচ্ছে করেই লিখেছে। ভেবেছে, যদি-কখনও-এ দলিলটা আমাদের হাতে পড়ে তবে আমরা কোনদিনই আর প্রকৃত অপরাধীকে ঝুঁজে পাবো না।

কেউ কোন জবাব দেয় না। এমনটা আপৌ হতে পারে কিনা সবাই তা ভাবছে।

জেনারেল মার্শাল বলেন, এমন কথা হঠাৎ মনে হল কেন তোমার? তুমি কি এই ব্যয়েজনের সঙ্গে কোন ইংরাজ বা আমেরিকানের নাম যুক্ত করতে চাইছ?

—নো নো স্যার। নট এক্সক্লুসিভি।—সলজ্ঞ বলে কর্নেল শ্যাশ।

বুড সম্বসতিব আবার জোশ খুললেন। বললেন, ইয়ামান, তোমার কথার মধ্যে কিছু একটা ইঙ্গিত ছিল! তাছাড়া এই ব্যয়েজনের লিস্টটাও কেমন যেন অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছে আমার কাছে। বাইবেলের

নির্দেশ তা নয়! তুমি আর কিছু বলবে?

দুচক্রে মাথা নাড়ে শ্যাশ। নো স্যার। আর...আই উইথড্র। বিভবনায় চুপাঠ।

জা থেকে বেরিতে নিচে নেমে এসে কর্নেল ল্যাংগডেল বলে, তুমি বেমজা অরন একটা কথা বলে বসলে কেন হে?

শুনায় লাল হয়ে ওঠে শ্যাশ। বলে, কী জানি। ও কথা বলা বোঝায় বেকমিই হয়েছে আমার।

—তা হয়েছে। এসব জায়গায় ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়।

ওরা দীরপনে এগিয়ে আসে পার্কিং জোন-এর কাছে। শ্যাশ গাড়িতে উঠতে যাবে হঠাৎ একটি অফিসার এসে বলে, এককিউজ মি। আপনাকে অব্যাহত উপরে ডাকছেন।

—কে ডাকছেন?—চমকে ওঠে কর্নেল শ্যাশ।

—বুডসচিব।

অতঃপরে কর্নেল ল্যাংগডেলও চলে গেছে। এ কী ঘটনা! আবার কেন? বাধা হয়ে আবার ফিরে আসতে হল। সেই ঘরেই। ঘর এখন প্রায় শূন্য। বসে আছেন শুণু দুজন। বুডসচিব সিংমন এবং এক বি. আই. চীফ। সসন্ত্রমে অভিবাদন করল কর্নেল শ্যাশ।

—টেক ইয়ের। সীট স্লিভ—বললেন বুড।

উপবেশন তো নয়, ডেজারের গাঠে আঙ্কলম্পর্ণ করল শ্যাশ।

চীফ বললেন, এবারে বল। হঠাৎ ও কথা মনে হল কেন তোমার?

—জামি...মানে, আমার স্যার ও-কথা বলা বোঝায় ঠিক হয়নি।

—বি ক্যানডিড কর্নেল। ডব্লিও ওপেনহাইমার যদি নীলস বোর, হাল বেসে-র নাম বলতে পাবেন, তবে তুমিই বা এত ইতস্ততা করছ কেন? কোলও ইংরেজি-ভাষীর নাম কি মনে পড়েছিল তোমার? হঠাৎ পূর্ণপ্রতিতে শ্যাশ তাকিয়ে দেখল এই অজ্ঞাতনামা লোকটির দিকে। ওর চীফ-এর দিকে।

গম্ভীরভাবে বলল, ইয়েস স্যার।

—কী নাম তার?

—ডব্লিও ওপেনহাইমার।

চীফ একবার অশাস্তে তাকিয়ে দেখলেন বুডসচিবের দিকে। বুড নির্বিকার।

—তুমি এবার যোতে পার।—বললেন চীফ।

কর্নেল শ্যাশ শুনায় অভিবাদন জানিয়ে বেধিয়ে আসে।

বুড বুডসচিব একপল শীফের দিকে ফিরে বললেন: শ্যাশ গড! দ্যাট ম্যাড গাই ডিডট মেনশেন মাই নেন, অর দ্যাট অল হ্যারী মুয়ান।

পরদিন সকালে জেনারেল প্রোভন্স নিজেই এলেন বুডসচিবের দফতরে। একখানি ফাইল বুডের সামনে মেলে করে বললেন, শ্যেপটিন অফ রোগলেকশন একটি সেবে দিন।

—কিসের শ্যেপটিন?

—প্রাটমিক-এনার্জি এসপ্যারোমেন্ট ব্যাপারে আমরা এক বি. আইকে কোন কোন বিষয়ে তামত করে দেখতে বসব।

—পড়ে যান, শুনি।

—প্রথমত—মানহটান এন্টিনিয়ালিং প্রজেক্ট থেকে আরো কোন গোপন তথ্য বেরিয়ে গেছে কিনা। গিয়ে থাকলে, কতদূর খবর পাচার হয়েছে। দ্বিতীয়ত—কে বা কে-কে এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তৃতীয়ত কানাডার প্রধানমন্ত্রীর পত্রের মাধ্যম। চতুর্থত, বিশ্বাসঘাতক কী পরিমাণ উৎসাহ গ্রহণ করেছে এবং পঞ্চমত, কোন বিশেষী সরকার এই শুণ্ডচর্যুতিতে উৎসাহ জুটিয়েছে।

—আমার তো মনে হয় ঠিকই আছে।

কাগজখানিতে অনুমোদনসূচক সই করে ফেরত দিলেন বুডসচিব। তারপর বললেন, বাই দা ওয়ে



की ?

13. 10. 11

পঠক আমাদের মত করবেন। এ পর্যন্ত লড়ে যদি আপনার মারণা হয়ে থাকে যে, আমি একটি জবর  
গোয়েন্দা-কহিনী তৈরি-কেনেছি, তাহলে আমি নাচ্য। আর না। এটি আসী গোয়েন্দা-গল্প নয়।  
এ-কাহিনীর আশ্রয় বাস্তব। যে বিশ্বব্রহ্মত বৈজ্ঞানিক ঐ গোপন তথ্য প্রসিয়ার পাচার করে মেন ঠিক  
নাম, ধাম, ঠিকার বিচারের নিষেধ ইত্যাদি একমিন ও-সব দেশে সাক্ষর্যে সবাদমপত্রের পঠ্য হাশা  
হয়েছিল। হয়তো আপনারাও নজরে পড়েছে তা। অপরদীর্ঘ পরিচয় যখন আগেভাবেই সবাই  
জেনে বলে আসেন তখন এটি গোয়েন্দা-গল্প হবে কোন হিসাবে।

হ্যাঁ! ইমানের সঙ্গে আমি একমতঃ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এতবড় গুপ্তচর-বৃত্তির নজির আর নেই। কিন্তু তাই বলে গ্রন্থিণ যুদ্ধসচিবের সঙ্গে আমি আটো একমত নই—এই গুপ্তচর-বৃত্তির আর্থিক মূল্যমান দু-হাজার বছরে সূনে-আসলে 'ত্রিশ ডুকাট যত রুবলস্' হয় ততখানি মোটেই নয়। অনেক আক-জোক করে আমি যে ইকোলেশ্যনটা পেয়েছি তা  $x(x-10^9)=0$ । সূর্যজননারেই বুঝবেন তার অর্থ হতে পারে দু-জাতের। কোয়ান্টাটিক ইকোলেশ্যনটার দুটো 'রুটস্'। এক হিসাবে এ গুপ্তচর-বৃত্তির আর্থিক মূল্যমান=বিলিয়ন ডলার। টেন-শু দি পাওয়ার নাইন ডলার্স। প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা।

দ্বিতীয় হিসাবে এর মূল্যমান শেফ : শূন্য।

আপনি কোন্ অভাবগুলি মেনে নেন তা আমি সকৌতুকে লক্ষ্য করব।

প্রথমে বলি—ঐ বিলিয়ান ডলারের হিসাবটা কেমন করে সেলাম।

সে হিসাবটা কুন্ততে হলে প্রথমেই জানতে হবে 'আটম' বা পরমাণু ভিনিসটা কী। তার পরের  
কণ—সেই পরমাণু থেকে কেমন করে 'পারমাণবিক বোমা' বানানো হল। সে প্রায় অর্ধশতাব্দীর  
ইতিহাস।

৪৮৯।

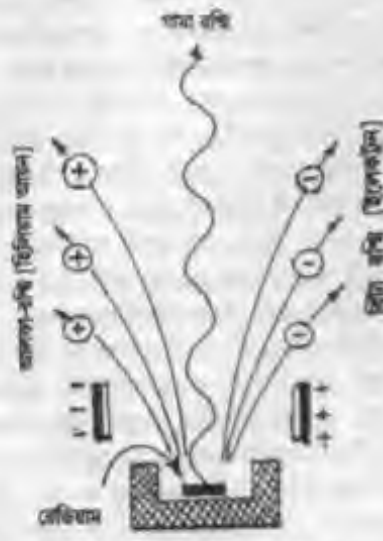
গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস থেকে শুরু করে গত শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় বাইশ-তেরিশ শতাব্দী ধরে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, প্রতিটি মৌল পদার্থের পরমাণু নিরেট, অবিভাজ্য এবং অপরিবর্তনশীল। যে-কোন মৌল পদার্থের—হা বা ক লোহা কিংবা সোনারকি যদি আমরা টুকরো টুকরো করতে থাকি তবে এমন একটা সূত্রাতিসূত্র পর্যায়ে পৌঁছাব—যা শুধু নয়, মানসিক ধারণায়—যখন তাকে আর ভাঙা যাবে না। সেটাই হচ্ছে লোহা বা সোনার পরমাণু। সেটা অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু নিরেট, একটা মার্বেলের গুলির মত—হাতে আছে ঐ লোহা বা সোনার মৌল ধর্ম। পরমাণু যে নিরেট নয়—এ-কথার প্রথম ইঙ্গিত দিলেন গত শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার জে. জে. টমসন। কেমব্রিজের ক্যাথোডিক ল্যাম্বার্টেরিতে পরীক্ষা করে তিনি বললেন যে, পরমাণু নিরেট নয়, তার ভিতর অসংখ্য গুটি অংশ আছে। মাঝখানে আছে কেন্দ্রস্থল বা নিউক্লিয়াস এবং বাইরের দিকে ঘূর্ণমান কিছু ইলেকট্রন। তাঁর শিষ্যছাত্রী লর্ড হাবারফোর্ড ঐ একই ল্যাম্বার্টেরিতে আবিষ্কার করলেন কেন্দ্রস্থলের 'প্রোটন' এবং তার চোদ্দ বছর পরে হাবারফোর্ড-এইই শিষ্য জেমস চ্যাডউইক একই গবেষণাগারে আবিষ্কার করলেন 'নিউট্রন'। দিনেমান পণ্ডিত বীলস বোর বিভিন্ন পরমাণুর রূপরেখার সম্বন্ধে ধারণা দিলেন। এসব কথা আমরা পরে ধাপে ধাপে আবার আলোচনা করব। এখন মোক্কা কথাটা বলে নিই, যাতে পরমাণুর আকৃতি সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা করে নিতে পারি। যদিও সঠিক ধারণা করা অসম্ভব।

5

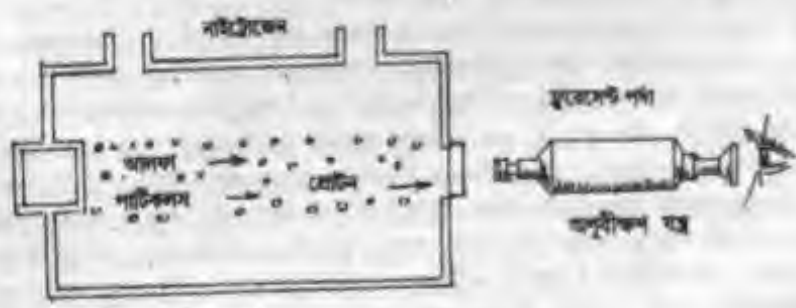




করেছে। নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত কোন ধনাত্মক-বিদ্যুৎচার্ড অংশ বিমুক্ত হয়েছে। উনি তার নাম দিলেন প্রোটন। অর্থাৎ ঠর হিসাব মত দাঁড়ালো—পরমাণুতে আছে দুটি অংশ: কেন্দ্রস্থলে ধনাত্মক



চিত্র ১



চৌম্বিক-আকর্ষিত পদার্থ

চিত্র ২

বিদ্যুৎচার্ড প্রোটন এবং তার বাইরে টন-ব-সাহেব-বর্ণিত চক্রাবর্তনকারী ইলেকট্রন। রাদারফোর্ড তাঁর এ পরীক্ষায় ঐ দুটি অংশকে গুণক করেছেন। অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যন্তর বিদীর্ণ হয়েছে। বস্তুতপক্ষে পরমাণু-রাজ্যে সেই হল প্রথম বিপ্লব।

অ্যাটম-বোমা বানানোর সর্বপ্রথম ধাপ!

তখন কিন্তু সে-কথা কেউ করেনই করেনি। তাই এ আবিষ্কার গোপন করার কথা কারও মনেও আসেনি। প্রফেসর রাদারফোর্ড তৎক্ষণাৎ তাঁর পরীক্ষার ফলাফল ছাপিয়ে ফেললেন। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে তা ছাপা হল বিভিন্ন দেশে—জার্মানিতে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, জাপানে। বিজ্ঞানের কাঁখে তখনও রাদারফোর্ডের জোয়াল চাপেনি। বিজ্ঞানের নাকে রাষ্ট্রনায়কেরা তখনও মড়ি পরায়নি। বিশ্ববিজ্ঞানের দ্বার তখন ছিল উন্মুক্ত, অব্যবহিত।

কিন্তু একটা কথা। পরীক্ষাতে রাদারফোর্ড দেখলেন—ঠর যন্ত্রের ভিতর যা পড়ে আছে তা অধিকাংশই অক্সিজেন! নাইট্রোজেন নয়। এমনটা কী করে হল তার ব্যাখ্যা উনি সে সময় দিতে পারেননি। রাদারফোর্ড এই পরীক্ষাটি করেছিলেন ১৯১৭-এর শেষার্ধ্বে। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে। পরীক্ষায় যখন তথ্য হয়ে আছেন—যুদ্ধ তখনো চলছে—তখন ঠর এক সহকারী এসে মনে করিয়ে দেয়,—স্যার! যুদ্ধমন্ত্রকে একটা ভক্তব্রী অধিবেশনে আজ আপনার যাওয়ার কথা—

ঠর ঐ ছয় ইঞ্চি লম্বা যন্ত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে তখন ঝুল হয়ে আছেন সাতচল্লিশ বছর বয়সের আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। ঠা-হাতটা তুলে শুধু বললেন, গোল কর না—

মারখার বিষয়ে যুদ্ধমন্ত্রকে বিজ্ঞানীদের কনফারেন্স। যুদ্ধ-সচিব, প্রধান সেনাপতি সবাই থাকবেন। সেখানে অনুপস্থিত থাকার মানে একটা যুদ্ধাপরাধ! আধঘণ্টা পরে সহকারীটি আবার মনে করিয়ে দেয়,—স্যার! এখানে অক্সিজেন কোথা থেকে এল সেটা কাল দেখলে হয় না? যন্ত্রে-নিবদ্ধরাষ্ট্র রাদারফোর্ড একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা শুধু বলেছিলেন, মাই বয়! মাই নেম ইজ 'আর্নেস্ট'।

ভক্তব্রী মিটিং-এ অনুপস্থিত তালিকায় লেখা হল একটি নাম—ডক্টর আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। যুদ্ধমন্ত্রীর বিশেষ সংবোধন পরদিন কেমব্রিজে এসে হানা দিল। বেশ কড়া মেজাজে কৈফিয়ৎ তলব করল রাদারফোর্ড-এর। তখনও তিনি ব্যাবন হননি— লর্ড রাদারফোর্ড নন, প্রফেসর রাদারফোর্ড। সামরিক অফিসারটিকে রাদারফোর্ড নাকি বলেছিলেন, আস্তে কথা বলুন মশাই। আমি এখন একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করছি।

আরও বলেছিলেন, আমার এ পরীক্ষা ইজিত দিলে পরমাণুকে বিভক্ত করা সম্ভব। তার অর্থ আপনার মাথায় ঢুকবে না, আপনার বক্তৃতাকে শুধু বলবেন— আমার অনুমান সত্যি হলে এই ল্যাবরেটরির ভিতর আজ যেটা খটছে তা একটা বিশ্বযুদ্ধ জয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিছু বুঝলেন? নিম্নেই নিজেই ধাতুর হেলমেট ভেদ করে সামরিক অফিসারটির মস্তিষ্কে ব্যাপারটা ঢোকেনি। তা না ঢুকুক—কেমব্রিজ ক্যাডেটশ-ল্যাবরেটরিতে ঢুকলে আজও দেখতে পাবেন টাঙানো আছে একটি নোটস: টুক সফটলি মীজ।

—'আস্তে কথা বলুন, মশাই!'

পরের বছর, জুন মাসে 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত হল রাদারফোর্ড-এর প্রবন্ধ। একটা নতুন নিগমিত দেখা দিল। প্রমাণিত হল—যুগযুগান্ত বরে মানুষ যা কল্পনা করে এসেছে, সেই আদিম আলোকমিষ্টরা যে স্বপ্ন দেখেছেন, তা নিত্যস্থায়ীকায়ুরি না-ও হতে পারে। লোহাকে সোনা নয়, রাদারফোর্ড নাইট্রোজেনকে ত্রপাঙ্করিত করেছেন অক্সিজেন-এ। কী করে করেছেন তা অবশ্য বোঝা গেল না। কিন্তু করেছেন।

আরও একটা প্রকল্পের জবাব পাওয়া গেল না। 'কাওণ' ছাড়া 'কার্য' হয় না—যন্ত্রী ছাড়া যন্ত্র বাজে না।





মার্বেল-টপ্ টেবিলে হাতির ঠোঁড়ের মত অদ্ভুত-বর্নন লম্বা লম্বা টান দিয়ে পেনসিলে আঁক কয়েতেন অধ্যাপক আর ছাত্রের দল। ক্যাণ্ডিনের ম্যানেজারের উপর কর্তৃপক্ষের কড়া তত্ত্ব ছিল—অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত লেখাগুলো ফেন না মুছে ফেলা হয়। কখনও কখনও মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কফি-বার খুলে রাখতে হত ম্যানেজারকে। বসে বসে হাই তুলত। আঁক শেষ হয়নি, এই অজুহাতে। আবার এমনও হয়েছে পরদিন এসে দেখা গেছে ইতিমধ্যে কোনও অজ্ঞাতনামা কফি-সেবী অসমাপ্ত আঁকের বাকি কটা ধাপ লিখে রেখে গেছেন।

“সে এক অদ্ভুত জগৎ।”

এইযুগে গাটেনগেন-এর ছাত্র ছিলেন এমন কয়েকজন ভবিষ্য-বিজ্ঞানী যারা এই পরমাণু-বোমা নির্মাণে নানাভাবে অংশ নিয়েছেন। কেউ প্রত্যক্ষভাবে, কেউ পরোক্ষভাবে—আবার কেউ কেউ সেই কালিগাসের ধারার দ্বন্দ্ব : ‘নেই তাই বাচ্ছ, থাকলে কোথায় শেতে!’—অর্থাৎ তাঁরা পরমাণু-বোমা নির্মাণে কোন অংশ না নিয়েই এ নটিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অবতীর্ণ। মার্কিন মূল্যুকের ওপেনহাইমার, ইটালির এনরিকো ফের্মি, রাশিয়ার লর্ড গ্যামো, হাঙ্গেরীর এডিলার্ড আর টেলার নিয়েছিলেন প্রত্যক্ষ ভূমিকা। আর কালিদাসী ধারার দ্বন্দ্ব অংশ নিয়েছিলেন জার্মানীর হেইজেনবার্গ, ওয়াইৎসেকার, ভন লে, অটো হান প্রভৃতি—অ্যাটম-বোমা না বানিয়ে। কেন? তা মধ্যসময়ে বলব।

শেখোক্ত মলের মধ্যে বয়রজোষ্ঠ এবং সর্বজনপ্রিয় ছিলেন নোবেল-লরিয়েট অটো হান। হাইজেনবার্গের ঠার ছাত্র-স্থানীয়, বয়সে অনেক ছোট। অদ্ভুত প্রতিভাশালী। জীবনে কখনও কোন প্রতিযোগিতায় গুণিত্য হননি। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি প্রফেসর নীলস্ বোর-এর প্রধান শিষ্য হয়ে পড়েন, চম্বিশ বছর বয়সে কোপেনহেগেন-এ অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ছাব্বিশে লিপজিগে পুরোপুরি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে তিনি নোবেল-প্রাইজ পেয়েছিলেন—শুধু তাই নয়, যে আবিষ্কারের জন্য এ-পুরস্কার তাকে দেওয়া হয় সেটা তিনি সম্পন্ন করেছিলেন ঠার পঁচিশ বছর বয়সে। যখন অধিকাংশ বিজ্ঞানী ডক্টরেটও করে উঠতে পারেন না।

এই নিরুদ্বিগ্ন শান্ত-জনপদে দুমকোতুর ধূসর ছায়াপাত ঘটল উনিশ শ’ ত্রিশ-বত্রিশে। জার্মানীর ভাগ্যাকাশে দেখা দিল ন্যাপনাল সোসালিস্ট দল—যার কর্ণধার নাকি কে এক অজ্ঞাতকুলশীল আডল্ফ হিটলার। বছর না ঘুরতেই শোনা গেল ন্যাপনাল সোসালিস্ট দলের নাম হয়েছে নাৎসী পার্টি, তারা জার্মানীর শাসনযন্ত্র দখল করেছে। হিটলার হয়েছে জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা। এই সঙ্গে শোনা গেল একটা অদ্ভুত কথা : জার্মানীর সব সমস্যার মূলে নাকি আছে ইহুদি-সম্প্রদায়। শুরু হয়ে গেল ইহুদি-বিতাড়ন পর্ব, জার্মানী থেকে। বার্লিনে এক বিজ্ঞান-পরিষদের বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হল আলবার্ট আইনস্টাইনকে। হিটলারের দেহবন্দ্য একদল পণ্ডিতসম্মত বললে—আইনস্টাইনের এই আপেক্ষিকতাবাদ আসলে একটা ইহুদি গালাবাজি।

হিটলারের ক্ষমতা দখলের মাসখানেকের ভিতরেই গাটেনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত হল একটা মারাত্মক টেলিগ্রাফ। সাত-সাতজন প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপককে পদচ্যুত করা হয়েছে। অপরাধ—তাঁরা ইহুদি। সেই সাতজনের একজন হচ্ছেন ম্যাক্স বর্ন। ইংল্যান্ডে চলে গেলেন তিনি।

প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেল গাটেনগেন। তারপর শুরু হল আবেদন-নিবেদন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ইহুদি অধ্যাপকদের চলে যেতে হল। বাইশজন প্রকৃতিমন্ডা আর্থ-বিজ্ঞানী একবার শেষ চেষ্টা করলেন গণ-দরবাণ্ড পাঠিয়ে—তার ভিতর ছিলেন আর্থ-জ্ঞান নোবেল লরিয়েট। হিটলারের দপ্তরে পৌঁছে সেটা সোজাসুজি চলে গেল ঝেঁড়া-কাগজ-ফেলার কুড়িতে।

প্রথমশ্রেণীর ইহুদি অধ্যাপকদের মধ্যে একমাত্র রেহাই দেওয়া হল জেমন্ ফ্রাঙ্কে। বোম্বকরি তিনি সদা নোবেল-প্রাইজ পাওয়ার। কিন্তু আভিজাত্যের মর্যাদায় অধ্যাপক হাত হিটলারের এ নাকিশ্য গ্রহণ করলেন না। পদত্যাগ করলেন তিনি—কারণটা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে : যেহেতু বর্তমান সরকার জার্মান-ইহুদিদের দেশের শত্রু হিসাবে গণ্য করেছেন তাই তিনি অব্যাহতি চান।

তৎক্ষণাৎ গৃহীত হল ফ্রাঙ্কের পদত্যাগ-পত্র। শুধু তাই নয়, এই বিজ্ঞান-জ্যোতিষের বিদ্যায় যাতে কোন সম্ভার আয়োজন না করা হয় সে বিষয়েও কড়া নির্দেশ এল। ঠাঁর হাত ধরে নীরবে বিদায় হলেন তিনি গাটেনগেন থেকে। এমনকি নোবেল-প্রাইজের মেডেলটাও নিয়ে যেতে পারেননি।

গাটেনগেন-এর ভিতরের নুতন বিভাঙিত। শেষ দীপশিখাটি ছালিয়ে রেখেছেন একা ডেভিড হিলবার্ট—গণিত-সাপর। তিনি পুরোপুরি নার্টিক—ইহুদি রক্তের চিহ্নমাত্র নেই তাঁর ধমনীতে। প্রায় বছরখানেক পরে বার্লিনে এক ভোক্তসভায় তদনীন্তন জার্মান নাৎসী শিক্ষামন্ত্রী হিলবার্টকে কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, প্রফেসর, একথা কি সত্য যে, ইহুদি বিভাঙনে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গহানি হয়েছে?

হিলবার্ট তৎক্ষণাৎ জবাবে বলেছিলেন, অজ্ঞে না, অঙ্গহানি তো কিছু হয়নি।

উৎফুল্ল হয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তাই বলুন। অথচ লোকে কত কথাই বসিচ্ছে।

হিলবার্ট বললেন, ওসব মূর্খলোকের কথায় কান দেবেন না; হের মিনিষ্টার। অতীতের সেই গাটেনগেন আজ আর জীবিত নেই। দূতসেহের আবার অঙ্গহানি কী?

মুখতোষ দাল হয়ে ওঠে শিক্ষামন্ত্রী। জোর দিয়ে বলেন, এই সাতজন ইহুদি অধ্যাপকের বদলে আমরা যদি সাতজন পাণ্ডয়ারতুল নার্টিক প্রফেসরকে বহাল করি?

হিলবার্ট হেসে বলেন, হের মিনিষ্টার! আপনারা এই পাণ্ডয়ার-পলিটিস্টরা আমি বুঝি না। আমি নেহাই অজ্ঞের মাকার। আমি তো বুঝি, জিরো-টু-নি পাণ্ডয়ার সেভেন ইজুকালটু-জিরো।

শিক্ষামন্ত্রী জবাব খুঁজ পাননি এ অজ্ঞের।

জার্মানী থেকে এই ইহুদি-বিতাড়ন পূর্বে একটা বিচিত্র ভূমিকা নিয়েছিলেন এই ছাত্র আশ্চর্যসনের রপকধার অনুযায়ী। প্রফেসর বোর। গাটেনগেন-বার্লিনের পদচ্যুত ইহুদি অধ্যাপকেরা একের-পর-এক পর শেতে থাকেন তাঁর কাছে থেকে। অঘাচিত নিয়োগপত্র। কোপেনহেগেন ল্যাবরেটরি থেকে। উপযুক্ত পদ খালি না থাকলে লিখতেন—সোজা এখানে চলে এসে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়ুন। আমার এখনও দু-বেলা দু-মুঠো জুটছে, আপনারও জুটবে। আর কিছু না পান একটা তৈরী ল্যাবরেটরী তো পারেন?

অশ্রুচরু অনুব। অধিকাংশই চলে গেলেন ডেনমার্ক। সেই যে-দেশের সমুদ্র উপকূলে বসে জলকন্যার হান মেয়ে পালায়েডা হালভাভা নাবিকদের হাতছানি দেয়। কেউ কেউ অতলাত্বিকের ওপারে পাড়ি জমালেন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কুড়িয়ে নিল ক্যাপার টুডে ফেলা পরশমণিওনি। আইনস্টাইন যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী চাকরি নিয়ে চলে গেলেন তখন ফরাসী বৈজ্ঞানিক পল স্যাত্রেভি লিখেছিলেন : ভ্যাটিকান ছেড়ে পোপ যদি আজ আমেরিকায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন তাহলে ব্রিটান-জগতের যা অবস্থা হত, এই ঘটনার ইউরোপে বিজ্ঞান-জগতের পতি হল ততখানি।

অজ্ঞার কথা—বিভাঙিত ইহুদি বিজ্ঞানীদের কেউই কিছু রাশিয়ায় গেলেন না। বরং রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক গ্যামো, বরিসেভিচ, কিস্তিরাকৌস্কির দল পাড়ি জমালেন আমেরিকায়। রাশিয়ায় স্থানিন ততদিনে লৌহ ফবনিকা টেনে নিয়েছেন। তার ভিতরের কবর কেউ জানে না। একমাত্র কালিৎসা অটিকে পড়লেন সেখানে। তিনি রাশিয়ায় নিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। তাকে ফিরে আসতে দেওয়া হল না। কিন্তু অপর দু-ভারজন—যেমন হোটেম্যান—অর্থাৎ যারা রাশিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মরণাঙ্ক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল রাশিয়ান পুলিশের হাতে। ধরে নেওয়া হয়েছিল তাঁরা গুপ্তচর।

পৃথিবীর ইতিহাস ইতিমধ্যে অতি ক্রমত বলে যাচ্ছে। ইটালির আগ্রাসী নীতিতে নার্টিকাস ডিটেতে আবিসিনিয়ার, জাপান ওনিকে টুটি টিপে ধরেছে শাপের বাড়ির—টীনের। এনিকে হিটলার একের পর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মাথায় পদাঘাত করে চলেছে। নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসী নীতির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে তারা। ব্রিটেন নিশেহারা, দল স্তম্ভিত, আমেরিকা নির্বিকার। একমাত্র স্থানিনের গোছা বী হচ্ছে কেউ খবর পায় না।

কিন্তু না। রাজনীতি নয়, আমাদের লক্ষ্য অ্যাটম-বোমার বিবর্তন। সেমিকটায় নজর ফেরাই—



৯ তিন ৯

1932 সালে রাদারফোর্ডের শিষ্য জেমন্ চ্যাডউইক আবার একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসলেন। সেজন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল তাঁকে।

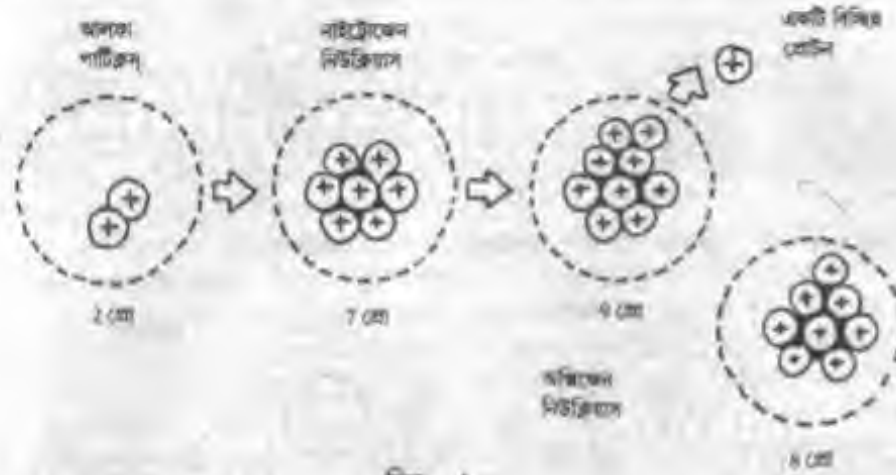
নববিজ্ঞত বস্তুর নাম : নিউট্রন।



কেন ?—সেটা বোঝা যাবে ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক গ্রন্থিকো ফের্মি পরীক্ষার কথা যখন আমরা আলোচনা করব। আপাতত ফের্মি নয়, আমরা আলোচনা করি নবযুগের নবীন কুরিসম্প্রদায় কথা। যাদাম কুরির কন্যা আইভিন কুরিও মায়ের মত রসায়ন-শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন ফ্রেডারিক জোলিও-কে। ওরা স্বামী-স্ত্রী মিলে পরীক্ষা করছিলেন 'বোরন' নিয়ে। বোরন একটি যৌল পদার্থ—ওরা অবশ্য পরীক্ষা করছিলেন বোরনের একটি আইসোটোপ নিয়ে। যার

কী অগ্রহের কথা। এতবড় ভবিষ্যৎবাণীতেও কিন্তু কোন সাদা জাগল না। তার প্রধান কারণ, যুক্তিভাবে আদৌ বিধানযোগ্য মনে করেনি কেউ। নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত জার্মানি পণ্ডিত ওয়ালটার মেনস্ট এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “মনে হচ্ছে দুনিয়াটা বৃষ্টি একটা বাকদের কৃপের উপর বসানো। ঈশ্বাকে ধন্যবাদ, দেশলাই কাঠিটার সন্ধানে কেউ জ্বানে না।”

রাবারফোর্ড তাঁর জীবনের শেষদিন (1937) পর্যন্ত এই বিশ্বাস নিয়েই গেলেন যে, পরমাণুর ভিতরকার ঘুমন্ত জৈত্যকে মানুষ কোনদিনই জাগাতে পারবে না। শুধু একজন বৈজ্ঞানিকের মনে কেমন



চিত্র ৪

যেন একটা ঝটকা লাগল। তাঁর নাম লিও হজিলার্ড, হাঙ্গেরীয় বৈজ্ঞানিক। পাঠকের খরস খাঁকতে পারে, ইতিপূর্বে যে ব্যারোজেন বৈজ্ঞানিককে সন্ধেহের তালিকায় রাখা হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানী লিও হজিলার্ড তার অন্যতম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন বাধে তখন হজিলার্ডের বয়স মাত্র বোলো বছর। বুদাপেস্ট টেকনিকাল স্কুলে পড়তেন। সামরিক আইনে বাধ্যতামূলক সৈনিকস্বত্ত্ব গ্রহণ করতে হল হজিলার্ডকে। কৈশোরে এবং যৌবনের প্রথমে সামরিক কৰ্ত্তাদের কাছ থেকে তিনি এমন সম্ভাবনার পেয়েছিলেন যে, সারটা জীবনে তা ভোলেননি। অতি পরিণত বয়সে হজিলার্ডকে একজন সাংবাদিক প্রণয় করেন, আপনি কী পেলে সবচেয়ে খুশী হন?

জবাবে হজিলার্ড বলেছিলেন, ব্রাস-হেলমেট-মাথায় লাঠি মাঝার সুযোগ।

হজিলার্ড আজও সমর-বিরোধী।

প্রথম যুদ্ধ শেষে হজিলার্ড এসেছিলেন জার্মানিতে। যারা ছিলেন এস্ত্রিনিয়ার, উনিও কৈশোরে বাঙালি হবার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু বুদাপেস্ট থেকে বার্লিনে এসে তাঁর মনটা বদলে গেল। উনি নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হবার জন্য সচেষ্ট হলেন। তার কারণ বোধকরি কয়েকজন বিশ্ববিদ্বিত অধ্যাপকের প্রভাব। তিনি অধ্যাপক হিসাবে পেয়েছিলেন—অইনস্টাইন, মের্সট, ফন-লে এবং স্নায়ক; চারজনই নোবেল-প্রাইজ পাওয়া। হিটলার যখন জার্মানীর কৰ্ম্মতা দখল করল হজিলার্ড তখন কাইজার উইলহেম ইন্সটিটিউটের অবৈতনিক লেকচারার। তীক্ষ্ণ হজিলার্ড বুঝলেন, জার্মানীর ভাগ্যাকাশে কালবৈশাখী প্রভাসায়। উনি চলে এলেন ডিয়েনার। কিন্তু মাত্র দেড়মাসের মধ্যেই তাঁর মনে হল অস্থিমাও যথেষ্ট নিরাপদ নয়—হিটলারের হাত থেকে অস্ত্রিয়ারও নিস্তার নেই। উনি পাড়ি জমালেন গ্রেট ব্রিটেনে। সেখানে থেকে পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। যানহাটান প্রজেক্টের অন্যতম কর্ত্তার হয়েছিলেন তিনি।

1933-সালে এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে লর্ড রাবারফোর্ড বক্তৃতাভ্রমসে বললেন, ‘পরমাণুর ভিতরে সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে মানুষের কাজে লাগাবার কথা যারা বলছে তারা বাতুল।’ সেদিন শ্রোতৃবৃন্দে মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঐরূপ বক্তৃতা শুনে লিও হজিলার্ড। অনেক পরে স্মৃতিচারণে তিনি লিখেছেন, ‘সেই দিনই আমার মনে হল, লর্ড রাবারফোর্ড-এর কথা হয়তো ঠিক নয়। গত বছর জোলিও-কুরি বোরন কে একটি নিউট্রনকে মুক্ত করেছেন—এটা প্রত্যক্ষ সত্য। এর পর যদি কোন বৈজ্ঞানিক এমন বাক্য ক’ত পাবেন যাতে ক্রমাগত একের-পর-এক এতাদেশে নিউট্রন মুক্তি পাবে—তাহলে সেটা একটা ‘চেন

রি-অ্যাকশন’-এর রূপ নেবে। সেক্ষেত্রে পৃথিবীতে শক্তির পরিমাণটা বড় কম হবে না। প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল ‘বেরলিয়ামের’ কথা। পরে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের কথাও মনে আসে, এমনকি ইউরেনিয়াম পর্যন্ত। কিন্তু বাস্তবে সে-সব পরীক্ষা করার সুযোগ আমি পাইনি—নানান কারণে ঘটে গঠেনি।’

হজিলার্ড সে পরীক্ষা সেদিন করেননি বটে তবে তিনিই বোধকরি প্রথম বৈজ্ঞানিক যিনি পরমাণুশক্তির সম্ভাবনার অনুশ-সত্যতার অপরিসীম বিশদে কথা চিন্তা করেছিলেন এবং সেই অবস্থায়ই তার প্রতিকারের কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। 1935-এ তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানীকে বলেছিলেন, অন্তঃপর পরমাণু বিভাজনের ব্যাপারটা গোপন রাখা উচিত।

বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের প্রতিগ্রহ করেন: বল কী হে! বিজ্ঞানের আবিষ্কার আবার গোপন রাখা হবে কেন? কখনকালেও তো এমনটা কেউ ভাবেনি!

—বুঝতে পারছেন না? পরমাণু-শক্তিকে জনহিতকর কাজে লাগাবার আগেই যুদ্ধবিশারদের দল তা নিজে মলপাত্র বানাতে চাইবে। জার্মান বৈজ্ঞানিকেরাই এ-বিষয়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন। হিটলার যদি একবার এই শক্তির সম্ভান পায় তাহলে সে পৃথিবীটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে।

বৈজ্ঞানিকের বললেন, কী শ্যাগলের কথা।

কেউ পাগল মিলেন না হজিলার্ডকে।

বলত সেটা এমন একটা যুগ যখন বৈজ্ঞানিকেরা রাজনীতির ধর ধারতেন না। ল্যাবরেটরির বাইরে যে একটা জগৎ আছে এটা মনেই থাকতনা তাঁদের। অপরপক্ষে রাজনীতিবিদেরাও বৈজ্ঞানিকদের বড় একটা পাগল মিতেন না। সাধারণ মানুষ রাজনীতি নিয়ে যতটা মাতামাতি করত বিজ্ঞান নিয়ে তার শতাব্ধের একাংশও করত না। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আলোচনার আসরে হিটলারের নাম যদি মল বার উচ্চারিত হয় তবে ‘নিউট্রন’ শব্দটা উচ্চারিত হয় একবার।

আমরা ইতিমধ্যে এই শতাব্ধীর শুরু থেকে 1932-33 সাল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছি। এসে পৌঁছেছি এমন একটি ষণ্ডমুহুর্তে যখন বিশ্বের তিন প্রান্তে তিনটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটছে। এক নম্বর—কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে চ্যাডউইকের সৃষ্টিকাগারে জন্ম নিল ‘নিউট্রন’ (ফেব্রুয়ারী 1932); দু নম্বর—কলভেট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন (নভেম্বর 1932) এবং তিন নম্বর—হিটলার জার্মানীর সর্বময় কৰ্ত্তা হল (জানুয়ারী 1933)।



১১ চার ১১

ইংলেণ্ডে যেমন রাবারফোর্ড, ডেনমার্কের যেমন নীলস বোর, ফ্রান্সে যেমন কুরি-সম্পতি তেমনি ইতালীর সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ ছিলেন এনরিকো ফের্মি। তাঁর অনুগামীরা তাঁকে বলত ‘শোশ অব ফিজিক্স’। বৈজ্ঞানিক সমাজক্ষেত্রে-এর শ্রেষ্ঠ ছাত্র পরবর্তী যুগের নোবেল-সরিয়েট জার্মানি ফিজিসিস্ট হাল বেধে রোম থেকে তাঁর শুরুতে চিত্রিত এই সময়ে লিখেছিলেন, ‘রোমে এসে কলোসাস তে মেঘলামই কিন্তু সবচেয়ে অলংকৃত হয়েছি এনরিকো ফের্মিকে দেখে। তাঁকে যে কোন প্রশ্নই সেখান থেকে অবশ্যই উত্তর দিতেন। তার সম্ভাবনাটা তাঁর নম্বরে পড়ে। অদ্ভুত প্রতিভা।’ জোলিও-কুরি আন্তঃ-পার্টিকুল-এর আঘাতে পরমাণুর প্রাথমিক নিম্না ভাঙিয়েছেন শুনে ফের্মি নিম্নাঙ্ক নিলেন চ্যাডউইকের নব-আবিষ্কৃত ঐ নিউট্রন নিয়ে আঘাত করে তার নিম্নাঙ্ক ভাঙা যায় কিনা দেখবেন। স্থির করলেন, একের-পর-এক মৌল পদার্থ নিয়ে তিনি পর পর পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যাবেন। যে-কথা সেই কাজ। প্রথম আটটি পরীক্ষায় কোন-ফল পাওয়া গেল না; কিন্তু নবম মৌল পদার্থ ফের্মির ক্ষেত্রে গাইগার-কাউন্টার যন্ত্রে কাটাটা মূলতঃ শুরু করল। এ যন্ত্রটি হাল গাইগারের আবিষ্কার করেছিলেন কয়েক বছর আগে—এতে অল্পশা রেডিও-অ্যাক্টিভিটি বরা পড়ে। অর্থাৎ ফের্মির পরীক্ষার দেখা গেল, নিউট্রন নিয়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলেও কৃত্রিম রেডিও-অ্যাক্টিভিটি জন্মতে পারে—যার মানে হল, পরমাণুটি বিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং অন্যান্য মৌল-পদার্থের আইসোটোপ জন্ম নিচ্ছে! ফের্মি আবও অনেকগুলি মৌল পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করলেন—এমনকি সবচেয়ে ভারী পদার্থ ইউরেনিয়াম নিয়েও। তাঁর ধারণা হল—ইউরেনিয়াম ওর





করেছেন তাঁরা। আমি জানতাম, প্রফেসর হান থিয়েরিটা বিশ্বাস করেননি; জোলিও-সম্পত্তিকে এ বিষয়ে পত্রিকায় কিছু ছাপতে ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি। তবু এই তৃতীয় প্রবন্ধটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল—ফরাসী-সম্পত্তিই ঠিক কথা বলছেন। তাই পত্রিকাটি হাতে নিয়ে আমি ছুটে চলে এসেছিলাম প্রফেসর হানের ঘরে। উনি কী একটা বই গড়ছিলেন। কেমন যেন ক্লান্ত, বিবস্ত্র। আমার উত্তেজনাতেও তাঁর কোন ভাবান্তর হল না। বললেন, কী ওটা?

“আমি বাড়িয়ে ধরলাম পত্রিকাটা। বললাম, জোলিও-কুরি সম্পত্তির তৃতীয় প্রবন্ধ। ওটা পুনরায় নিউক্লিয়ার ফিশন করে প্রমাণ করেছেন—

“আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে প্রফেসর বললেন, আমার সময় নষ্ট কর না। ঐ ফরাসী বাচ্চাবীটির প্রবন্ধ পড়ার মত সময় এবং শৈব আমার নেই।

“আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। কিনা অনুমতিতেই প্রবন্ধের মূলতত্ত্বটা জোরে জোরে পড়তে থাকি। জেদী বাচ্চা ছেলের মত প্রফেসর হান তাঁর ঘূর্ণমান চেয়ারে আধখানা পাক খেগেন। একশ আশি ডিগ্রি। উঠেটা দিকে ঘিরে চুকট চুকতে থাকেন। তা হোক, শুনতে তো পাচ্চেন। আমি পড়েই চমি। হঠাৎ একশ আশি ডিগ্রিকে তিন শ আশি ডিগ্রি করে বসলেন। ছিনিয়ে নিলেন পত্রিকাটি আমার হাত থেকে। চুকটটা নামিয়ে বেখে ঘমডি ঘেয়ে পড়লেন প্রবন্ধটার উপর। কয়েক বিনিমি গোম্বাসে গিলতে থাকেন প্রবন্ধটা। তারপর কোথাও কিছু নেই লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন উনি। দুকাড়িয়ে নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। ঢুকে পড়লেন ল্যাবরেটোরিতে। আমি ওর পিছন পিছন। অর্ধসেকিট চুকটটা যে পড়েই রইল ওর টেবিলে সে-কথা আমাদের খেয়াল ছিল না।

“এরপর পাঁচা তিন সপ্তাহ আমরা দুজনে ল্যাবরেটোরি থেকে আদৌ বার হইনি। ল্যাবরেটোরি-সলার বাধকম ছাড়া কোথাও যাইনি—এমন কি সংবাদপত্রও পড়িনি। পাড়িয়ে পাড়িয়েই কচি ব্যাডউইচ খেয়েছি, বীক্ষণাগারের ভিভ্যানো পাল্লা করে এক-আধটু ঘুমিয়ে নিয়েছি। কুরি-সম্পত্তির তিন মাস ধরে সম্পন্ন করা প্রতিটি পরীক্ষা অধ্যাপক হান তিন সপ্তাহে নিজে হাতে করে দেখলেন। তারপর একদিন আমার হাতখানা টেনে নিয়ে বললেন, স্ট্যান্ডান, আমি বীক্ষার কবচি। অটো হান-এরই তুল হয়েছিল, আইরিন কুরির নয়।

“সে এক অবিশ্বরণীয় মুহূর্ত। সেন একটা কামানের গোলা পরাজয় বীজার করছে শিংগা বলের ক’ছে।

“আমি একা এ ঘটনার সাক্ষী, কিন্তু একটি ‘জ্বলন্ত’ প্রমাণ আমার হাতে আছে। আঞ্চরিক অর্ধে। প্রফেসর হানের খাসকামরায় সেই টেবিলেই অর্ধদু চুকটটা তিল তিল করে প্রমাণ করছে শিংগা বলের সঙ্গে ধৈর্য-সময়ে কামানের গোলার পরাজয় কাহিনী। জ্বলন্ত প্রমাণ।”

একটা কথা। কুরি-সম্পত্তির একটা তুল হয়েছিল। তাঁরা বলেছিলেন, ইউরেনিয়াম বিদীর্ণ করে তাঁরা পেয়েছেন স্ট্যানধেনাম। সেটা তুল। তাঁরা বাস্তবে পেয়েছিলেন ‘বেরিয়াম’। অথচ সেটা ধরতে পারেননি। পারলে, আরও নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন তাঁরা। প্রফেসর হানের পাঁচা হাতে এ কুটি ধরা পড়ে গেল। তাই তিনিই শেলেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সত্যটা। তাই বলা হয়—প্রফেসর অটো হানই সজ্ঞানে প্রথম ইউরেনিয়াম-পরমাণুকে বিদীর্ণ করলেন।

আমাদের আটম-বোমার বিকর্তনে এইটা হল পঞ্চম সোপান।

মজা হচ্ছে এই যে, পরীক্ষার সাফল্যটাকে কিন্তু তখনকার বিজ্ঞানসূত্র অনুসারে যুক্তি দিয়ে মেনে নেওয়া যাচ্ছিল না। ইউরেনিয়াম ভেঙে উনি তার কাছাকাছি কোন মৌল পদার্থ পেলেন না। সেলেন, বেরিয়াম—যার ‘পারমাণবিক ভর’ বা আটমিক ওয়েট ইউরেনিয়ামের প্রায় অর্ধেক। এমনটা তো হওয়ার কথা নয়! পদার্থবিদ্যা এর কোন ব্যাখ্যাই দিতে পারে না, অথচ রসায়ন-বিদ্যা বলছে ওটা বেরিয়াম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এ কী বিভ্রম! তা হ’ক, তবু প্রফেসর হান তাঁর পরীক্ষার ফলাফল তৎক্ষণাৎ ছাপতে দিলেন। তারিখটা বাইশে ডিসেম্বর 1938।

তার বিশ্ববহর পরে প্রফেসর হান একজন সাংবাদিককে বলেছিলেন, ‘প্রবন্ধটা ডাকে দেবার পর আমার এমনও মনে হয়েছিল পোস্ট-আপিসে গিয়ে ওটা ফেরত নিয়ে আসি। কারণ আমার পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলটা আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।’

প্রফেসর হান আরও একটি কাজ করলেন। তাঁর প্রবন্ধের একটি কপি, ছাপা হওয়ার আগেই পাঠিয়ে দিলেন তাঁর এতদিনের বাচ্চাবী কুমারী মাইটনারকে। দিজা মাইটনার তখন সুইডেনের দক্ষিণপ্রান্তে সমুদ্রতীরের একটি ছোট জনপথে নির্বাসিত। একা একাই ছিলেন এতদিন। মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁকে সমুদ্র তীরে এসেছেন তাঁর বোনশো ডব্বার গ্রিস। তিনিও প্রথম শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞানী। জার্মানী থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় পেয়েছিলেন কোপেনহেগেন-এ, প্রফেসর নীলস বোর-এর ছত্রছায়ায়। গ্রিস এসেছিলেন নিত্যন্ত খুটি কটাতে—মাসিমাকে এ দুদিনে সঙ্গ দিতে। কিন্তু সেই শুভলগ্নেই একদিন মাসিমার নামে এসে পৌছালো একটা মোটা খাম—জার্মানী থেকে। সেটা পড়ে মাসিমা যেন খেপে উঠলেন। গ্রিসকে বোঝাতে থাকেন সবকিছু। গ্রিস প্রথমটা কর্পপাত করতে চাননি—কিন্তু মাসিমার নির্বিকারিতবে শেষপর্যন্ত দুজনে মিলে প্রবন্ধটা পড়ে ফেললেন। প্রথমটা বিশ্বাসই হতে চায়নি গ্রিস-এর; কিন্তু ঐক্য মাসিমা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঠেকে বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা।

খুটি কটাতে এসে, অকৃত এক সত্যকে আবিষ্কার করলেন ডব্বার গ্রিস। উনি এইসময় সুইডেন থেকে ঠর ঠর করে ছিটিয়ে গিয়েছিলেন, ‘সুইডেন-এর পাইন জঙ্গলে হাতি পাওয়া যায় বিশ্বাস কর। এখানে এসে বেশি রোমার ঘিনি জঙ্গলে একটা হাতি ধরে ফেললেন। আমরা দুজনে হাতিটার ল্যাজ চেপে ধরেছি—কিন্তু এতবড় জন্তুটাকে নিয়ে কী করব বুঝে উঠতে পারছি না।’

মাসিমানে পরে ডব্বার গ্রিস ঘিরে এলেন জেনমার্কো। প্রথমেই খুটি চলে গেলেন প্রফেসর নীলস বোর-এর কাছে। সবিস্ময়ের সব কথা খুলে বললেন। প্রফেসর অটো হানের পরীক্ষার ফলাফল এবং গ্রিস মাইটনারের ব্যাখ্যা। ফলস্রুতি হাতে হাতে। প্রফেসর বোর নির্বাক শুনছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই আচমকা এক ঘুবি মেতে বসলেন ছাত্রকে। টাল সামলে নিয়ে ডব্বার গ্রিস বুঝতে পারেন—এটা আনন্দের অভিব্যক্তি। প্রফেসর বোর দু-হাত পুনো তুলে তখন বললেনঃ মূর্খ। মূর্খ আমরা। এত সোজা ব্যাপারটা এতদিন ধরতে পারিনি।

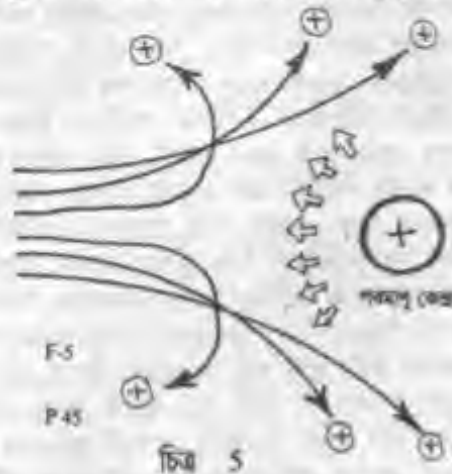
অটো হান অথবা নীলস বোর-এর মত নোবেল লরিয়েট বৈজ্ঞানিক যে সমস্যার কিনারা করতে সেনিন বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়েছিলেন আজ কিন্তু অপনি-আমি সেটা সহজেই বুঝতে পারব—মোটামুটি ব্যাপারটা। প্রথম সমস্যা ছিল সেই বিভ্রান্তকর প্রকটি—কামানের গোলা যা শারেনি তা শিংপড়ের বল কোস করে করল। 1919 সালে নাইট্রোজেন পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করতে রাদারফোর্ড ব্যবহার করেছিলেন অত্যন্ত সূতগামী আলফা পার্টিকলস্। পরে ডব্বার কর্তব্যটি চেষ্টা করেছিলেন প্রোটিন দিয়ে। যেহেতু আলফা-পার্টিকলস্ এবং প্রোটিন হচ্ছে বিদ্যুৎগর্ভ এবং নিউট্রন বিদ্যুৎবিচারে নিরপেক্ষ, তাতেই এই সংশয়টা জেগেছে। কিন্তু বস্ত্ত সংশয়ের কোন অবকাশ এখানে নেই। পরমাণুর কেন্দ্রে আছে কতকগুলো; অপসরণে আলফা-পার্টিকলস্ এবং প্রোটন দুটিই হচ্ছে ধনাত্মক। তাতেই তাঁদের জসুবিধা হচ্ছিল। সমবর্মী বিদ্যুৎগর্ভা পরমাণুকে ঘুরে চলে। তাই ধনাত্মক বিদ্যুৎগর্ভ আলফা-পার্টিকলস্ অথবা প্রোটনকে পরমাণুকের ঘুরে চলে দিচ্ছিল। ব্যাপারটার চিত্ররূপ হচ্ছে চিত্র 5-এর মত। এখানে আমরা পাশাপাশি ছুটি আলফা-পার্টিকলস্-এর গতিপথ দেখিয়েছি। পরমাণু কেন্দ্রের কাছাকাছি এসেই বিকলিত-শক্তিতে সেগুলি বৈকে গেছে। মাকের দুটি বুলেট তো একেবারে প্রতিহত হয়ে উঠেটাকিকে ঘিরে গেছে। ফলে লক্ষ্যভেদ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কম। চ্যাতউইক কার্ক নবনিকৃত নিউট্রন যেহেতু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ তাই তাকে এভাবে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎগর্ভ চলে দেয়নি। তাই ফেরি ল্যাবরেটোরিতে নিউট্রন পরমাণুর কেন্দ্রটি বিদীর্ণ করতে পেরেছিল। কামানের গোলাকে হারিয়ে দিয়েছিল শিংগা-এর বল।

বিদীর্ণ প্রকটি হচ্ছে, অটো হান ইউরেনিয়ামের পরমাণু বিদীর্ণ করে কেমন করে ‘বেরিয়াম’ পেলেন? এটার সেটাই বুঝার চেষ্টা করব আমরাঃ

উনি পরীক্ষা করছিলেন ‘ইউরেনিয়াম-235’ নিয়ে, যাকে সংক্ষেপে বলে  $U_{235}$ । তাব চেহারাটা কেমন? কেন্দ্রহলে আছে 92টি প্রোটন (+) এবং 143টি নিউট্রন (নিরপেক্ষ) আর বাইরে একাধিক কক্ষপথে সর্বমোট 92টি ইলেকট্রন (-)। এমন একটি পরমাণুর কেন্দ্রহলে বাইরে থেকে এসে প্রচণ্ড আঘাত হামল একটি নিউট্রন। তাতে কেন্দ্রহলটি দু-টুকরো হয়ে গেল। জীববিজ্ঞানের বইতে ‘অ্যামিবা’ কেমন করে দু-টুকরো হয়, তার ছবি নিচুই দেখেছেন। ব্যাপারটা হল অনেকটা ঐ রকম। দুটি ভাগে

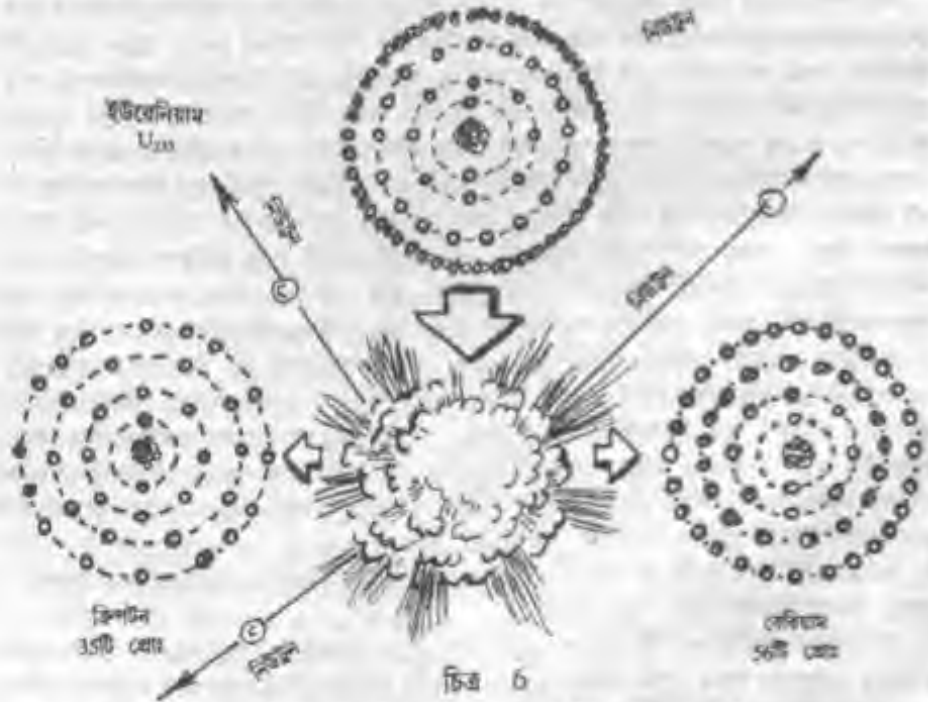


যত প্রোটিন থাকবে তার যোগফল হবে 92। দু-টুকরো হয়ে যাওয়া প্রতিটি কেন্দ্রের চারপাশে ইলেকট্রনগুলি নৃতন করে ঘুরতে শুরু করবে—যে ভাগে যতগুলি প্রোটিন আছে সেই ভাগে ততগুলি



চিত্র 5

ইলেকট্রন মুক্ত হবে, যাতে কণাটুক আর ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ দুটি নবলব্ধ পরমাণুতে সমান হয়। এই সময়ে আরও একটি কাণ্ড ঘটে—কেন্দ্রস্থলের গুটি তিন নিউট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি-একি ছুটে যায়। আরও একটি কাণ্ড ঘটে—পরমাণু বিদীর্ণ হওয়ায় কণিকের জন্য অচণ্ড শক্তি উদ্ভূত হয়। এই ব্যাপারটাই চিত্র 6-এ বোঝানো হয়েছে। এখানেও চিত্রে নিউট্রন দেখানো হয়নি।



চিত্র 6

তাই যদি হবে, তবে ফের্মি অথবা অটো হানের ল্যাবরেটোরিটা মিথোপক্ষে উড়ে গেল না কেন? আইনস্টাইনের সেই  $E=mc^2$  ফর্মুলামত তো শুনেছিলেন এক গ্রাম পরিমাণ বস্তুর বিনাশে চার-হাজার টন কয়লার দাহশক্তির সমতুল শক্তির জন্ম হবে।

ঠিকই শুনেছি; কিন্তু একটিমাত্র পরমাণুর ওজন (ভর) বা 'm' কতটুকু? হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন হচ্ছে  $166 \times 10^{-24}$  গ্রাম। এই  $10^{-24}$  গ্রাম ব্যাপারটা আমরা ধারণাই করতে পারি না। আসুন, একটা তুলনামূলক বিচার করি: একবিন্দু জলের তুলনায় জলকণার একটি অণু (molecule) হচ্ছে এই তের হাজার কিলোমিটার ব্যাস-বিশিষ্ট পৃথিবীর তুলনায় একটি লিৎপড়ের বল। বলা বাহুল্য, পরমাণু হচ্ছে এই অণুর তত্ত্বাংশ। ফলে একটিমাত্র পরমাণুর বিলোপে যেটুকু শক্তি উৎপাদন হল তা অতি সামান্যই।

॥ পাঠ ॥



রাম-মুই-তিন-চার-পাঁচ। হ্যাঁ-হ্যাঁ পা-পা। পরমাণু-বোমা খেলাঘরের দিকে পাঁচটি শব্দক্ষেপ করেছে বিশ্বজুড়ে। 1919 থেকে 1938-এর মধ্যে। এক-নম্বর লর্ড রাদারফোর্ডের প্রোটন-সন্ধান এবং মৌলপদার্থের ট্রান্সমুটেশন। দু-নম্বর চ্যাডউইকের নিউট্রন-আবিষ্কার, তিন-নম্বর জোলিও-কুরির বীজবাগানে অ্যালানের আশ্চর্য-প্রদীপ থেকে সসোমুক্ত নিউট্রন, চার-নম্বর ফের্মির অজ্ঞাতসারে ইউরেনিয়াম পরমাণুর হ্রস্ব-বিদীর্ণকরণ এবং পাঁচ নম্বর গ্যাপ, প্রফেসর অটো হান-এর সন্ধান ব্যাখ্যা। অথচ আশ্চর্য! পাঁচ-পাঁচটা গ্যাপ অতিক্রম করেছে সে-যুগের বিজ্ঞানীরা ভারতে পারছেন না, এই পরীক্ষাবলীর শেষ ফলশ্রুতি: অটম-বোমা: প্রমাণ? মিথি:

1939-এর জানুয়ারীতে বিশ্ববিজ্ঞানের তিন-তিনজন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকের বক্তব্য শুনুন—  
প্রফেসর নীলস বোর তাঁর সহকারী উইগনারকে বলছেন, “পরমাণুর ভিতরকার এই অপরিসীম সুশক্তিকে মানুষ কোনদিনই কাজে লাগাতে পারবে না। অস্ত্রত পনেরটি অনতিক্রম্য বাধা আমাদের নজরে পড়েছে।”  
প্রফেসর অটো হান তাঁর সহকারী কোর্সচিংকে এই সময় বলেছেন, “পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে মানুষ কৃৎসিত করুক এটা বিশ্বের অভিলেখ নহ—তাই আমাদের সামনে তিনি রেখেছেন অসংখ্য অনতিক্রম্য বাধা।”

অফেসর জালবার্ট আইনস্টাইন একই সময়ে আমেরিকান রিপোর্টার ডাব্লু এল লরেঞ্চকে বলছেন, “পরমাণুর ভিতরের ঘুমন্ত শক্তিকে মানুষের কাজে লাগানো কোনদিনই হয়তো সম্ভবপর হবে না, অস্ত্রত আমাদের জীবদ্দশায় নহ।”

এ-যুগের ইতিহাস আমি দুটিয়ে দেখছি, দেখছি—একজন বিজ্ঞানী সেই সময় থেকেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আমি হার্শেরিয়ান বিজ্ঞানী এডিলার্ড এর কথা বলছি।

ইতিমধ্যে ভিৎচেনা থেকে এডিলার্ড এসেছেন ইলোথে। সেখান থেকে মার্কিনমূল্যে। এখানে এসে কোন চাকরি-মাকরি তখনও করতে পারেননি; কিন্তু কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে ল্যাবরেটোরিতে কাজ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। অটো হান-এর প্রবন্ধ পড়ে তাঁর মনে পড়ে গেল সেই ছয় বছর আগেকার কথা। লর্ড রাদারফোর্ড-এর বক্তৃতা শুনে সেদিন তাঁর মা মনে হয়েছিল তার কথা। এডিলার্ড তাঁর বন্ধু লিওনেইজ-এর কাছ থেকে দু হাজার ডলার বার নিলেন এবং এক গ্রাম রেডিয়াম কিনে কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা শুরু করে দিলেন। তিন-চার দিন পরে তাঁর পরীক্ষার ফলাফলগুলি দেখে নিরুত্থিত আতঙ্কিত হলেন তিনি। তাঁর মনে হল—রেডিয়াম বা ইউরেনিয়ামের পরমাণুকে বিদীর্ণ করে ইতিমধ্যেই একটি নিউট্রনকে মুক্ত করা গেছে। যদি এই হাতুর পরিমাণ কিছু বেশী হয়, এবং এমন ব্যবস্থা করা যায় যাতে একের-পর-এক নিউট্রন মুক্ত হবে—তাহলে ‘চক্রাবর্তন অবস্থা’ অর্থাৎ ‘চেন বিদ্যাক্ষণ’ শুরু হয়ে যাবে। তার অনিবার্য ফল অত্যন্ত শক্তিশালী এক বিস্ফোরক। তাতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

এডিলার্ড এসে হাজির হলেন পোপের দরবারে—কিউর-এর পোপ, এনরিকো ফের্মি। ফের্মি ব্যতন্ত্র হয়ে পড়েছিলেন ফ্যাসিস্ট ইটালীর জীবনযাত্রা। নাৎসী জার্মানীর মত সেখানেও বৈজ্ঞানিকদের উপর কর্তৃত্ব করছিল মুসোলিনীর গুপ্তচর বাহিনী। বিজ্ঞানভিক্ত ফের্মি পালাবার পথ খুঁজছিলেন। সুযোগ হয়ে গেল হঠাৎ তিনি নোবেল-প্রাইজ পেয়ে বসায়। 1938এ ফের্মিকে সুইডেন থেকে আমন্ত্রণ করা হল। সতীক ফের্মি এলেন স্টকহোমে। প্রাইজ নিলেন, কিন্তু ইটালীতে ফিরলেন না।



আর। সোজা পাড়ি জমালেন আমেরিকায়। এখন তিনি আমেরিকায়।

ফের্মিকে এজিলার্ড সব কথা খুলে বললেন। বললেন, আমি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে একমত নই। আমার ধারণা—‘পরমাণু-বোমা’ আদৌ অসম্ভব নয়। যেমন করে হ’ক এ দুর্দৈবকে কল্পতে হবে।

ফের্মি বলেন, বেশ মানলাম। কিন্তু কেমন করে সেটা কল্পবেন আপনি?

—আমার ধারণা—এ পৃথিবীতে আজ ব্যারোজেন, মাত্র ব্যারোজেন বৈজ্ঞানিক এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম। আপনি সেই ব্যারোজেনের একজন। তাই আপনার কাছেই প্রথম এসেছি।

—ঠিক কী বলতে চাইছেন?

—এই ব্যারোজেন বৈজ্ঞানিক যদি প্রতিজ্ঞা করেন—তাদের আবিষ্কারের কথা বাইরের দুনিয়াকে জানতে দেবেন না—অন্ততঃ এ যেসব লোক ব্রান্স-হেলেনটে পরে ছড়ি পুরিয়ে বেড়ায়, তাদের জানতে দেবেন না, তাহলেই কাজ হবে।

ফের্মি গম্ভীর হয়ে বলেন, হের এজিলার্ড। ঐ ব্যারোজেনের মধ্যে বেশ কতকজন আছেন জার্মানিতে—অটো হান, হাইজেনবের্গ, ফন লে ইত্যাদি। নয় কি? নাথানী জার্মানী কি তাদের রেহাই দেবে?

—কিন্তু কিছু একটা তো করা দরকার। আপনিই অগ্রণী হন।

—বেশ। আগামী শনিবার আমার এখানে আরও কয়েকজনকে ডাকছি। সবাই মিলে পরামর্শ করে দেখা যাক।

কমিন পরে এনরিকো ফের্মির বাড়িতে বসল একটা ঘরোয়া বৈঠক। ফের্মি আর এজিলার্ড ছাড়া সেখানে ছিলেন আরও তিনজন তরুণ বিজ্ঞানী। উইগনার, টেলার আর গ্যামো। ঠিকের সামনে এজিলার্ড তাঁর বক্তব্য রাখলেন, বললেন—

একটা কথা আপনারা খুব খীর-খিরভাবে ভেবে দেখুন। হিটলার লোকটা পাগল নয়, তাহলে সে কোন সাহসে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে দ্বৈবধ সমরে নামতে চায়? হ্যাঁ, সারা দুনিয়া। একমাত্র যুগোলিনী ছাড়া সে কারও সঙ্গে সন্ধাব রাখার চেষ্টা করবে না। অত্যা জার্মানি, জার্মানীর সমগ্র-সমগ্র অনেক বেশী, অনেক উন্নত। তার এয়ারক্রাফট, তার ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন তার শত্রুদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী এবং অনেক বেশী কার্যকরী। কিন্তু এ কথাও তো নির্মম সত্য যে, তার শত্রুদের তুলনায় তার জনবল, খনিজ-সম্পদ, খাদ্য-সম্ভার অনেক কম। বিশ্বযুদ্ধে যে স্ফোটারিত জেতা যায় না—সেটা তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই জার্মানী হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। তাহলে এই ইচ্ছা, ‘ক্ল্যানে কী এমন অজ্ঞাত ফ্যাক্টর ‘X’ আছে যাতে সর্দীকরণের পাল্লা ভারী হবে শত্রুকে?’

টেলার বলেন, আপনিই বলুন।

এজিলার্ড তৎক্ষণাৎ টেবিলের উপর মেলে ধরেন একটা জার্মান পত্রিকা—Deutsche Allgemeine Zeitung। তাতে প্রকাশিত হয়েছে ডক্টর ফুপ্প-এর একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধপাঠে জানা গেল, বিশেষ এপ্রিল 1938-এ বার্লিনে হুজেন জার্মান নিউক্লিয়ার ফিজিকিস্ট সম্মিলিত হয়েছিলেন সবকারী উদ্যোগে—উদ্দেশ্য পরমাণুশক্তির সন্ধান। ঠাণ্ডা কতদূর কী করছেন তাও কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে।

এজিলার্ড বললেন, মস্তভণ্ডি নাথানী জার্মানীর ঘর। তারা যখন প্রকাশ্যে এতকথা লিখেছে তখন নিশ্চয়ই তারা গোপনে অনেক অনেকটা এগিয়ে আছে। হুজতো বছরখানেকের ভিতরেই ওরা পরমাণু-বোমা তৈরী করে ফেলবে। আমার দৃঢ় ধারণা এই পরমাণু-বোমাটিই হচ্ছে আমাদের ঐ সর্দীকরণের যথার্থ বিষয়ে অজ্ঞাত রহস্য। ঐ শক্তির জন্যই হিটলার এতটা কেপারোয়া।

ফের্মি বললেন, ওরা যাক শাপনি যা বললেন তাই সত্য। এ-ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

এজিলার্ড বলেন, আমার মতে দুটি কাজ অবিলম্বে আমাদের করা উচিত। প্রথম কাজ হচ্ছে, নাথানী জার্মানী এবং ফ্যাসিস্ট ইটালীর বাইরে যেসব বিজ্ঞানী আছেন তাদের একতাবদ্ধ করা। তাদের প্রতিজ্ঞা করা—যা কিছু আবিষ্কার তাঁরা করছেন তা কাগজে প্রকাশ করবেন না—নিজেনের মধ্যেই গোপনে রাখবেন। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, জার্মানিতে আমাদের যেসব বন্ধু আছেন তাদের মাধ্যমে জানবার চেষ্টা করা—ওরা কতদূর কী করেছে।

ইতিমধ্যে ছাউ ফের্মি মনের বোতল আর ডিক্যান্টার রেখে গিয়েছিলেন টেবিল-এ। ফের্মি তাঁর পদপত্রটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, আমাকে মাপ করবেন ডক্টর এজিলার্ড। আমি আপনার দুটি প্রস্তাবের একটাও খুলি মনে মনে নিতে পারছি না।

—কেন?

—আমার প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা তাদের ল্যাবরেটোরির উপর স্বপ্রযুক্ত সেনসর বসাবেন। গোপনীয়তা অবলম্বন করবেন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য—আমি সদ্য ফ্যাসিস্ট ইটালী থেকে পালিয়ে এসেছি। ঐসব গোপনীয়তা আর সেনসরের হাত এড়াতে। বিজ্ঞানমন্ডিতের দ্বারে ওরা বেয়নেটখাণী সৈনিক বসিয়েছিল বলেই দেশত্যাগ করেছি। আমেরিকায় এসে মুক্তির নিখোঁস ফেলে বৈটেছি। সুতরাং জ্বাংর গুঁড়ামে আমি পা দেব না।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল এজিলার্ড-এর। কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

—আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে—আমরা গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করব—জানতে চাইব, জার্মানিতে কী হচ্ছে না হচ্ছে। তাতেও আমার ঘোরতর আপত্তি। ও কাজ শুধুরের—বিজ্ঞানভিক্ষুর নয়। অন্ততঃ আমি ওতে নেই।

উইগনার বলেন, তাহলে আমার বিকল্প প্রস্তাবটা শুনুন। আমি মনে করি, এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম করণীয় হচ্ছে, ডে-সেশ আমাদের মত বাস্তবতাবাদ বৈজ্ঞানিকদের আশ্রয় দিয়েছে সেই দেশের সরকারকে এবিসয়ে অবহিত করা। ব্যাপারটার ভরস্ব ও বিশদ সম্বন্ধে মার্কিন সরকারকে সতর্ক করার সময় হয়েছে।

সকলেই একবারো-এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। এমন কি ফের্মিও।

কিন্তু কী করে কী করা যায়? ঠাণ্ডা পাচজনেই বিশেষী, মার্কিন নাগরিক নন। সদ্য এসেছেন। তাছাড়া একমাত্র ফের্মি আর এজিলার্ড ছাড়া আর তিনজনই তরুণ এবং তখনও প্রতিভাযশা নন। তবু চেষ্টা করে দেখলেন ঠাণ্ডা। একদিন ঠাণ্ডা গিয়ে সাফাং করলেন নৌ-বাড়িনীর আডমিরাল হুপার-এর সঙ্গে। ধৈর্য ধরে আডমিরাল হুপার ঐ নোকেল-লবিরেটোরি বক্তব্য শুনলেন, কতি খাওয়ালেন, শ্যাম্পেন খাওয়ালেন এবং তার পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে গেলেন। ঠাণ্ডা চলে আসতেই তিনি মনে মনে বললেন—‘পাণ্ডপতলো জেনেওটা সময় নষ্ট করে দিয়ে গেল।’

সেই মাসেই—এপ্রিলে, নিউইয়র্ক টাইমস-এ এক প্রবন্ধে নীলস বোর লিখলেন, ‘নিউইয়র্কের আঘাতে ইউরেনিয়াম-পরমাণুতে এমন বিফোরক উদ্ভাবিত হতে পারে যাতে এই গোটা শহরটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।’

তাও মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাউকে উদ্বিগ্ন করল না।

নিত্যন্ত খটনাচক্রেই বলতে হবে, এই সময়ে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী হাইজেনবের্গ আমেরিকায় এলেন কয়েক সপ্তাহের জন্য। ফের্মি তৎক্ষণাৎ ছাত্র হলে কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের। তিনি জানতেন, এজিলার্ড-বর্ণিত ঘাপশজন বিজ্ঞানীর মধ্যে হাইজেনবের্গ নিঃসন্দেহে একজন। তাঁকে আদিকতে হবে। আমেরিকাতেই।

অটম-বোমা ঠেকাতে নয়, অত্যা প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিককে নিয়োগ করতে স্বতই উৎসাহিত হলেন কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। হাইজেনবের্গকে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ অফার করা হল। কিন্তু সর্বিনয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন হাইজেনবের্গ। ঘরোয়া পরিবেশে একদিন তাঁকে পাকড়াও করলেন ফের্মি আর এজিলার্ড। ফের্মি সরাসরি প্রশ্ন করে বসলেন, হের প্রফেসর, আপনাকে একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব। কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদটা আপনি নিলেন না কেন?

কৌতুক উপরে পড়ল তরুণ অধ্যাপকের দু-চোখ থেকে। ঠাণ্ডি বছর বয়সে নোবেল-প্রাইজ পাওয়ার মত খিসিস মিনি লিখেছিলেন। বললেন, ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব: যে জন্য আপনারা আমাকে আদিকতে চাইছেন তার প্রয়োজন নেই। হিটলার এ যুদ্ধে হারবে। কিন্তু সেজন্য আমি তো আমার শত্রুভূমিকে ত্যাগ করতে পারি না। সে দুর্দিনে আমাকে থাকতে হবে সেই পরাজিত জার্মানীতেই। পদেপুষ্পের মাঝখানে থেকে জার্মানীর যা কিছু মহান সম্পদ তাকে রক্ষা করতে হবে আমাদেরই।

ফের্মি জবাব নিতে পারেননি। তিনি ইটালীকে অনিবার্য লাস্তপুষ্পের মাঝখানে ফেলে রেখে এসেছেন।

ফিজিয়ার্ড কিছু থাকতে পারেন না। পুনরায় প্রশ্ন করলেন—প্রফেসর! অটো হান-এর পরীক্ষা বিবরে আপনার কী অভিমত? ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভিতর চেন-রিয়াকশান কি সম্ভব?

হাইজেনবের্গ বলেছিলেন, আমি তো তাই মনে করি। এ দুনিয়ার আজ দশ-বারোজন বৈজ্ঞানিক আছেন যারা মিলিতভাবে চেষ্টা করলে এটাকে বাস্তবায়িত করতে পারেন।

ফিজিয়ার্ড উৎসাহিত হয়ে বলেন, ঠিক কথা। এবং সেই দশ-বারোজন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আছেন আপনারা দুজন—আপনি আর প্রফেসর ফের্মি।

হাইজেনবের্গ মৃদু হাসলেন, জগাব দিলেন না।

ফিজিয়ার্ড পুনরায় বলেন, সের প্রফেসর! সেই চেন-রিয়াকশান এমন বিস্ফোরকের জন্ম দিতে পারে—যাতে পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, তাই নয়?

হাইজেনবের্গ মাথা নেড়ে সাহা দিলেন।

—তাহলে এই মুষ্টিমেয় দশ-বারোজন বৈজ্ঞানিক কি একযোগে এই পৃথিবীটাকে সেই অভিশাপ থেকে বাঁচাতে পারেন না?

—পারেন। গিয়োরগেটিক্যালি। কিন্তু সে সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার কোন পথ তো আমি দেখছি না। আপনারা যদি পারেন, আমি খুশী হব।

ফিজিয়ার্ড কিছু অত ইতস্তাস হনেন না। ইতিমধ্যে ফের্মিও মত বলেছেন। তিনিও ফিজিয়ার্ড-এর সঙ্গে একমত হয়েছেন—অতঃপর বিশ্বের সব নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট-এর উচিত তাঁদের পরীক্ষার কল্যাণ গোপন রাখা। ফিজিয়ার্ড স্বতঃপ্ররোচিত হয়ে সব কয়টি বৈজ্ঞানিককে তাঁর প্রস্তাব পাঠালেন। ডেনহার্ক, কোমব্রিজ, প্যারীতে। কিন্তু তাঁর একক প্রচেষ্টায় কোন কিছুই হল না। স্বতঃপ্রসূত গোপনীয়তার বৃত্তি কেউই মেনে নিলেন না। এর প্রয়োজনটাই সেদিন মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেননি কেউ।

এদিকে মার্কিন নৌ-বহরের বড় সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠগা বুঝলেন, এভাবে কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে না। ফের্মি-ফিজিয়ার্ড-উইগনার-টেলার এবং গ্যামো সাক্ষা-আসরে এ নিষে প্রায়ই আলোচনা করতেন—কীভাবে মার্কিন বড়কর্তাদের সমস্যাটির বিষয়ে অবহিত করা যায়। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি খোঁজল ঐ লিও ফিজিয়ার্ড এর মাধ্যমেই। ব্যাপারটা প্রফেসর আইনস্টাইনকে জানালে কেমন হয়? তিনি যদি বড়কর্তাদের কাউকে চিঠি লিখতে রাজী হন তবে কাজ হতে পারে। আইনস্টাইন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তাঁর চিঠিকে উপেক্ষা করবে না কেউ। ধরা যাক, তিনি লিখলেন যুদ্ধসচিব স্বরং হেনরী স্টিমসনকে।

—না। হেনরী স্টিমসন নয়—বললেন, এদিককো ফের্মি—প্রফেসর আইনস্টাইন যদি আসৌ কোনও চিঠি লেখেন তবে লিখাবেন সরাসরি F. D. R.-কে।

ঠিক কথা। যুদ্ধসচিব, প্রধান সেনাপতি-টিভি নয়—স্বরং কল্লভেটকে।

যে কথা সেই কাজ। ইউজিন উইগনার আর লিও ফিজিয়ার্ড একদিন জুলাই মাসের এক গৌরবতম দিনে গাড়িটা নিয়ে তওনা হয়ে পড়লেন লন্ডন-আইল্যান্ডের দক্ষিণতম প্রান্তে এক ছোট জনপদের উদ্দেশ্যে—তার নাম Patchogue। সেখানেই নাকি বাস করেন আলবার্ট আইনস্টাইন।

সঠিক পাত্রটা জানা ছিল না। সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে ঠগা। 'প্যাচক' গ্রাম কোথায় কোঁড় বলতেই পারে না। প্যাচক না পেরিকক? পেরিকক বলে একটা গ্রাম আছে আরও দক্ষিণে। শেষ পর্যন্ত হতভান হয়ে উইগনার বললে: লিও, আমার মনে হচ্ছে এটাই সৈবের নির্দেশ। প্রফেসর আইনস্টাইন চিককাল রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছেন। তাই বোধহয় স্বরং আমাদের এভাবে পথ-প্রান্ত করছেন। হযতো এই ভাল হল। প্রফেসর আইনস্টাইনের সেই করা কোন চিঠি কোঁড় ছেঁড়া কাগজের কুড়িতে ফেললে আমি কোনমিন নিজেকে কমা করতে পারতাম না।

ফিজিয়ার্ড সিয়ারিঙে একটা হাত রেখে বলেন, অতটা সেটিমেটাল হয়ে না বন্ধু! আমাদের দুজনের হাতে হযতো এই মুহুর্তে নির্ভর করছে গোটা মানবসভ্যতার নিরাপত্তা। এত সহজে হতাশ হবার আমাদের চলে?

ফেন ফিজিয়ার্ডই কম সেটিমেটাল!

উইগনার বলেন, একটা কথা লিও। আমরা এতক্ষণ প্যাচক গ্রামের খোঁজ করেছি। তার চেষ্টে করা স্বেচ্ছজনকে জিজ্ঞাস্য করি না কেন, আইনস্টাইন কোথায় থাকেন?

—ঠিক কথা! একটা ব্যাচা ছেলেও আইনস্টাইনের নাম জানে।

—ঐ তো একটা ব্যাচা ছেলে। এস। ওকে নিয়েই শুরু করি।

দুই বন্ধু নেত্রং কৌতুকের ছলে এগিয়ে গেলেন ব্যাচাটির দিকে। বছর-সাতেক বয়স তার। বাড়ির গোয়ালে বসে একটা কুকুরছানাকে আদর করছিল।

ফিজিয়ার্ড বলেন, ফোকা! তুমি আইনস্টাইনের নাম শুনেছ?

—নিশ্চয় শুনেছি। কেন, তোমরা শোননি?

দ্ব্যমত খেয়ে ফিজিয়ার্ড বলেন, না মানে, —তাঁর বাড়িটা কোথায় জান।

—নিশ্চয় জানি। কেন, তোমরা জান না? —ঐ তো ঐ বাড়িটা।

বন্ধুত্ব যেখানে গাড়ি থামিয়ে উইগনার বলছিলেন—ভাগ্যসেবতার নির্দেশ অন্যরকম, সেখানে থেকে কথার কপালে দিল ছুড়লে আইনস্টাইনের বৈবৈক্যন্যর জানলার কাচ ভেঙে যেত।

এ কর্ণা আমি সকলন করেছি লিও ফিজিয়ার্ডের স্বতীচারণ থেকে। এবার তাঁর ইরোজি রচনার একটি মূল পংক্তি উদ্ধার করে দিচ্ছি। পাছে অনুবাদ করতে গিয়ে তার অঙ্গহানি করে বসি—

The possibility of a chain reaction in Uranium had not occurred to Einstein. But almost as soon as I began to tell him about it, he realized what the consequences might be and immediately signified his readiness to help us and, if necessary, to 'stick out his neck', as the saying goes."

এমনই অকৃত্য মানুষ ছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন। ইউরেনিয়াম-এর চেন রিয়াকশানের কথা কখনও তাঁর মনে হয়নি—তিনি ছিলেন অন্য জগতে, সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ব্যস্ত। 'ইউনিকারেড ফিল্ড থিওরির' মাধ্যমে সর্ব-সমস্যা-সমাধানের চিন্তাতেই ছিলেন বিভোর; কিন্তু দুটি তরুণ বৈজ্ঞানিক মুখ খুলবার আগেই তিনি বুকে নিলেন ঠগা কী বলতে চান, কেন বলতে চান এবং কী তার প্রতিকার।

সপ্তাহখানেক পরে ফিজিয়ার্ড আবার ফিরে এলেন আইনস্টাইনের নির্জন আবাসে। এবার তাঁর সঙ্গী এডওয়ার্ড টেলার। সঙ্গে দুখানি চিঠির ড্রাকট। একটি সংক্ষিপ্ত পত্র, একটি বিস্তারিত। প্রফেসর আইনস্টাইন দুটি চিঠিই পড়ে দেখলেন। দীর্ঘতর পত্রটিই অনুমোদন করলেন তিনি। সেই দিলেন তাতে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই পত্রখানির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। আগরওজীকে লেখা রাজসিংহের পত্রের মত, বড়লটিকে লেখা বকীলানাথের নাইটহুড ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণার মত এ চিঠিখানিও বিশ্ব ইতিহাসের সম্পদ। তাই আরও বলি—চিঠিখানির বরানে মতদ্বৈষ আছে। স্বরং আইনস্টাইন বলেছেন, 'আমি শুধু সেই নিরেছিলাম টাইপ করা চিঠির নিচে। দায়-দায়িত্ব আমার, কিন্তু রচনা আমার নয়'।—বলেছিলেন অনেক পরে তাঁর জীবনীকার 'ভ্যালেনটিনকে। অপরপক্ষে ফিজিয়ার্ড বলেছেন, 'আমার যতদূর মনে পড়ে প্রফেসর আইনস্টাইন কার্মিন ডায়ায় ডিক্টেশান সেন এবং টেলার সেটা শর্তহায়ে লিখে নেন। সেইটা অবলম্বন করে আমি দুখানি চিঠি ইরোজিতে রচনা করি—একটা স্বল্প, একটা দীর্ঘ। প্রফেসর নিজেই তার ভিতর থেকে বৃহত্তরখানি বেছে নেন। পত্রের অনুবন্ধ হিসাবে আমি একটি মেমোরান্ডাম যুক্ত করে দিই।'

চিঠিখানি তাকে পাঠালে ঘাষণাপূরক ফলপ্রসূ হবে না। এমন কারও হাতে পাঠাতে হবে যিনি পাচ-কাগজে-বাত প্রেসিডেন্টকে বুদ্ধিয়ে দিতে পারেন। ডব্লিও আলেকজান্ডার সাক্স একজন কোটিপতি—প্রেসিডেন্ট কলভেটের বন্ধুহানীয়। হোয়াইট হাউসে যাতায়াত আছে তাঁর। সব কথা শুনে তিনি লাবিত্ব নিলেন। চিঠিখানি প্রেসিডেন্টকে পৌছে দেবেন এবং তাঁর শুরুই সম্বন্ধে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করবেন। সাক্স ইন্টারভিউ চাইলেন; কিন্তু সেটা শেতেই তাঁর সময় লাগল আড়াই ঘন্টা। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আইনস্টাইন যে চিঠির নিচে সেই সেন সেটি নিয়ে তিনি হোয়াইট হাউসে হাজির হলেন এয়ারই অক্টোবর। অর্থাৎ যুরোপখণ্ডে ততদিনে বিশ্বযুদ্ধের বয়স একমাস। আমেরিকা তখনও নিরপেক্ষ। দীর্ঘ পত্রটি নিজেই পড়ে শোনালেন সাক্স। বেশ বুঝতে পারছিলেন, তাঁর স্রোতা উসখুশ করছেন। ভক্তহায় বাহছে বলে নয়, আইনস্টাইনের মত বৈজ্ঞানিককে অসম্মান দেখানো হবে বলে ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিচ্ছেন না। সে যদি হোক, শত্রুপাঠ একসময়ে শেগ হল। প্রেসিডেন্ট মামুলি ধন্যবাদ জানিয়ে সাক্সকে 'নালেন, চিঠিখানি বেশ ইন্টারেস্টিং, তবে এ বিষয়ে



সরকারী তরফে এখনই কিছু করতে যাওয়া সম্ভবপর নয়। "যাহোক, আমি ভেবে দেখব।  
 এজিলাড, ফেরি, টেলার প্রভৃতি যে আশঙ্কা করেছিলেন, তাই বাস্তবে হতে বসেছে দেখে সাক্স  
 চিন্তান্তিত হয়ে পড়েন। বলেন, আমার আরও কয়েকটি কথা বলার ছিল।  
 প্রেসিডেন্ট তাঁকে ধামিয়ে দিয়ে বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এখন আর আমার সময় হবে না।  
 —তাহলে আবার হবে আসব।

একটু দ্বতমত করে প্রেসিডেন্ট বললেন, আশ্চর্য কাল সকালে আসুন। সাতটা। আলেকজান্ডার সাক্স  
 লিখছেন, "সে রাতে আমি একটি মুহুর্তের জন্যেও ঘুমাতে পারিনি। আমি বিলিয়াম কার্লটন হোটেল।  
 সারারাত ঘরের ভিতর পায়চারি করেছি। বেশ বুঝতে পারছি, রাতি প্রত্যাহেও অত্যন্ত অল্প সময়  
 পাব—বড়জোর পাঁচ-সাত মিনিট। ওর ভিতরেই কেমন করে কাবসিছি সত্য? এমন কিছু বলতে হবে  
 যা চরম নাটকীয়, যা মর্মস্পর্শে গিয়ে বিধবে প্রেসিডেন্টের। চমকে উঠবেন উনি। ঐদঙ্গীনা মুখে যাবে  
 মুহুর্তে। কিন্তু কী সেই নাটকীয় ভাষণ? শেষে হোটেল ছেড়ে আমি সামনের পার্কটায় চলে গেলাম।  
 বেশ মনে আছে, দ্বারোয়ান অবাধ হয়ে গেল—কারণ রাত তখন তিনটে। পার্কের বেঞ্চে বসে থাকতে  
 থাকতে হঠাৎ আমার মাথায় একটা ফণি খেলে গেল। হ্যা—হলে, ঐ অস্ত্রেই প্রেসিডেন্ট কাৎ হবেন।

"আমি ফিরে এলান হোটেল। ঘান করলাম। বড়িতে দেখলাম সাড়ে ছটা। হোয়াইট হাউসে  
 টেলিফোন করলাম। ওর সেক্রেটারি জানালো ব্রেকফাস্ট টেবিলে প্রেসিডেন্ট আমার জন্যে সকাল  
 সাতটায় অপেক্ষা করবেন। তৎক্ষণাৎ বসনা হয়ে পড়লাম আমি।

"খানা-কামরায় একাই বসেছিলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর চাকা-সেওয়া চেয়ারে। আমাকে দেখেই বসলেন,  
 বসুন। ব্রেকফাস্ট এমনিতেই বেশি খাওয়া হয়েছে—তার উপর আপনার গুরুত্বাক বক্তৃতাটা হজম হবে  
 তো?"

"উনি আমার সঙ্গে এমন রসিকতা করতেন মাঝে মাঝে। আমার মন কিন্তু সেদিন রসিকতায় জন্য  
 প্রস্তুত ছিল না। জবাবে আমি গভীরভাবে বললাম, আমি আপনার বেশী সময় নেব না। যা বলব তা  
 প্রফেসর আইনস্টাইন বলেছেন। তার অনুবঙ্গ হিসাবে একটা ছোট গল্প আমার মনে পড়ে  
 গিয়েছিল—গল্প নয়, সত্য ঘটনা। আমার মনে হল, সেটা আপনাকে বলে রাখা ভাল।

"প্রেসিডেন্ট পুনরায় ঠাট্টা করে ওঠেন, ও! বক্তৃতা নয়, গল্পো। বলুন, বলুন, আমার প্রচুর সময় হাতে  
 আছে।

"আমি বলে চলি—নেপোলিয় বোনাপার্ট তখন গোটা ইউরোপের মালিক। ব্যাকি আছে শুধু  
 ইংল্যান্ড। ট্রাফালগার যুদ্ধের ঠিক আগের কথা। রবার্ট ফুলটন নামে একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক এসে  
 দেখা করল বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়র সঙ্গে। নেপোলিয় তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম  
 করে ইংল্যান্ড আক্রমণের ব্যবহীয়া ব্যবস্থা করতে হচ্ছে তাঁকে। ঐ বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কথা বলার সময়  
 নেই। আড়াই মাস চেষ্টা করে শেষ-মেশ বৈজ্ঞানিক মাত্র কয়েক মিনিটের সময় পেলেন সম্রাটের সঙ্গে  
 সাক্ষাৎকারের। তার ভিতরে তিনি কোনক্রমে বললেন, তিনি এমন এক ধরনের জাহাজ প্রস্তুত করতে  
 পারেন, যা নাকি পালের হাওয়ায় চলে না, চলে বাষ্পের শক্তিতে। নেপোলিয় ওর কথা শুনে মনে মনে  
 হেসেছিলেন। পাল-জাহাজ শুধু বাষ্পে জাহাজ চলতে পারে এমন আশায়ে গম্ভীর তিনি বিশ্বাসই করতে  
 পারেননি। তবু সৌজন্যবোধে বলেছিলেন, আপনার পরিকল্পনাটা বেশ ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, ভেবে  
 দেখব আমি।

"আমি গল্প শেষ করলাম। সেনি প্রেসিডেন্টের মুখটা পছন্দম করছে।"  
 "পুনরায় বলি, সেদিন যদি নেপোলিয়র আর একটু দুরদর্শিতার পরিচয় দিতেন, আর একটু সন্ধান  
 দেখাতেন বৈজ্ঞানিকটিকে তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লেখা হত।  
 "আরও তিন-চার মিনিট নির্বাক বসে রইলেন কলজেলস্ট। প্রস্তাবমূর্তির মত। গভীর চিন্তায় মগ্ন।  
 তারপর তিনি একটি কাগজে কী লিখে খানা-কামরার অর্দাঙ্গির হাতে দিলেন। লোকটা ভিতরে গেল  
 এবং ফিরে এল একটা মসের বোতল নিয়ে। নেপোলিয়র সমসাময়িক ফরাসী কনিষাক। লীজবিন সেটা  
 রাখা ছিল কলজেলস্টের সেলারে। কী জানি কেন হঠাৎ এই মুহুর্তটিকে 'সেলিব্রেট' করতে চাইলেন  
 প্রেসিডেন্ট। দুশ বছরের পুরাতন মদ নিয়ে হাতে ঢাললেন দুটি পাত্র। একটা বাড়িয়ে দিলেন আমার

দিকে, অপরটি তুলে আমাকে ইস্তিত করলেন। আমার স্বাস্থ্যপান করে, পুরো পাঁচ মিনিট পরে নাগবত।  
 ভেবে কলজেলস্ট বললেন, "আলেক্স! তুমি মোকদা যে কথটা বলতে চাও তা তো এই: নাৎসীরা  
 পররাষ্ট্রবিষয়ের আমাদের যেন জিজিয়ে না দেয়। কেমন হো?"  
 "ঠিক তাই।"

"তৎক্ষণাৎ বেল বাজলেন প্রেসিডেন্ট। তাকে পাঠালেন তাঁর মিনিটারি অ্যাটাশে জেনারেল 'পা'  
 ওরফেনকে। পরমুহুর্তে এসে উপস্থিত হলেন জেনারেল। সম্মুখানে ঝাঁপালেন আদেশের অপেক্ষায়।  
 আইনস্টাইনের কাছ থেকে পাওয়া চিঠির গোছা তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরে প্রেসিডেন্ট শুধু বললেন একটা  
 কথা:

"—পা। দিস 'ডিকোডার্স' অ্যাকশন।"



৥ ছবি ৥

পা। দিস 'ডিকোডার্স' অ্যাকশন।

ব্যাল। আর কিছু নয়। ইমিডিয়েট নয়, এমার্জেন্সি নয়, টপ-প্রায়োরিটি নয়, এমন কি টপ-সিক্রেটও  
 নয়। কোন বিশেষণের তার নেই আবেশটার। সালামটা শুকুম: পা। এটির ব্যবস্থা হওয়া দরকার।  
 তা হল। ব্যবস্থা হল। বিশেষণ-বিমুক্ত সেই আদেশের 'অ্যাকশন'টার জ্যাত নির্ণয় করব আমরা। তার  
 অবহীনতিক মূল্য, গোপনীয়তা এবং ব্যাপকতা। প্রথমটায় কাজ শুরু হল ছোট করেই। সারা মার্কিন  
 ভূখণ্ডে লগটি রিভার্ট গ্রুপ এ নিয়ে গোপন গবেষণা শুরু করলেন। প্রথম বছরে অর্থ ব্যয়াদ করা হল যাত্র  
 তিন লক্ষ ডলার। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সেটা ব্যাপক আকার ধারণ করল। এক সময়ে বৈজ্ঞানিকের  
 দল জানলেন, তাদের চেয়ে কৃপের তারের বিদ্যুৎবাহী ক্ষমতা বেশী। তাঁদের কিছু রূপো চাই।  
 ট্যাকশানের আওতা-সেক্রেটারি জানিয়েল বেল বললেন, বেশ, দেব। বলুন কতটা রূপো চাই?  
 মানহাটান প্রডাকশনের চীফ বললেন, ধরুন আশাতত পনের হাজার টন।

জানিয়েল বেল আরও উঠে বলেন, টন। কী বলছেন মশাই। রূপের ওজন কখনও টনে হয়? হয়  
 অউন্স।

মানহাটান চীফ লেন্সি প্রোত জবাবে কিছু বলবার আগেই তাঁর সহকারী বৈজ্ঞানিকটি বলেন, সিক  
 আছে। তাই বলছি—'অহিত পরেই ফোর ইউ টেন দু ম্য পাওয়ার এইট।'

জানিয়েল বেল-এর মুখের নিমাশে ঝলে পড়ে। বলেন, তার মানে?  
 -পনের হাজার টন ইলুম্বাকালটি  $5.4 \times 10^4$  আউন্স। আপনি আউন্সে জানতে চাইছিলেন তো? তাই  
 বলছিলাম আর কি।

বেল তাঁকে ধামিয়ে দিয়ে বলেন, ধাক স্যার, আর বিশেষ জাহির করতে হবে না, ঐ পনের ইলুম্বাকাল-ট  
 রূপেই পাঠিয়ে দিছি।

আর গোপনীয়তা? কলজেলস্ট মাত্রা যাবার পর হারী টুম্যান যখন এসে বসট্রেনে তাঁর শুন  
 নিগাসকে—চোখই এটিপল, 1945-এ—তখন তিনিও জানতেন না এতবড় মানহাটান প্রজেক্টের কথা  
 চেয়ারে বসার পরে তিনি সেটা শুনেছিলেন। তার চেয়েও মজার কথা হচ্ছে সেনেটর হারী টুম্যা  
 1940 সালে একটি কমিটির চেয়ারম্যানরূপে নিৰ্বাচিত হন—'কমিটি টু ইনভেস্টিগেট দ্য ন্যাশনাল  
 ডিফেন্স প্রোগ্রাম'। যুদ্ধপ্রচেষ্টায় যে সরকারী অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার সাধারণ নির্ণয় কা  
 সেনেটকে জানানোর লক্ষ্যে এই অনুসন্ধান কমিটির। তার চেয়ারম্যানরূপে কাজ করতে গিয়ে টুম্যান  
 জানতে পাহলেন—কী একটা মানহাটান প্রজেক্ট কোটি কোটি ডলার ব্যয়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পে দৈনিক  
 নাকি এত লক্ষ লোক ব্যটিছে—টেনে আর লবিংতে লক্ষ লক্ষ টন কাচামাল ঐ কারখানায় ঢুকছে, অর্থাৎ  
 এ পর্যন্ত একটা ছোট্ট প্যাকেটও 'কিনিস্ত শুদ্ধ' হিসাবে বার হয়ে আসেনি। টুম্যান একটা প্রকাণ্ড  
 কেলেক্টরী হাতে-নাতে ধরলেন বলে ঐ প্রকল্প সত্তেজমিনে দেখবার জন্য প্রস্তুত হলেন। গবর পেয়ে  
 বুদসচিব বৃদ্ধ সিমসন সেনেটর হারী টুম্যানকে ফোন করলেন, বললেন, সেনেটর, আপনাকে একটা  
 ব্যক্তিগত অনুরোধ জানানতে এসেছি। আপনি মানহাটান প্রজেক্ট সংঘর্ষে কোনও অনুসন্ধান করতে  
 না।

বিশ্বায়ত্তে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন সেনেটর হারী ট্রুম্যান। বসেছিলেন, কোন মিস্টার সেক্রেটারি? —কেন, তাও আমি বলতে পারব না। শুধু জানাতে পারি, পৃথিবীর ইতিহাসে মানহাটান-প্রকল্প সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে গোপন প্রকল্প। এর পাই-পায়সা খরচের জন্য আমি যুদ্ধশেষে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকব। আপনার অনুসন্ধান কার্য আমাদের সমস্ত চেষ্টি ব্যর্থ করে দেবে।

একটি রাজনীতিক এই সেক্রেটারি অফ ওয়ার-এর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল সেনেটর ট্রুম্যানের। তিনি তৎপরভাবে অনুসন্ধানের শাসন প্রত্যাহার করেছিলেন। তার পাঁচ বছর পরে ট্রুম্যান আমেরিকার প্রেসিডেন্টরূপে নির্বাচিত হন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে অন্যান্য ব্যাপারটি বুলে বসেছিলেন যুদ্ধসচিব হেনরি স্টিমসন। তার আগে নয়।

আর ব্যাপকতা? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে আট-নশটি বিভিন্ন কেন্দ্রে একত্রে চলেছিল গবেষণা কার্য। কয়েক হাজার বৈজ্ঞানিক তাতে নিযুক্ত। 1942 সাল-তক্ বিজ্ঞানীরা পাঁচ-পাঁচটি বিকল্প পথে সমাধানের পথ খুঁজতে শুরু করেছেন। পাঁচটি পথের কোন পথ শেষ লক্ষ্যে পৌঁছাবে তা কেউ বলতে পারে না। তার ভিতর তিনটি পথ হচ্ছে ইউরেনিয়াম-বোমা তৈরী করার প্রচেষ্টা, দুটি প্লুটোনিয়াম-বোমা। বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন, ইউরেনিয়াম-বোমা তৈরীর তিনটি-বিকল্প পথ আছে। প্রথমত ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক উপায়। তার জন্য খোলা হল দেশের দুই প্রান্তে দুই কেন্দ্র, বার্কলেতে এবং ওক রিজ। দ্বিতীয় পথ—গ্যাসীয় ডিফুশন-মেথড। সে পরীক্ষাকার্য চালানো হল নিউইয়র্ক এবং ডেট্রয়েট-এ। তৃতীয় পথ হল—সেপ্ট্রিফুগ-পদ্ধতি। অনুরূপভাবে প্লুটোনিয়াম-বোমা তৈরী হতে পারে দুটি পদ্ধতিতে—গ্রাফাইট রিফ্রাকটারে অথবা ভারী জল দিয়ে।

বস্তুত পাঁচটি অল্প গলিতেই তখন পথ হাথড়াছেন বিশ্ববিজ্ঞত বৈজ্ঞানিকরা। পাঁচটি বিকল্প-পদ্ধতিতেই কোটি কোটি ডলার খরচ হচ্ছিল। কোন পথই ঠিক ভাণ্য করতে পারছিলেন না। কোনটি অল্প গলি এবং কোন পথে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে কেউ তা জানে না।

এই কাকে বলে রাশি—আমাদের কাহিনীর বিশ্বাসঘাতক ডেপুটি-সেক্রেটারি রাশিয়া এই পাঁচমুখার মোড়ে বিভ্রত হয়নি—সোজা এক পথে এগিয়ে গিয়েছিল। তাতে কোটি কোটি রুবল বেঁচে গিয়েছিল রাশিয়ার।

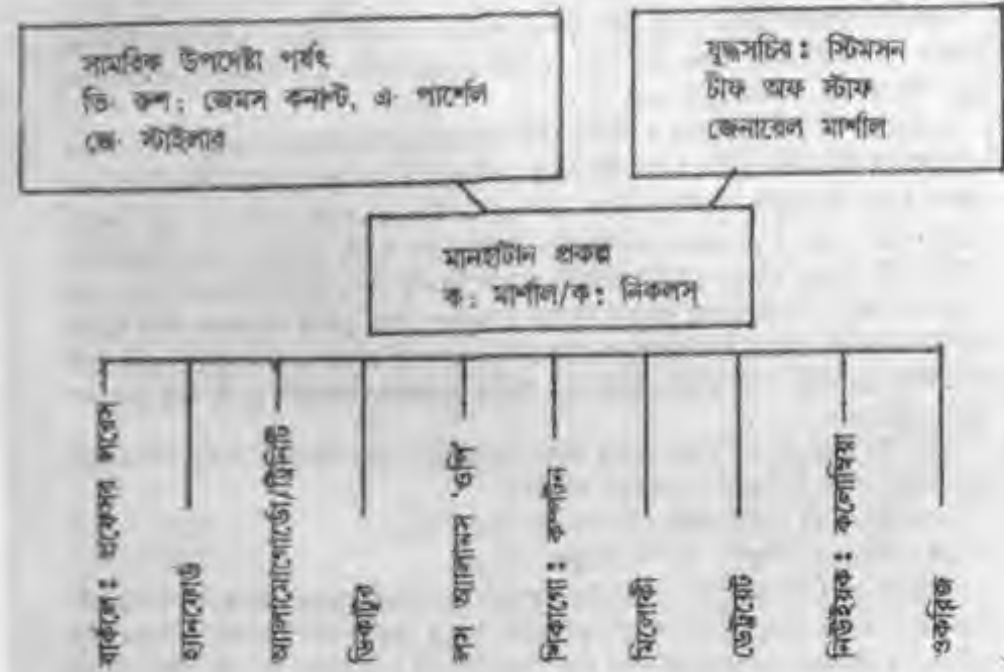
মানহাটান-প্রকল্পের এক-এক প্রান্তে যারা কাজ করেন, তারা অপর প্রান্তের খবর জানেন না। গোপনীয়তার প্রয়োজনে নিজ ল্যাবরেটোরি বাইরের খবর কেউ পান না। শুধু তাই নয়—প্রত্যেকে শুধু নিজ নিজ পরীক্ষার ফলাফলটুকুই জানতে পারেন, তার বেশি নয়। এ ব্যবস্থার গোপনীয়তা বলা হয় 'কন্ট্রোলড কন্টাক্ট'। যে পরীক্ষার ফল চূড়ান্তভাবে জেনে ফেলেছেন ওকরিজের বিজ্ঞানীরা সেগুলিই হয়তো কয়েক বার করছেন বার্কলের অধ্যাপকেরা। কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন—এভাবে চলবে না। সমগ্র মানহাটান-প্রকল্পের একজন সর্বময় কর্তা চাই। নিসেন্ধেই তিনি হবেন একজন সামরিক অফিসার। শুধু তাই নয়—চাই একজন প্রথম শ্রেণীর অল্পবয়সী পদার্থবিজ্ঞানী, যিনি প্রতিটি কেন্দ্রের সর্বোদয় সংগ্রহ করে ঐ সর্বময় কর্তাকে জানাবেন। এক কেন্দ্রের খবর অপর কেন্দ্রের প্রয়োজনবোধে জানাবেন।

যুদ্ধসচিবের নিজের কাজ অমুদ্রিত—যুদ্ধের কাজ। সারা পৃথিবীতে মার্কিন সৈন্য তখন যুদ্ধ করছে। তাই এই মানহাটান প্রকল্পের জন্য তিনি একটি আন্তর্জাতিক সেট-আপ তৈরী করে বিসেল। তৈরী হল একটি উপদেষ্টা পরিষদ। তার চারজন সভ্য। যুদ্ধসচিবের পক্ষে রয়েলেন চীফ-অফ স্টাফ জেনারেল লর্ড মার্শাল। তাঁদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করবেন ঐ সর্বময় কর্তা জেনারেল লেসলি গ্রোভস। তাঁর মিলিটারী সহকারী রয়েলেন কর্নেল মার্শাল ও কর্নেল নিকলস। ছক তৈরী হল (পৃঃ 38)।

এই দশটি কেন্দ্রে সৈন্য বিজ্ঞানী কাজ করে গেছেন তাঁদের মধ্যে দুটিসেই সব কয়টি কেন্দ্রের ফল রাখতেন। কিন্তু মূল ভূমিকা ছিল দুজনের—সামরিক কর্তা জেনারেল গ্রোভস এবং বৈজ্ঞানিক ডক্টর ওপেনহাইমারের। এদের দু-জনের আর একটি কাজ থেকে দেখতে হবে আমাদের।

1942 সালের সত্যতই সেপ্টেম্বর লেসলি গ্রোভসের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। সেদিনই সে বদলির অর্ডার পেল। সাগর-পারে যেতে হবে তাকে, আমেরিকার বাইরে। এই বছর সে সে-সে-সে

আটলান্টিক। গ্রোভস মিলিটারী স্কুল থেকে পাশ করে বের হয় 1918-তে। ঠিক সে বছরই যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেবার সৌভাগ্য হয়নি বেচারার। তারপর এই দীর্ঘ চকির বছর গড়ে একটাও যুদ্ধ করার সুযোগ সে পাননি। অথচ পাশে বাপে দ্বারে দ্বারে উঠেছে উপরে—এখন সে



কর্ণেল। এবারকার বিশ্বযুদ্ধে তার দায়িত্ব ছিল 'মিলিটারী এঞ্জিনিয়ার বোম্বার্ডার'। এতদিন পরে কর্নেল গ্রোভস বদলির অর্ডার পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বন্ধুদের সেখানো অর্ডারটা—এবার সে সাগর-পারে সফল যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে।

কলুজা সেটে গ্রোভস এসে হাজির হল তার বড়কর্তার ঘরে। সোজা জেনারেল সন্মারডেল ওকে সম্মান করে বসালেন। বসলেন, অর্ডার পেয়েছে।

—পেয়েছি জেনারেল, বনাবাশ। কখন আমি আমার বর্তমান কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দে-ও?

—এখনই। তোমার সবকিছুটা তৈরী আছে।

একটি ইতস্তত করে গ্রোভস বলে, কোন বগাছনে যেতে হবে আমাকে?

—কখন? না না যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে না তোমাকে আসে। তোমার কাজ এই ওয়াশিংটনেই।

বিশ্বস্ত হতবাক হয়ে পড়ে গ্রোভস। মীরবে তার বদলির অর্ডারখানা বাড়িয়ে ধরে। সেটা 'এক্সপেরিমেন্টাল অ্যান্ডাইনস্ট্রেট'—সাগরপারে যাবার নির্দেশপত্র।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি। আমরা চেয়েছিলাম, তোমার সহ-কর্মীরা কুল খবরই পাক। জানে, তুমি যেন বিসেল যান। আসলে তোমাকে আমরা নিয়োগ করছি মানহাটান প্রকল্পের সর্বময় কর্তারূপে। কাজটা তোমার মত এঞ্জিনিয়ার-মোড়ার উপযুক্ত।

এর পরের গ্রোভস বলে, জেনারেল। আমি কোন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করিনি। এই 'এঞ্জিনিয়ার মোড়ার' খেতার থেকে এবার আমি মুক্তি পেতে চাই। আপনি দয়া করে—জেনারেল ওকে মনোপথে খামিয়ে দিয়ে বলেন, কর্নেল, যে কাজটা তোমাকে দেওয়া হচ্ছে সেটা এ

বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আইসেনহাওয়ার, প্যাটন অথবা মর্শির উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে একটুলও কম নয়। দ্বিতীয়ত, এমন্য তোমাকে নির্বাচন করেছেন যুদ্ধচরিত্র সেনারী স্টিমসন নিজে—অন্ততঃ নশজন সম্ভাব্য ক্যান্ডিডেটের ভিতর থেকে বেছে নিয়ে। শেষ কথা, হেন্সিডেন্ট অয়ং তোমার নিয়োগপত্রে সই দিয়েছেন। কিছু বলবে?

যজ্ঞাহাতের মত দাঁড়িয়ে ওইল লেসলি গ্লেভুস।

মানহাটান প্রকল্পের সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে শূণ্ণ-কোডের মত সব কয়টি কেন্দ্র একবার করে ঘুরে এল গ্লেভুস। সব কয়টি কেন্দ্র সরেজমিনে দেখল। প্রতিটি কেন্দ্রের উত্থাপনই বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আলোচনামূলক, পরিচয়মূলক। অবাক হয়ে গেল সে।

সর্বপ্রথমেই সে এল নিয়উয়র্কে, কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা কীচা-ভারে ঘেরা অংশ। এখানে নাকি গ্যাসীয় ডিফিউশন পদ্ধতিতে ইউরেনিয়ামকে পৃথকীকরণ করার প্রচেষ্টা হচ্ছে। 'ইউরেনিয়াম-ওর' থেকে  $U_{235}$  নিষ্কাশনের প্রচেষ্টা। বাইরে সাইন-বোর্ড টাঙানো আছে, 'এস-এ-এম' অর্থাৎ Substitute Alloy Materials। লোকচক্ষুকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এ অদ্ভুত নাম। ল্যাবরেটোরির কর্ণধার ডক্টর হ্যারল্ড ইউরে—নোবেল পুরস্কারে ভূষিত বিজ্ঞানী। কিন্তু সৈনিক কাজকর্ম দেখা শেখা করেন ডাঃ জ্যানিং, পৃথিবী বছর বয়সের উৎসাহী বৈজ্ঞানিক। ওরা দুজনে গ্লেভুসকে নিয়ে গ্যাসীয় ডিফিউশন পদ্ধতি দেখানোর জন্য বার হলেন। কিন্তু গ্লেভুস বাধা দিয়ে বললে, ডক্টর ইউরে, ল্যাবরেটোরি পরিদর্শনের আগে নয়া করে আমাকে বুঝিয়ে দিন গ্যাসীয় ডিফিউশন পদ্ধতিটাই বা কী, অগ্নি কেন ওটা করতে চাইছেন।

ডক্টর ইউরে বলেন, তার আগে আপনি বলুন—পারমাণবিক-বোমা জিনিসটা কী-ভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে সেটা কি আপনি বুঝেছেন? জানেন?

—ভালভাবে নয়। মূল তথ্যটা আমাকে দয়া করে বলুন।

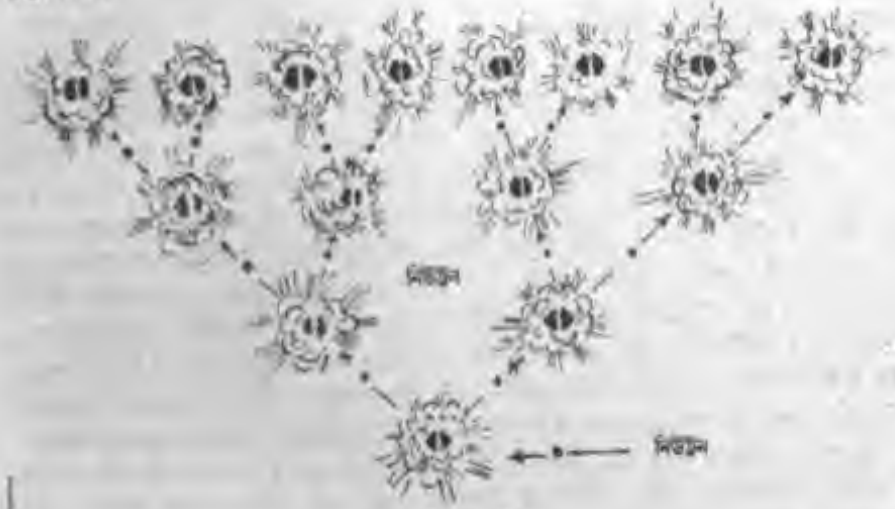
ডক্টর ইউরে যা বললেন তার সর্জিকগুণের এইরকম—

ইটালিতে ফের্মি এবং জার্মানিতে অটো হান ইতিপূর্বেই ইউরেনিয়াম পরমাণুর অস্তর বিদীর্ণ করেছেন। তাতে ইউরেনিয়াম পরমাণু দু-টুকরো হয়ে রূপান্তরিত হয়েছে জিপটন আর বেরিয়ামে। পারমাণবিক শক্তিও জন্ম নিয়েছে—কিন্তু তা কবিরকের জন্য। তা হোক, ঐ সঙ্গে আমরা দেখেছি নতুন দু-তিনটি নিউট্রন বিমুক্ত হয়েছে। সেই দু-তিনটি নিউট্রন তীব্রবেগে ছুটে গেছে এবং অন্যান্য পরমাণুর সঙ্গে খাক্সা খেয়ে শেষ পর্যন্ত থেমে গেছে। এখন যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, ঐ দু-তিনটি নবলব্ধ নিউট্রন আর দু-একটি পরমাণুর অস্তর বিদীর্ণ করে তবে আমরা আবার কিছু শক্তি পাব এবং পাব দুই-তিনকুনে চারটে নতুন নিউট্রন। সে দুটি আবার চার-তিনকুনে আটটা, তা থেকে আট-তিনকুনে বোমোটা নিউট্রন মুক্ত হতে পারে। এইভাবে বিশ-শাল চললেই প্রাক লক্ষ নিউট্রন মুক্ত হবে, পঁচিশ শালে কোটি কোটি পরমাণু বিদীর্ণ হয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাবে। ব্যাপারটার চিত্রকল্প হবে এই রকম (চিত্র 7)। লক্ষণীয় চিত্র 6 আমরা দেখিয়েছি, ইউরেনিয়াম পরমাণু বিদীর্ণ হওয়ায় তিনটি নিউট্রন ছুটে বেগিয়ে গিয়েছিল। চিত্র 7-এ তার যে-কোন দুটির চেন-রিয়াকশন দেখানো হয়েছে। তিনটিই যদি কার্যকরী হয় তাহলে অক্সাশ্র মতে 3, 9, 27, 81 ..... এভাবেও চেন-রিয়াকশন হতে পারে।

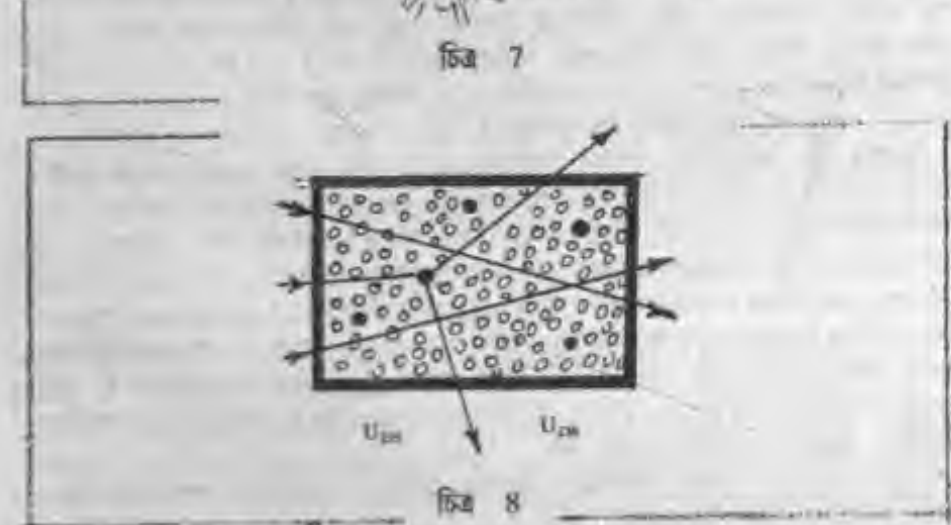
মজা হচ্ছে এই যে, ওটা তখনই সম্ভব যখন মুক্ত নিউট্রনের আশেপাশে যথেষ্ট পরিমাণ  $U_{235}$  পরমাণু থাকবে। পূর্বাণ্যক্রমে আকরিক ইউরেনিয়ামে প্রতিটি  $U_{235}$ -এর জায়গায় ডেক্শটি  $U_{238}$  থাকে। ফলে অধিকাংশ নিউট্রনই লক্ষ্যবর্তী হয়। চিত্র 8-এ ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। কালো কালো বালগুণি  $U_{238}$ , সাদাগুলি  $U_{235}$ । বা-সিক থেকে আমরা তিনটি নিউট্রন বুলাই দেড়েছি। ওরা যাক দু-নম্বর বুলেট খটনাছলে গিয়ে একটি  $U_{235}$  পরমাণুকে বিছাও করল, তা থেকে দুটি নতুন নিউট্রনও বিমুক্ত হল। কিন্তু চেন-রিয়াকশন হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? চতুর্দিকেই সে  $U_{238}$ । (চিত্র 8)

ইউরে বললেন, সেজন্য আমরা এখানে আকরিক ইউরেনিয়াম থেকে  $U_{235}$ -কে পৃথকীকরণ করছি। এমন অবস্থা করতে চাই যাতে নিউট্রন-বুলেটকে যে কীড়ের দিকে ছোড়া হবে সেখানে শুধুমাত্র  $U_{235}$ ই থাকবে। তাহলে চিত্র 7-এর মত চেন-রিয়াকশন অর্থাৎ চক্রাবর্তন-পদ্ধতি চালু হয়ে যাবে—দুই, চার,

অষ্ট, সোলো, বরিশ, টোকাই ইত্যাদি-ইত্যাদি। অর্থাৎ পঁচিশ-বিশ শাল পরে কোটি কোটি পরমাণুর বিস্ফোরণ।



চিত্র ৭



চিত্র ৮

—কীভাবে সেটা করতে চান?

—ইউরেনিয়াম থেকে উৎপন্ন ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লুরাইড গ্যাসকে উত্তপ্ত করে একটা ফিলটার টিউব-এর ভিতর দিয়ে পাঠাতে হবে। ঐ ফিলটার টিউবে থাকবে অসংখ্য অতিক্রম ছিদ্র। তাহলে হালকা  $U_{235}$  পরমাণুগুলো ভারী  $U_{238}$  পরমাণু থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

—কৃপায়াম।

—জায়ে না, বোঝেননি। প্রথমতঃ, ইউরেনিয়াম হচ্ছে সবচেয়ে ভারী ধাতু। তাকে তরল এবং শেষমেশ গ্যাসে রূপান্তরিত করাই এক অকল্পনীয় ব্যাপার। প্রচণ্ড উত্তাপ লাগে। দ্বিতীয়তঃ, গ্যাসীয় ইউরেনিয়াম অত্যন্ত করোমিড। পাইপগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে। তৃতীয়তঃ, ঐ যে আমি বললাম 'অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র' ওটা তো অবেজানিক উক্তি। 'অসংখ্য' শব্দটার অর্থ হচ্ছে কয়েক শত কোটি। এবং 'ছোট ছোট' শব্দটার ব্যাখ্যা হচ্ছে প্রতিটি ছিদ্রের ব্যাস এক মিলিমিটারের দশ হাজার ভাগের একভাগ। মোড়স, ক্রমাল দিয়ে মুখটা মুছলেন।



—আমার বক্তব্যটা শেষ হয়নি জেনারেল। ইউরেনিয়াম 238 অত্যন্ত দূর্বল ও দুর্মূল্য পদার্থ। আর তা থেকে আমরা পরমাণু-বোমা বানানোর উপযুক্ত ইউরেনিয়াম 235 পাচ্ছি 0.7 শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি দেড়শ গ্রামে এক গ্রাম।

গ্রেভস্ ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় হলেন।

পরবর্তী পরিদর্শন শিকাগোতে। এখানে ইউরেনিয়াম নয়, স্ট্রুটিনিয়াম নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে। সর্বময় কর্তা আর্থার কম্পটন। তিনি ছাড়া আরও দুজন নোবেল-লরিয়েট কর্মরত করলেন গ্রেভসের সঙ্গে। তারা হচ্ছেন ইটালিয়ান ফের্মি এবং জার্মান ফ্রাঙ্ক। দুজনেই ফ্যাসিস্ট আর ন্যাসী রাজ্যের প্রাক্তন বাসিন্দা। ফের্মি এসেছেন পালিয়ে, ফ্রাঙ্ক বিতাড়িত হয়ে। গাটেনগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এছাড়াও ঠিক সঙ্গে মিলিত হলেন উইগনার আর বজিলার্ড—যারা গিয়েছিলেন আইনস্টাইনের পর আহরণে।

এর ভিতর ইউজিন উইগনার একটি অদ্ভুত চরিত্র। এর কথা আগে বিস্তারিত বলা হয়নি। এই প্রতিভাশালী প্রাচ্যবীর্য পদার্থ-বিজ্ঞানীর সৌজন্য আর ভয়ভা-জ্ঞান ছিল প্রবাসের মত। মেজাজ ব্যাধাপ করা জিনিসটা যে কী, তা তিনি জানতেনই না। বজিলার্ড তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন, উইগনারের সঙ্গে আমি বনিষ্ঠভাবে বীথনিন মিশেছি। এমন অমায়িক ভদ্র মানুষ আর হয় না। কখনও তাঁকে রাগতে দেখিনি, কখনও কাউকে গাল্যগালা করতে শুনিনি। না। ভুল বললাম। জীবনে একবার তাঁকে রাগতে দেখেছিলাম। সেবার উনি আমাকে গাড়ি করে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছিলেন। উনি বসেছেন সিটারিজে, আমি তাঁর পাশে। কোথাও কিছু নেই “ট্রান্সিক-কন্স” শিকের তুলে ভাষা থেকে একটা গাড়ি ছড়মুড় করে এসে পড়ল আমাদের সামনে। উইগনার কোনক্রমে ত্রেক করে দুখীনা এড়িয়ে ফেলেন। দুটো গাড়িই ধাক্কিয়ে পড়েছে। লক্ষ্য করে দেখি, ওপাশের গাড়িটার চালক মরে চুত হয়ে আছে। সেই একদিনই উইগনারকে ক্ষেপে যেতে দেখেছিলাম। হঠাৎ চিৎকার করে উইগনার বললেন: “সে টু হেল—” পরমুহুর্তেই স্বভাববিনয়ী স্বভাববৃত্তিভাবেই ছোট্ট করে যোগ করলেন “—ব্রীজ!”

শিকাগো গ্রুপের কর্তা ছিলেন কম্পটন; কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র হচ্ছেন এনরিকো ফের্মি। উনি কম কথার মানুষ। সব আলোচনাতেই দেখা যেত তিনি তাঁর অভিমত জানাতেন সবার শেষে। আর অনিবার্যভাবে প্রমাণ হত—ফের্মির বক্তব্যই নির্ভুল। অথচ অত্যন্ত নিবর্তিমামী ব্যক্তি। আত্মপ্রশংসা যে তিনি করতেন না তা নয় কিন্তু ক্ষেত্র বিজ্ঞান নয়। নিজে যে একজন মস্ত গীতাক, মস্ত পদার্থবিদ্যেই অথবা গোয়েন্দা গল্পের আসল অপরাধীকে সবার আগে বরে ফেলার পারদর্শিতা তাঁর আছে একথা সত্যভাবে বলতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উঠলেই উনি গভুড়িত হতে পড়তেন। বলতেন—এও সব জ্ঞানীত্ববীরা আছেন, ওদের জিজ্ঞাসা করুন। ফের্মির একটি বিলাস ছিল কম্পুটারের সঙ্গে পাজা দেওয়া। তাঁর ছোট্ট ব্রাইড-ক্ল হাতে উনি কম্পুটারের সঙ্গে লড়াই করতেন। কখনও উনি জিততেন, কখনও কম্পুটার। মানসাত্মক এমনই অদ্ভুত প্রতিভা ছিল তাঁর।

ফ্রাঙ্কের কথা আগেই বলেছি। সহকর্মীদের অগমানে বোম্বার পদভ্যাগ করে দেশত্যাগী হয়েছিলেন ফ্রাঙ্ক। অভিজাতা ছিল তাঁর রক্ত।

বাঁকী বইল শিকাগো-গ্রুপের কর্তা আর্থার কম্পটনের পরিচয়। তাঁর সহকর্মীরা ঠাট্টা করে বলত, কম্পটন শিকাগো-গ্রুপের প্রকৃত গীতার নন—ডেপুটি গীতার। মূল নিয়ামক হচ্ছেন তাঁর বিত্তি—বেটি কম্পটন। নোবেল-লরিয়েট বৃদ্ধ কম্পটন হাসতেন সেকথা শুনে। কারণ ছিল। তাঁকে যখন শিকাগো-গ্রুপের কর্তৃত্ব দেবার প্রস্তাব হল কম্পটন সরাসরি বড়কর্তাদের বলেছিলেন, আমি এক শর্তে এ পদ গ্রহণ করতে রাজি আছি।

—কী শর্ত বলুন?

—আমার ক্রীকেও ক্রিয়াক্রম দিতে হবে। পদাধিকারবলে আমি যেসব গুপ্ত কথা জানব তা আমার ক্রীকেও জানাতে পারি আমি। পদাধিকারবলে আমি যেসব গোপন ছানে যাব, আমার ক্রীকেও সেখানে যাবার অধিকার থাকবে।

এ অদ্ভুত অনুপ্রবেশ অবাক হয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। তবু মেনে নিতেছিলেন তারা। বেটি কম্পটন শিকাগো ল্যাবরেটরির নানান কাজ করতেন। সবাই তাঁর আদেশ মেনে চলত। সর্বজনপ্রচেষ্টা কর্তৃকই ছিলেন তিনি শিকাগো বীক্ষণাগারে।

গ্রেভস্ পরিদর্শনে আসার ঠিকার তাকে নিয়ে নিয়ে বসলেন লেকচার হলে। গ্রেভস্ প্রশ্ন করলেন, একটা পরমাণু বোমার জন্য কতটা স্ট্রুটিনিয়াম দরকার?

ফ্রাঙ্ক বললেন, সেটা নির্ভর করছে আপনি কত বড় বোমা চান তার উপর।

—কতন বশ হাজার টন TNT-বোমার বিস্ফোরণের উপযুক্ত পারমাণবিক বোমা।

তৎক্ষণাৎ শুক হয়ে গেল যোগ-বিত্রোণ-ইনট্র্যাণ্ড ক্যালকুলাসের অঙ্ক। ব্র্যাকবোর্ডে পড়তে শুরু করল হিচহিবিবি সেবা। হাতের ঠোড়ের মত চিহ্ন সব। আলফা-বিটা-বিটা-এপসাইলনের বন্যায় ভেসে গেল কালো বোর্ড। সবাই তাকিয়ে আছে একদুটো ব্র্যাকবোর্ডের দিকে। একমাত্র বাস্তবিক এনরিকো ফের্মি। তিনি আপন মনে ব্রাইড ক্ল খবছেন। হঠাৎ গ্রেভস্-এর নজর হল পঞ্চম ধাপ থেকে ষষ্ঠ ধাপে আসবার সময় একটা ভুল হয়েছে। বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা। তিন-তিনজন নোবেল-লরিয়েট বিজ্ঞানী উপস্থিত হয়েছেন। আছেন বজিলার্ড, উইগনারের মত বিচক্ষণ বিজ্ঞানী। তাঁর মনে হল এটা কি ঠিক ইচ্ছা করে যেন শেতেছেন? মানহাটিন প্রকল্পের সর্বময় কর্তা কতটা অঙ্ক বোঝেন তাই কি বুকে দিতে চান তারা? তা সে যাই হোক হঠাৎ উঠে দাঁড়ান তিনি। বলেন, মাপ করবেন, ঐ ষষ্ঠ ধাপটা আমি ফুকে পারছি না। এর আগের ধাপের  $10^5$  পর্বের ধাপে হঠাৎ  $10^6$  হল কেমন করে?

পুনিতত্ত্ব তৎক্ষণাৎ বলেন, ধন্যবাদ। ওটা নিছক ভুলই।

ভুলটা সংশোধন করেন তিনি। গ্রেভস্ আত্মবিশ্বাস ফিরে পান।

শেষ ফলাফলটা যখন বলা হয় তখন গ্রেভস্ জানতে চাইলেন—আশানামের এই সংখ্যা কত পারসেটি শুদ্ধ? অর্থাৎ কতটা এমিক-ওমিক হতে পারে?

কম্পটন তৎক্ষণাৎ বলেন, কতন বশ পারসেটি শুদ্ধ।

এমন আত্মব কথা জীবনে পোনেননি গ্রেভস্। বললেন মাত্র বশ পারসেটি। বলেন কি?

—হ্যাঁ। বর্তমানে এর চেয়ে নির্ভুল উত্তর অশাস্য মতে আর লাওয়া যাচ্ছে না।

গ্রেভস্ তখন ভাবছিলেন একটা নিমন্ত্রণ বাড়ির কথা। কাটিয়ারকে উনি বলছেন, আজ আমার বাড়ি কিছু লোক যাবে। স্বাক্ষরের মোখাড় দিতে হবে আপনাকে। দেখবেন, স্বাক্ষরে কম না পড়ে যেন। আর অপচরও না হয়।

কাটিয়ার জানতে চাইল, কতজন লোক যাবে স্যার?

—এই কতন জনা বশেক অথবা হাজার খানেক!

লোকেরা মশভাণ নির্ভুল উত্তর। কারণ ‘মশ’ হচ্ছে ‘একশর’ মশ-শতাংশ। নির্ভুল উত্তর, আগার ‘হাজার’-এর মশ-শতাংশ। নির্ভুল উত্তর হচ্ছে ‘একশ’। কব এবার আত্মরেণ আয়োজন।

শিকাগো ল্যাবরেটরির পরিদর্শন সেজে ব্রিগেডিয়াম-জেনারেল গ্রেভস্ আসছিলেন ফ্রাঙ্কের অ্যাপার্টমেন্টে। সেখানেই তাঁর নৈশ-আহারের ব্যবস্থা। ফ্রাঙ্ক নৈশাহারে নিমন্ত্রণ করেছেন পরিদর্শককে। পছন্দের অমর প্রায়ে একটা নরতলা বাড়ির একটি অ্যাপার্টমেন্টে তখন বাস করতেন সতীক জেমস্ ফ্রাঙ্ক। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ফ্রাঙ্ক নিজে, পাশে বসে আছেন গ্রেভস্। কথা প্রসঙ্গে ফ্রাঙ্ক বললেন, আমি বুঝতে পারছি আপনার অসহজতা। টেন পারসেটি কারের উত্তর দিয়ে আপনি কী করবেন? কতটা স্ট্রুটিনিয়াম লাগবে, কতটা ফিশনের মেটেরিয়াল লাগবে কিছুই বুঝতে পারছেন না। কিন্তু কী করা যাবে কখন? আর কিছুদিন গবেষণা না করলে আমরা এর চেয়ে কিছু কম-ভুল ফিশার দিতে পারছি না।

গ্রেভস্ সহনবৃত্তি দেখিয়ে বলেন, বুঝেছি। তবু হতাশ হবার কিছু নেই। আপনাদের সামনে কী পরিদর্শন যাবা তা বুঝতে পারছি আমি।

ফ্রাঙ্ক হেসে বলেন, না। পারছেন না। আমার সাফল্যের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা কী জানেন?

—কী?

—হাট ফ্রাঙ্ক।

অবাক হয়ে যান গ্রেভস্। কী বলবেন ভেবে পান না। দাম্পত্য জীবনে ফ্রাঙ্ক কি অসুখী? তবু সে কথা এমন সন্ধ্যাচিত্রিত লোকের কাছেই বা উনি বলবেন কেন? ফ্রাঙ্ক অভিজাত পরিবারের মানুষ, আত্মমর্যী জ্ঞান তাঁর প্রাপ্ত। এমন বেমত্বা একটা পারিবারিক রহস্য কেন উন্মোচিত করে বসলেন তিনি? সৌজন্য কাজ রেখে মামুলি প্রশ্ন করেন গ্রেভস্। শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্ক স্মৃতি অমায়িক মহিলা। দেখলে

যেখা যায়, এককালে খুবই সুন্দরী ছিলেন। মার্জিত, অভিজাত এবং সবসময়ময়ী অদর্শ হোস্টেস। অতিথির আশ্রয়নে কোন ক্রটি থাকল না। আলাপ হল নানা বিষয়ে পানাহারের ঝুঁকি ঝুঁকি। খাউ ফ্রাঙ্ক তাঁর ছেলেকে গল্প শোনালেন। ব্যাভেরিয়ায় তাঁর বাড়ি। ব্যাভেরিয়ায় রাজপ্রাসাদ, সেখানকার চিত্রশালা, বিদ্যার-পার্ক, চার্চ—কত স্মৃতিকথা। মার্কিন জীবনযাত্রার সঙ্গে জার্মান জীবনের তুলনা করলেন। তাঁদের জার্মানী থেকে চলে আসার প্রসঙ্গ উঠল। হিটলারের ইহুদি নির্বাসনের প্রতিবাদে প্রফেসর ফ্রাঙ্ক পদত্যাগ করে দেশত্যাগী হলেন। কোন সভাসনিতির আয়োজন মিথিলা ছিল। তাঁর এক জার্মান সহকারী এবং শিষ্য ক্যারিও বরষ পেয়ে গোপনে দেখা করতে এল। অধ্যাপকের হাতে তুলে দিল একটি প্রকাণ্ড আলবাম। ফটোগ্রাফির সব ছিল ক্যারিওর। গার্টেনগেন-এর অসংখ্য ছবি তুলেছে সে। স্মিথিয়েছিল এই আলবামে। প্রফেসর ফ্রাঙ্ক ইতস্তত করে বলেছিলেন, তোমার এত সত্যের সকলকটা আমাকে দিয়ে দেবে। অল্পকাল কঠোর ক্যারিও বলেছিল, প্রফেসর আমি যে খাটি জার্মান। গোটা গার্টেনগেনটাই তো বইল আমার ভাণ। তার ছায়াটুকুই তো শুধু আপনাকে মিথিলা।

গোড্‌স্‌ কৌতুহলী হয়ে স্বপ্ন করেন, আলবামটা নিয়ে এসেছেন তো এখানে। খাউ ফ্রাঙ্ক উকি মেরে দেখলেন, প্রফেসর ফ্রাঙ্ক প্যাম্পিতে কয়েকপাতা মার্টিনী বানাতে ব্যস্ত। চুলি চুলি বলেন, প্রফেসর অবসর পেলেই সেটার পাতা ওলটান। এই আলবামটাই তাঁর প্রাণ। উনি গার্টেনগেনকে যতটা ভালবেসেছিলেন ততটা আমাকেও বাসেননি। গার্টেনগেন ছিল আমার সতীন। দুজনেই হেসে ওঠেন।

শ্রীমতী ফ্রাঙ্ক বলেন, অথচ মজা কী জানেন জেনারেল? প্রফেসর এই আলবামটা নিয়ে এলেন তাঁর পোর্টম্যান্টোতে—তথ্যে এলেন নোবেল প্রাইজের সোনার মেডেলটা।

—সে কি! ওটার আর কতটুকু গুজন?

—না, গুজনের জন্ম নয়। তাঁর যুক্তি অন্য রকম। বললেন, মেডেলটা তো একা জেমস্‌ ফ্রাঙ্ক পায়নি—শেয়েছে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়। ওটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটোরিতেই থাকবে। ল্যাবরেটোরিতেই রেখে এসেছেন সেটাকে।

গোড্‌স্‌ চমকে ওঠেন। বলেন, সর্বনাশ! সেটাপো সেটা ঝুঁজে গেলে গলিয়ে ফেলবে! সেটাটা ওয়ার-কাণ্ডে জমা দেবে।

ততকালে ফিরে এসেছেন প্রফেসর ফ্রাঙ্ক কয়েকপাতা পানীর ট্রেতে করে নিয়ে। বলেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না জেনারেল। ওটা সেটা ঝুঁজে পাবে না।

—মাটির নিচে পুতে রেখে এসেছেন।

—না। কারণ তাহলে ওরা ঝুঁজে পেত। আমি সেটা ফেলে রেখে এসেছি একটা নাইট্রিক অ্যাসিডের বোতলে। যুদ্ধের পরে ঠিক সেটা ঝুঁজে পাওয়া যাবে, দেখবেন আপনি।\*

গোড্‌স্‌ বলেন, সে বাই হোক, আপনি জার্মানী থেকে বিনামূল্যের গল্প বলছিলেন—

শ্রীমতী ফ্রাঙ্ক তাঁর গল্পের সূত্র তুলে নেন—

ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল কয়েকজন। অনাড়ম্বর বিবাহপর্ব। গার্টেনগেন-এর মহামণি চিরদিনের মতো বিদায় নিচ্ছেন। তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন মাত্র জনা-দুইজন সহকর্মী ও ছাত্র। প্রফেসর হিটলার, হাইজেনবার্গ, ক্যারিও প্রভৃতি। ফ্রাঙ্ক সতীক গাড়িতে উঠে বসলেন। গার্ড হুইসল দিল। সবুজ পতাকা নাড়াল। কিন্তু কী-এক যান্ত্রিক গভগোলে ইঞ্জিনটা চালু হল না। ঠিক সেই মুহূর্তেই টেশনের একজন কুলি এমন একটা কথা বলে বসল যা খাউ ফ্রাঙ্ক জীবনে ভুলবেন না। লোকটি এগিয়ে এসে অধ্যাপক ফ্রাঙ্ককে বললে, হেঁচ প্রফেসর! একটা জিনিস খেয়াল করেছেন? হিটলারের ঐ মাথায়েটা

অফিসারগুলো যে সহজ হিসাবটা বুঝল না, সেটা ঐ জড় ইঞ্জিনটাও বুঝে ফেলেছে! সে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আপনাকে নিয়ে যেতে সে রাহী নয়।

গল্পগুচ্ছে কথাবার্তায় প্রায় মধ্যরাত্রি হয়ে গেল। গোড্‌স্‌ মনে মনে ভাবছিলেন অন্য একটি কথা। অধ্যাপক কেন তখন বললেন—তাঁর সাফল্যের পথে প্রধান বাধা হচ্ছে খাউ ফ্রাঙ্ক। এমন অমায়িক সুন্দরী সম্রাটের স্বীয় বিরুদ্ধে কী তাঁর অভিযোগ? বুঝে উঠতে পারলেন না সেটা। বাই হোক, মধ্যরাতে গোড্‌স্‌ বিদায় নিয়ে উঠে পড়েন। ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন অতিথিকে গাড়িতে তুলে দিতে। বিদায় বলার গোড্‌স্‌ গৃহস্থানীকে বললেন, আপনাদের আতিথেয়তার কথা জীবনে ভুলব না আমি।

কোথাও কিছু নেই চক্ করে ছলে উঠল শ্রীযুক্তা ফ্রাঙ্কের নীল চোখ দুটো। যেন অপমানকর কোনও উক্তি করেছেন গোড্‌স্‌। মুহূর্তে বললে গেলেন তিনি। বললেন, কী বললেন? কোনদিন ভুলবেন না? কোনও দিন নয়।

গোড্‌স্‌ স্তম্ভিত! কী হল হঠাৎ। এমন বললে গেলেন কেন উনি?

অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ব্রীজ জার্মি! জেনারেল আমাদের অতিথি। যুদ্ধে দাঁড়ালেন মহিলা। স্বামীও মুগ্ধমুগ্ধ। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, সে হোয়াট? অতিথি-সহকার হো আমি চুটিয়ে করেছি জেমস্‌। ক্রটি রাখিনি কিছু। এবার আমাকে ব্যাপারটা সমঝিয়ে নিতে দাও। হতাশ হয়ে প্রাণ করলেন অধ্যাপক।

গৃহস্থানী আবার যুদ্ধে দাঁড়ালেন গোড্‌স্‌-এর নিকে। মুগ্ধমুগ্ধ। অসম্ভব বাক্যটার জেং টেনে পুনরায় বলেন, কী বলছিলেন? কোনও দিন ভুলবেন না? আমার স্বপ্নব্যাধি হ্যালুয়র্গ অথবা আমার বাপের বাড়ি ব্যাভেরিয়ায় যেদিন এই আটম-বোমটি নিক্ষেপ করার আদেশ জারী করবেন সেদিনও নয়? আমার স্বামী সাফল্যমণ্ডিত হওয়া মাত্রই তো সে আদেশ জারী করবেন আপনি, হেঁচ জেনারেল। তাই নয়!

গোড্‌স্‌-এর মাথা নিচু হয়ে গেল। মাটিতে একেবারে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হল তাঁর। ভুল। মারাত্মক ভ্রান্তি। এতক্ষণ তাঁর খেয়াল হয়নি—ওরা দুজন জার্মান। জার্মানীকে ধ্বংসকূলে পরিণত করার ব্রত নিয়েই তিনি আজ মনহাটান প্রকল্পের সর্বময় কর্তা। নোবেল-লরিয়েট জেমস্‌ ফ্রাঙ্ক মাতৃকৃতিকে স্বাধানে প্রাণান্তিত করার সঙ্কল্প নিয়েই প্রাণপাত করছেন। তাই তাঁর সাফল্যের পথে আজ সবচেয়ে বড় বাধা—খাউ ফ্রাঙ্ক।

হে ইশ্বর! প্রথম পরমশু-বোমার বিস্ফোরণ যেন অন্তত ঐ ব্যাভেরিয়াতে না হয়।



২ সাত ২

কুটার পরিবর্তন যুদ্ধযাত্রীর একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানকার সর্বময় কর্তা ই-ও লরেল। তিনিও নোবেল-লরিয়েট। দীর্ঘসেহী, জ্যাটিনাম-ব্রণ চুল, অথচ মুখখানা ছেলমানুষের মত অগ্ন্যবিক্র। প্রফেসর লরেল গাড়ি নিয়ে নিজেই এসেছিলেন সানফ্রান্সিসকো এরারোড্রামে। গোড্‌স্‌ আত্মপরিচয় দিতে সম্ভব করতর্জন করে বললেন, জেনারেল, আমি শুনেছি ইতিমধ্যে আপনি কলোণিয়া আর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় যুদ্ধে এসেছেন। এখানে আমরা অনেকটা এগিয়ে আছি। চলুন, আমরা সন্ধ্যারি রেডিয়েশন হিল-এ যাব—মানে আমাদের ল্যাবরেটোরিতে।

দীর্ঘ পথপ্রমে গোড্‌স্‌ ছিলেন ক্রান্ত। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রাহী হয়ে গেলেন তিনি। শিকাগো এবং নিউ ইয়র্কের অবস্থা দেখে হতাশ হয়েছেন—এখানে লরেল বললেন, কাজ অনেকটা এগিয়ে আছে। বেশ, দেখাই যাক।

লরেল নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন ওকে। গোড্‌স্‌ তাঁর যুদ্ধ পরবর্তী স্মৃতিচারণে বললেন, "যুদ্ধ চলাকালে আমার জীবনে সবচেয়ে লোমহর্ষক কটি মুহূর্ত ছিল সানফ্রান্সিসকো থেকে রেডিয়েশন হিল-এ আসা। মনে হল, আমি মুক্তি মোচির ব্রেনিং-এর প্রতিযোগী। নক্ষত্রবেগে গাড়ি চালালেন লরেল, কোন ট্রফিক-কলন না মেনে। স্থানীয় লোকেরা বোম্বয় গাড়িটাকে চেনে, পুলিশ-পুলবেরাও এই শাবল্য নোবেল-লরিয়েট ভ্রাইভারের গাড়ির নক্ষত্র-স্ট্রোটের সঙ্গে পরিচিত। না হলে এই দশ মিনিট

\* প্রফেসর ফ্রাঙ্কের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল। ফ্রাঙ্কই একমাত্র নোবেল-লরিয়েট যিনি এক নোবেল প্রাইজ দুবার পেয়েছেন। যুদ্ধান্তে নাইট্রিক-অ্যাসিডের বোতলের তলদেশ থেকে যখন সোনার মেডেলটি উদ্ধার করা গেল তখন দেখা গেল তার লেখা কিছু কিছু ক্ষয় পেয়েছে। বরষটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাতে সুইডেনের আকাসেমি ফ্রাঙ্কের কাছ থেকে মেডেলটি ফেরত নেয় এবং নুতন করে ছাপ দিয়ে পর বছর উৎসবের সময় সেই মেডেলটি ফ্রাঙ্ককে ষষ্ঠীয়বার উপহার দেওয়া হয়।



ড্রাইভিং-এ দশটা নেটিবুকে ঠিক গাড়ির নম্বর উঠে যাবার কথা।

“সম্প্রদায়িক ধন্যবাদ—আমরা আশ্চর্যের পথ দশমিনিটে পাড়ি দিয়ে অক্ষত শরীরে এসে উপস্থিত হলাম গন্তব্যস্থলে। প্রফেসর লরেন্স সুইচ-অফ করে বলেন, আসুন।

“আমি বলি, একটু অপেক্ষা করুন প্রফেসর। নেটি-বইতে একটা কথা লিখে রাখি।

“গাড়ি থেকে নামবার আগেই নেটি-বইতে লিখে রাখলাম—আর্নেস্ট লরেন্স-এর গাড়ির জন্য একটি সরকারী ড্রাইভার নিযুক্ত করতে হবে। লরেন্সকে সিঁড়ানিষ্ঠ করতে দেওয়া হবে না। হেড-কোয়ার্টার্সে পৌঁছে এটাই হবে আমার প্রথম ডিকটেশন। সামরিক আদেশ।”

লরেন্স ঠেকে বিচিফ্রনশন একটি যন্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে নিলেন। এটা ঠিক নিজস্ব আবিষ্কার। সবার আবিষ্কৃত। নাম হচ্ছে ক্যালুটন। “ক্যালু” হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার স্থিতিশীল, আর “টন” সাইক্লোট্রন যন্ত্রের শেখাংশ। গ্রোভস্‌ সর্বশ্রমে প্রস্তুত করেন, এতে কী হয়?

এক গাল হাসলেন লরেন্স। সে হাসিতেই যেন জবাব—অশ্রুতের পূত্র হয়, নির্ধনের ধন। ইহলোকে সুখী, অশ্রু গোলাকে গমন।

—বলছি শুনুন। আপনি জানেন—আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে  $U_{238}$  থেকে  $U_{235}$ কে বিচ্ছিন্ন করা। কলোমিয়াতে ভীরা সেটা করতে চাইছেন ইয়াদাওয়ালা টিউবের মধ্য দিয়ে গ্যাসীয় অবস্থায় ইউরেনিয়ামকে পাঠিয়ে। আমার এটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পদ্ধতি। এই ক্যালুটন যন্ত্রে আছে একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ড। গ্যাসীয় অবস্থায় ইউরেনিয়াম যখন এই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাবে তখন চৌম্বক-আকর্ষণে হালকা  $U_{235}$  অপেক্ষাকৃত ভারী  $U_{238}$  থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ব্যাপারটা ফ্রেন্ড জানেন? মনে করুন একই কোর্সে দুটি পাখরকে ছোঁড়া হল—একটা ভারী একটা হালকা। তাহলে কী হবে? হালকা পাখরটা এগিয়ে যাবে, নয় কি?

সহজ ব্যাখ্যা। গ্রোভস্‌ প্রস্তুত করেন, কতক্ষণ চলানো হবে যন্ত্রটা?

—অল্পত চব্বিশ ঘণ্টা।

—চালিয়ে দেখেছেন? কত পার্সেন্ট সেপারেশন হচ্ছে?

—না জেনারেল। যন্ত্রটা মিনিট পনের বেশি চালায়নি যাচ্ছে না বর্তমানে। যান্ত্রিক স্যেলযোগ দেখা দিচ্ছে তার মধ্যে। গরম হয়ে যাচ্ছে।

—ওপেন কী? তাহলে এতদিনে কতটুকু  $U_{235}$  পেয়েছেন?

—না, না, এখনও আমরা একটুও  $U_{235}$  পাইনি। তবে পাল, শীঘ্রই পাল। কী বলেন?

সব কয়টি কেন্দ্র ঘুরে গ্রোভস্‌ এসে দেখা করলেন যুদ্ধসচিবের সঙ্গে। বললেন, স্যার, একজন বৈজ্ঞানিক সহকারী আনার চাই। পদার্থ-বিজ্ঞানী। বেসামরিক সহকারী। বুদ্ধ স্টিমসন বলেন, নিশ্চয়। আপনি ঠাকে নির্বাচন করুন। তেমন কোন লোক জানা আছে আপনার?

—আছে স্যার। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক রবার্ট জে. ওপেনহাইমার।

—তাকে বাড়িয়ে দেখুন। যাচাই করুন। ক্রিয়াক্সেলের ব্যবস্থা করুন।

—ধন্যবাদ স্যার।

যুদ্ধ-সচিব যেমন এক কথায় মেনে নিচ্ছেলেন, ঠিক অধীনস্থ চীফ অফ স্টাফ জেনারেল মার্শাল কিন্তু তেমনভাবে এ নির্বাচন মেনে নিলেন না। কে এই রবার্ট জে. ওপেনহাইমার, যাকে জেনারেল গ্রোভস্‌ এতবড় সম্মানজনক পদে বসাতে চাইছেন? সে কি নোবেল-সরিয়েটে? সে কি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন অসামান্য দানের অধিকারী? বরষে, পদমর্যাদায় সে কি ঐ এক ভরজন নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিককে নিয়ে কারবার করতে পারবে? ঐ অজ্ঞাতনামা ওপেনহাইমারের ‘মায়োডটার’ উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এইসব প্রঃ.র জবাব খুঁজেছিলেন জেনারেল মার্শাল। দুর্ভাগ্যবশত প্রতিটি প্রশ্নের জবাবই হচ্ছিল নেতিবাচক! মায়োডটার অনুযায়ী।

উনিশ শ চার সালে নিউ ইয়র্কে জন্ম। পিতা জার্মানী থেকে এসেছিলেন সতের বছর বয়সে। একজন

সাকল্যমণ্ডিত বিজ্ঞানসন্ধান। মাতের জন্ম বালটিমোরে। বিবাহের আগে ছিলেন আর্টিস্ট এবং আর্ট শিক্ষিকা। ওপেনহাইমার 1922-এ হার্ভার্ড কলেজে ভর্তি হয়, তিন বছর পরে ডিগ্রি পায়। চলে যায় কেমব্রিজে। পরে জার্মানীর গার্টেনগেন-এ। 1927-এ ডক্টরেট পায় সেখান থেকে। তারপর হার্ভার্ড-এ কয়েকদশক ফেলোশিপ পায়, পরে লিডেন ও জুরিখে চাকরি করে। এর পরে ফিরে আসে আমেরিকায়। পর বারো-তের বছর সে বার্কলেতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন।

অর্ধশত নেভাং মামুলী কেবিরার। বড়োজোর বলতে পারা যায়, গড়-পড়তা ছাত্রদের চেয়ে কিছু উপরে। ‘মন নয়’-এর উপর—‘চলনসই’। তার সময়সীমা এবং সমাধ্যায়ী ছাত্ররা ইতিমধ্যে অনেক—অনেক বেশী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যৌনিক কাজ করেছে, নোবেল পুরস্কার পেয়েছে—যেমন হাইড্রোজেন, কেমি, ভিটাক, জোলিও-কুরি ইত্যাদি ইত্যাদি। অখণ্ড ওপেনহাইমার—

জেনারেল মার্শাল শেষ পর্যন্ত তাকে লাঠালেন গ্রোভস্‌কে। বললেন, আমি দুঃখিত জেনারেল, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। এই ওপেনহাইমার ছোকরাকে দিয়ে আমাদের কাজ চলবে না।

—কেন জেনারেল?

—কী দেখে নির্বাচন করলেন ঠকে? এতগুলো নোবেল-সরিয়েটে—

ব্যর্থ দিয়ে গ্রোভস্‌ বলেন, নোবেল-সরিয়েটের চাপাতে হলে নোবেল-সরিয়েটে চাই এ ধারণা হল কেন আপনার? আমি তো সাধারণ পি-এইচ-ডি-ও নই, তবু তো বেশ চলেছি আমার।

—আপনার কথা আলাদা। আজ্য সতি করে বলুন তো—কী দেখেছেন আপনি ঐ ছোকরার ভিতরে?

সামনের দিকে ঝুঁকে শড়ে জেনারেল গ্রোভস্‌ বলেন, আমি এর তোখে আগুন জ্বলতে দেখেছি জেনারেল।

মার্শাল সামরিক অফিসার, জ্যাকটিক্যাল মানুষ। প্রাণম্যাটিক। এমন ভাবালুতা কখনও লক্ষ্য করেননি ইতিপূর্বে। আর কোন প্রশ্ন করেন না উনি। বলেন, ইক দু মাস্ট—ওয়েল, হ্যাট হিম। প্রোভাইডেড—

হ্যা ‘প্রোভাইডেড’। যদি এক-বি-আই-ওকে ক্রিয়ারেণ দেয়। এতবড় দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করার আগে বার্কলে ওপেনহাইমারকে সুযোগ দিতে হবে। তারা চিরে-চিরে ফালা ফালা করে দেখবে ওপেনহাইমারের অতীত ইতিহাস। লোকটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় কিনা। ত্যতে অবশ্য গ্রোভস্‌ রাব্বী। রাব্বী হতেই হবে। এই হচ্ছে আইন। স্থির হল, ওপেনহাইমারকে সাময়িকভাবে কাজে বহাল করা হবে। প্রতিশ্রুতিনি। এক-বি-আই-ও-র ক্রিয়ারেণ শেলে তাকে দেওয়া হবে পাকা নিয়োগপত্র।

ওপেনহাইমার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে এসে যোগ দিল জেনারেল গ্রোভস্‌-এর দপ্তরে। ছাত্রের মত ঘুরতে লাগল সে বড় সাহেবের সঙ্গে। অজিত্রে মুগ্ধ হয়ে গেলে গ্রোভস্‌। ওপির কর্মক্ষমতায়, বৈজ্ঞিক ও মানসিক সহ্য ক্ষমতায়, উৎসাহে, অধ্যবসায়ে। স্থির করলেন যেমন কতই ছোক ভকে কাজে অটকাতে হবে।

গ্রোভস্‌-এর সঙ্গে সব কয়েকটি কেন্দ্র ঘুরে এসে ওপি বললে, স্যার, দুটো কথা আমার বলার আছে।

—বল।

—প্রথমত, আপনি নৌ-বিজ্ঞান এবং বিমানবন্দরকে এবার ব্যাপারটা জানান। তাদের প্রস্তুত হতে সময় লাগবে। যে পাইলট প্রেনটা উড়িয়ে নিতে যাবে, সে বোম্বাতি ফেলবে তারা ইতিমধ্যে ডামিং-ক নিয়ে অভ্যাস শুরু করুক। কোটি-কোটি ডলার খরচ করে যে বোম্বা তৈরী হবে, ছোড়ার সোনে সৌ যেন ব্যর্থ না হয়।

—দ্বিতীয়ত?

—দ্বিতীয়ত, বোম্বা তৈরীর কামখানটা এবার বানাতে শুরু করা উচিত। পাঁচটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলক বোম্ব বানানোর চেষ্টা হচ্ছে—হচ্ছে দশটি কেন্দ্রে। কিন্তু ঐরা পদ্ধতিটা ‘বিগরেটিক্যালি’ কলকেন। সেটা বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে একটা প্রকল্প তৈরী-কারখানা চাই—

—কিন্তু সে তো দেশের যে কোন কারখানাতেই হতে পারে ডব্বির?



—পাত্রে না স্যার। সেটা হতে হবে জনমানবের কল্যাণ থেকে বহু দূরে, লোকচক্ষুর আড়ালে।  
যোমার কর্মকাণ্ড যদি আমরা আজ থেকে এক বছর পরে পাই, তবে এই এক বছরের ভিতর আমাদের  
ফ্যাক্টরি, স্টোক-কোয়ার্টার্স, জল-বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি সব কিছু শেষ করে তৈরী হয়ে থাকতে হবে।  
নয় কি?

—প্রোভেন্স খুশী হলেন। অত্যন্ত খুশী হলেন। বলেন, সত্যি কথা বলতে কি এটা অসম্ভব ভেবেছি।  
ইতিমধ্যে তিন চারটে সন্ধ্যা 'সাইট' ঠিক করেও রেখেছি। চল, আমরা দুজনে সেগুলি দেখে আসি।

সন্ধ্যা হানগুলির তালিকা দেখে ওপেনহাইমার বললে, আমি নিশ্চিত—আমনি শেষ পর্যন্ত এই  
লস অ্যালামসকেই নির্বাচন করবেন।

—কেমন করে জানলে? তুমি গিয়েছ ওখানে?

—ওখানে আমার বাড়ি। হেলেনকেলয় ওখানকার স্কুলে পড়েছি—নিউ-মেক্সিকোর গ্র্যাকে আমার  
কৈশোর কেটেছে। জায়গাটা হলে এ কাজের জন্য আইডিয়াল সাইট।

নিউ-মেক্সিকোর এক জনমানবহীন প্রান্তরে অসংখ্য জনশব্দ সাড়া-ফে। সেখানে থেকে একটা  
উদাসী সড়ক চলে গেছে পাহাড়ের উপর। ঐ পাহাড়টী পথের প্রান্তে আছে একটা গ্রেট কুল। 1918  
সালে ঐ লস অ্যালামস ব্যাক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার—আলফ্রেড জে  
কনল। এখন তিনি অশীতিষষ্ঠ বৃদ্ধ। সসোরে কেউ নেই। ঐ স্কুলটা তাঁর প্রাণ। ওপেনহাইমার ঠিক তাঁর  
ছাত্র নয়, তবু দুজনই দুজনকে চেনেন। সমগ্র সমতল থেকে সাত-হাজার ফুট উপরে তাবি সুন্দর  
পরিবেশে এই স্কুলটি অবস্থিত। মাঝে মাঝে শিকারীরা আসে বন্দুক নিয়ে—ওখানকার পার্বত্য অরণ্যে  
এখনও প্রচুর হরিণ পাওয়া যায়; আর পাওয়া যায় গেম বার্ডস্। শান্ত পরিবেশ বন্দুকের যুদ্ধবুধ গর্জনে  
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সেদিন বৃদ্ধ কনল বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়েন। তারপর শিকারীরা আবার চলে  
যায়—স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে খেলায়, পড়ায় যেতে ওঠেন বৃদ্ধ।

একদিন ঐ স্কুলের সামনে এসে গামল একটা জীপ। নেমে এলেন তিনজন ভ্রমলোক। বেসামরিক  
লোক। তারমধ্যে 'ওপি'কে চিনতে পারলেন বৃদ্ধ কনল। বলেন, আরে এস এস। তুমি কী মনে করে?  
কই বন্দুক আনেনি তো?

—বন্দুক। বন্দুক কী হবে স্যার?

—ও! শিকার করতে আসনি তাহলে? বালাতুমি দেখতে এসেছ? তা ভাল। কিছু ঝগা?

—মিস্টার প্রোভেন্স, মিস্টার নিকলস্—আমার বন্ধু।

বৃদ্ধ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁর স্কুলটা দেখালেন। হেলেনের দেখালেন। খুশিহাল হয়ে উঠলেন তিনি।  
ওপেনহাইমারের মনের ভিতর তখন কী হচ্ছিল তা কেউ ধোয়াল করেনি।

সমস্ত এলাকাটা পরিদর্শন শেষ করে সিভিলিয়ানবেশী তিনজন আবার ফিরে এলেন নিউইয়র্কে। ইয়া,  
জায়গাটা পছন্দ হয়েছে প্রোভেন্স-এর।

সাতদিন পরে আলফ্রেড কনল একটি মর্মান্তিক আদেশ পেলেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে তাঁর স্কুল এবং  
তৎসংলগ্ন সমস্ত ভূমি, মায় গোটা পাহাড়টী সরকার জবরদস্তি করছেন। না, ঠিক জবরদস্তি নয়,  
সেবারত বাবদ একটা চেকও যুক্ত ছিল পত্রের সঙ্গে। মাথায় হাত দিয়ে কনলেন বৃদ্ধ। এ কী হল?  
কেমন করে হল? কাকে ধরবেন? কার কাছে সরবার করবেন? আশ্চর্য 'ওপি'কে চিঠি লিখলে কেমন  
হয়? সে তো এখন মস্ত অধ্যাপক। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রফেসর।

কিছুতেই কিছু হল না। সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হল। ছাত্ররা ফিরে গেল যে যার বাড়ি।  
লাইব্রেরির বইগুলো বিলিয়ে দিলেন। চেষ্টা কাশ করতে পারলেন ব্যাঙে।

চেক-এর অঙ্কটা বড় ভাতেরকী ছিল। যুদ্ধের ব্যক্তি জীবনের খোরপোশ চলে যাওয়া উচিত ছিল।  
কিন্তু তার প্রয়োজন হয়নি। চেক স্বতঃ হয়ে আসার আগেই ভয়ঙ্করয়ে আলফ্রেড কনল নারা পেলেন।  
ইচ্ছাকৃত ওপেনহাইমার ধনাবাদ দিয়েছিল কি সেজন্য? যুদ্ধের যুগোন্মুখি তাকে স্বীকৃতির দাঁড়াতে হল  
না বলে?

প্রোভেন্স-এর প্রথমে ধারণা ছিল এখানে শত-বাবেন বৈজ্ঞানিক এসে হযতো কাজ করবেন। প্রাথমিক  
ব্যবস্থা সেই মতই হয়েছিল। কিন্তু বছর শেষ না হতে ওখানে এলেন সাত্বে তিনহাজার কর্মী, পরের বছর

সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়াল ছয় হাজারে।

বিজ্ঞান প্রান্তরে এমন একটা কারখানা কেন গড়ে উঠেছে—কী তৈরী হবে ওখানে, একথা সত্যতই  
জিজ্ঞাসা করে সকলে। জবাব পায় না। বুঝতে পাত্রে না তারা। ওখানে যারা আসে, থাকে, তারা  
মিলিটারী পোশাকের লোক নয়, সবই সিভিলিয়ান।

চূড়ান্ত গোপনীয়তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল লস-অ্যালামস্-এ। প্রতিটি বৈজ্ঞানিকের একটা করে  
নামকরণ করা হল। সেই নতুন নামে তাঁদের চিঠিপত্র আসত। আসত একই ঠিকানায়—'ইউনাইটেড  
টেনস্' আর্বি, পোস্ট অফিস বক্স নং 1663', এই ঠিকানায়। লস অ্যালামস্ তো যুদ্ধের কথা, খামের  
উপর নিউ-মেক্সিকো পর্যন্ত লেখা হত না। প্রতিটি বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিগত চিঠি আলা এবং যাওয়ার পথে  
নেমসর করা হত। কোন গোপন স্বকর যেন কোনভাবে বাইরে না পাচার হয়ে যায়। অধিকাংশ বিজ্ঞানী  
স্ট্রী-পূর্ব পরিচয়নের ছোট্ট এসেছেন। তাঁরা শুধু জানতেন স্বামী যুদ্ধের গোপন-কাজে নিযুক্ত। কী কাজ,  
কোথায় কাজ তা জানতেন না। বিজ্ঞানীদের কথা হকুম দেওয়া হয়েছিল পরস্পরকে যেন 'ডক্টর' বা  
'প্রফেসর' জাতীয় সম্বোধন না করেন। এতে সম্বোধনের উল্লেখ করবে। তাহলে রাম-শ্যাম-যদু ভাবতে  
বসবে—এতগুলি পি-এইচ-ডি অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এই বিজ্ঞান প্রান্তরে কেন জমায়েত  
হয়েছেন? হযতো গোটা পরিকল্পনাটিই তাতে বানচাল হয়ে যাবে। সম্বোধন করতে হবে শুধু 'কিন্টার'  
বলে। অনেকের সেটা ভুল হয়ে যেত। অধ্যাপকসুলভ অন্যান্যভাবে ভুল সম্বোধন করেই মনে মনে  
খিঁব কাটতেন। একবার এডওয়ার্ড টেলর সাহা-বকতে একটি মর্মান্তিক মূর্তি দেখিয়ে তাঁর বন্ধুকে এগ  
করেছিলেন—ওটা কার মূর্তি?

বহু আলিসনও পদার্থবিজ্ঞানী। বসিক ব্যক্তি। তিনি টেলরের কানে কানে বললেন, মূর্তিটা  
আর্চ-বিশপ লাম্বার। কিন্তু ধরবার—তোমাকে যদি কেউ এ এগ করে তবে বলবে 'মিস্টার' লাম্বার।  
ভুলেও 'আর্চ-বিশপ' বল না যেন।

সরল প্রকৃতির টেলর অবাক হয়ে বলেন, কেন? পাখারের মূর্তিতে আবার গোপনীয়তা কিসের?

আলিসন বিজ্ঞের হাসি হেসে বলেন, আছে, জানার, আছে। বুঝলে না? নাহলে রাম-শ্যাম-যদু  
ভাবতে বসবে, এতগুলি কাক কেন প্রত্যহ তাঁর মাথায় 'ইয়ে' ত্যাগ করে। জীইধর্মটিই হযতো বানচাল  
হয়ে যাবে।

বিশ্ববিদ্যুত বৈজ্ঞানিক নীলস্ বোর-এর নতুন নাম দেওয়া হল 'নিকোলাস বেকার'। বাঘা বাঘা কর্মকাণ্ড  
ওঁর কচু অথচ এই নামটা তাঁর মনে থাকত না। মিটিং-এর ভিতর কেউ হযতো প্রশ্ন করে  
ওঁরে—মিস্টার বেকার এ বিষয়ে কী বলেন?

বোর নির্বিকারভাবে ব্যোম মেয়ে বসে থাকেন। ওঁর কোন ছাত্র তখন হযতো ওঁর কানে কানে বলে,  
স্যার, আপনাকেই প্রশ্ন করা হচ্ছে—

প্রফেসর আঁথকে উঠতেন, হ? মি? শুভ হেজেল। আমার মনেই থাকে না যে আমার নাম বোর নয়,  
বেকার।

অতঃপর মিটিং-এ উপস্থিত আর করত জনমতে ব্যক্তি থাকে না 'নিকোলাস বেকার' কান হজ্ঞানাম।  
আর একবার। সেটা নিউ ইয়র্কে। প্রফেসর বোর একটা অত্যন্ত জরুরী ও গোপনীয় মিটিং-এ  
যোগদান করতে যাচ্ছেন। অন্যমনস্ক অধ্যাপকটির জন্য সলা-সর্বথা একজন মেহরক্ষীর ব্যবস্থা ছিল।  
সিভিলিয়ান-যান। পদযাত্রসে ঠেকে শৌখে ঘিয়ে লোকটা বিদায় নিল। মিটিং-এ কোরি যেতে পারত  
না। লিফ্ট-এর মুখে ঠেকে রেখে শেষবারের মত কিস্ ফিল্ করে মনে করিয়ে দেয়, স্ট্রীজ প্রফেসর, গান  
ব্রাখবেন—আপনার নাম নীলস্ বোর নয়, নিকোলাস বেকার। কেমন?

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমি আর অন্যমনস্ক নই। আমি ভুলিনি।

লিফ্ট এসে দাঁড়াল। ওঁর সঙ্গে একই লিফ্ট-এ উঠেছেন একটি মহিলা। অস্বাভাবিক লিফ্ট। চালক  
নেই। তৃতীয় যাত্রীও নেই। কনডাক্টরকে একটি মহিলা সহযাত্রী দেখে অত্যন্ত সন্তোষিত হয়ে কোণ  
নিচেন অধ্যাপকমশাই। মহিলাটি ঠেকে আসৌ নজর করেননি। একমানে একটা ধরনের কাগজ দেখতেন  
তিনি। হঠাৎ প্রফেসর বোর-এর মনে হল মহিলাটি তাঁর অত্যন্ত পরিচিত। আরে। এ যে হালবানের স্ত্রী।  
জানতাম ছিলেন ডেনমার্কের ওঁর সহ-স্বামী। প্রফেসর সবিনয়ে প্রশ্ন করেন:

মাণ করবেন, আপনি কি চ্যুটি ফন হালবান নন?

নীলস্ বোর জানতেন না, তাঁর বন্ধু হালবানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং মহিলাটি মিস্টার ব্রাঙ্কেটকে ইতিমধ্যে বিবাহ করেছেন। ভদ্রমহিলা কাগজ থেকে মুখ না তুলে বললেন, আরে না। আপনার ভুল হচ্ছে স্যার—আমার নাম মিসেস ব্রাঙ্কেট।

—আমায় সরি।

লিফট উপরে উঠেছে। হঠাৎ কাগজ থেকে মুখ তুলে মহিলাটি তাঁর সহযাত্রীর দিকে দেখ তুলে চাইলেন। একেবারে লাফিয়ে ওঠেন তিনি। বলেন, কী আশ্চর্য! আপনি। প্রফেসর বোর!

প্রফেসর বোর গম্ভীরভাবে বললেন, আপনার ভুল হয়েছে মানাম—আমার নাম নিকোলাস বোর।

লিফট শীঘ্রই গেল। খটখট করে এগিয়ে যেলেন নিকোলাস বোর। ছানুর মত গাড়িতে বইলেন মিসেস ব্রাঙ্কেট। শুধুপ্রতিম প্রফেসর বোর এমন বেয়াক্স মিথ্যা কথা বললেন কেন?



॥ আট ॥

অশান্তভাবে নিজের ঘরে পদ্মচারণা করছিলেন জেনারেল হোভস্। ওপিকে ডেকে পাঠিয়েছেন অনেকক্ষণ। এখনও আসছে না কেন সে? কিন্তু এলে তিনি কী বলবেন? কেমন করে জেনে নেবেন প্রকৃত সত্যটা? ওপি, ওপেনহাইমারকে তাঁর চাই,—নিতান্তই অপরিহার্য সে। এই কয়েকমাসে সে মস্তুর মত সমস্ত এককল্পটাকে যেন গ্রাণ সফর করেছে। তার অথবসারে, কর্মপদ্ধতিতে, তার উদ্যোগে অভিভূত হয়ে পড়েছেন হোভস্, এখন তাকে কোনক্রমেই ছাড়া যায় না। অথচ—

হ্যাঁ। এক বি-আই-ফেঁকে রিপোর্ট এসেছে ইতিমধ্যে। সপ্তদশ দপ্তর স্পষ্ট করে জানিয়েছে, বার্কসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট জে. ওপেনহাইমারকে সিকিউরিটি ক্রিয়েশন দেওয়া যাবে না। তিন-তিনটি ছিন্ন তারা বার করেছে ওপির পূর্ব-ইতিহাস হাথড়ে। এক নম্বর, সে দীর্ঘদিন ধরে কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারা প্রচার করত। দু নম্বর, ওর শ্রাব্যব্দ 'জ্যাকি' একজন কম্যুনিষ্ট ছিল। আর তিন নম্বর, ওর স্বীয় প্রথমপক্ষের স্বামী ছিল একজন উৎসাহী কম্যুনিষ্ট কর্মকর্তা।

হোভস্ টেবিলের উপর থেকে একখানি পত্রিকা তুলে পাতা উল্টাতে থাকেন। 'পিপলস ওয়ার্ল্ডের' বর্তমান সংখ্যা। পত্রিকার নামই শোনা ছিল না। রিপোর্টখানা পড়ে কৌতূহলের বশে আজ একখানা কিনে ফেলেছেন। পাতা উল্টে দেখছিলেন, কই তেমন কোন মারাত্মক রচনা তো নজরে পড়ল না?

—ওড মনিং স্যার। —ওপি এসেছে।

—এস, বল কস।

ডিক্টিটার্স ড্রয়ারে বসতে বসতে ওপেনহাইমার বলে, এ কি স্যার? আপনার হাতে পিপলস ওয়ার্ল্ড!

—কেন? এটা কি নিবিদ্ধ কোন পত্রিকা?

—না। নিবিদ্ধ দিক নয়, তবে এরা তো ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করে না—

—তাই নাকি? আমি পড়ে দেখিনি। তুমি পড়েছ?

—এ সংখ্যটি পড়িনি। বস্তুতপক্ষে গত তিন-চার বছর পড়িনি। তবে এককালে আমি এই পত্রিকার সভ্য ছিলাম।

—তাই নাকি?

—ওশু তাই নয় স্যার, ছদ্মনামে এককালে আমি ওতে প্রবন্ধও ছাপিয়েছি। তবুও হঠাৎ ওপেন হোভস্। এ একবারি তো এক বি-আইও পার্মনি। অথচ ও কেমন সবল বিশ্বাসে বলে গেল। পুনরায় প্রশ্ন করেন, সে সমস্ত হোমার বুকি কম্যুনিজম-এ বিশ্বাস ছিল।

—তা ছিল। কিছুটা আমার ভাইয়ের প্রভাব—

—ভাই। ভাই কে?

—আমার ভাই ফ্রাঙ্ক ছিল যোর কম্যুনিষ্ট। তার স্বী জ্যাকলিনও তাই। এখন অকণ্য তাদের মত বদলে গেছে। যাই হোক, আমাকে ডেকেছিলেন কেন?

মনের মেঘ অনেকখানি সরে গেছে ইতিমধ্যে। হোভস্ শেস প্রকৃতি এড়িয়ে বলেন, কিছু মনে কর না

ওপি, তোমাকে একটি পারিবারিক প্রশ্ন করছি। তোমার স্বীয় প্রাক্তন স্বামীও কি একজন কম্যুনিষ্ট ছিলেন?

—ছিলেন। তাঁর নাম জো ড্যানবর। তিনি ছিলেন স্পেনের এজন নেতৃস্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি অফিসিয়াল। স্পেনের গৃহযুদ্ধে তিনি মারা যান।

—তার মানে তোমার স্বীও কিছুটা—

—কিছুটা কেন? এককালে তিনিও যোর কম্যুনিষ্ট ছিলেন।

একই ঘুরিয়ে হোভস্ বললেন, আমি ভাবছি—এসব কথা আবার এক-বি-আই-ও-চিয়ে বের করবে না তো? তুমি তো জানই, এক বি-আই-এর ক্রিয়েশন ছাড়া—

—হ্যাঁ, জানি বই কী। কিন্তু খুঁচিয়ে বার করার কী আছে? আমাকে প্রশ্ন করলেই আমি অকপটে সব বলব। এককালে কম্যুনিষ্ট ডক্ট্রিন আমাকে উত্তৃদ্ধ করেছিল একথা স্বীকার করতে আমার খিঁচ নেই। কিন্তু বর্তমানে আমি ডেমোক্রসীর পূজারী। শুধু আমি নই—আমরা সবাই। আমি, আমার স্বী, আমার ভাই, তার স্বী। সে যাই হোক আমাকে ডেকেছিলেন কেন?

'কেন ডেকেছিলেন' তার কৈফিয়ৎ হোভস্ কী দিয়েছিলেন, আসৌ দিয়েছিলেন কিনা তার কোন প্রমাণ নেই। যা আছে তা হচ্ছে সমর বিভাগের একটি গোপন নথি। ঐ জুলাই-এর বিশ তারিখে দেখা। চিঠিখানা হবহ অনুবাদ করে নিলাম—

গোপনতম পত্র

যুদ্ধবিভাগ

চীফ ইঞ্জিনিয়ার দপ্তর

ওয়াশিংটন, জুলাই 20, 1943

বিষয়: জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহাইমার

প্রাপক: দা ডিক্টিটর এঞ্জিনিয়ার, যানহাটান ডিক্টিক্ট

স্টেশন 'এফ', নিউ ইয়র্ক।

পনেরই জুলাই তারিখে শ্রবত আমার মৌখিক নির্দেশের পরিপূরক হিসাবে এতদ্বারা অনুরোধ জানানো যাইতেছে যে, উপকল্পিত ব্যক্তিকে অবিলম্বে প্রস্তাবিত পদে নিযুক্ত করা হউক। ইহাও উল্লেখ থাকে যে, তাহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ ইতিপূর্বে আপনি আমাকে জানাইরাছেন তাহা পাঠায়ে সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে বিশেষ ক্ষমতাবলে আমি এই আদেশ জারী করিতেছি। উল্লিখিত ব্যক্তি এই প্রকল্পের পক্ষে অনিবার্য।

এল আর হোভস্

ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল, সি-ই

তরোয়ালের এক কোণে সব রক্তর বাধাবিঘ্ন সরিয়ে নিলেন সামরিক অফিসারটি।

ওপি হলেন লস-অ্যালামসের অফিসিয়াল কর্মচার।

লস অ্যালামসে একে একে এসে জুটলেন বিজ্ঞানীরা। মূল-নিয়ামক ওপি। পৃথিবীর ইতিহাসে এতগুলি শ্রবণশ্রোণীর বৈজ্ঞানিক কখনও একত্র হয়ে একযোগে কাঙ্ক্ষ করেননি। এলেন—ইন্সটার্ট, গ্যামো, টেলার, উইনবার, ফের্মি, হ্যাশ বেথে,—ফন নরমান, কিউর্যাটোজি, ববিনোভিচ, কুয়াইসকফ, পার্সি, অটো গ্রিস, উইলিয়াম শেনী, ব্রাউন্স ফুকস, বেনেডি, গিথ, পার্সন ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। সাতটি বিভাগ, তার সাতজন কর্মচার—প্রত্যেকের অধীনে পাঁচ-সাতটি শাখা। প্লিওরিটিক্যাল বিভাগের ডিরেক্টর হ্যাশ বেথে, বিস্ফোরক বিভাগের কিউর্যাটোজি, গ্র্যাডুয়ালাড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের এনরিকো ফের্মি—প্রকৃতি প্রকৃতি এবং প্রকৃতি। সকলের পরিচয় নিতে গেলে মহাভাগত হয়ে যাবে। দু-চার জনের কথা বলি—

হ্যাশ বেথে নোবেল-সরিটে জার্মান। নাতী শাসনে উত্থাপ্ত হয়ে 1935-এ পালিয়ে আসেন আমেরিকায়। তাঁর জীবনের এক কৌতুককর অভিজ্ঞতার কথা বলি—যা থেকে বোঝা যাবে, বিজ্ঞানীরা রাজনীতিকদের পায়ের পড়ে কী জাতীয় নাকাল হতেন। পার্টির পতনের সময়ে আমেরিকায়



উদ্ভাস হ্যাশ বেধে একটি সমর-সংঘর্ষের আবির্ভাব করে বসলেন। কামালের সোশ্যাল গ্যাংসের সার্বস্বত প্রতিরক্ষা-বাবুদের বিষয়ে একটি আবিষ্কার। কাগজপত্র নিয়ে তিনি দেখা করলেন মার্কিন সামরিক বড়কর্তার সঙ্গে। সামরিক বড়কর্তা সেটা পড়ে অভিভূত হয়ে বসলেন, প্রফেসর, আপনাকে এ আবিষ্কার প্রভুতভাবে আমাদের কাজে লাগবে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

হ্যাশ বেধে গদগদ হয়ে বসলেন, কিছু না, কিছু না—আমার পরীক্ষা কার্যটা শেষ হয়নি। আরও উন্নত ধরনের স্যামোয়া গাড়ির চাপের তৈরী করব আমি। রিসার্চের কাগজগুলো দিন—অসমাপ্ত কাজটা শেষ করি—

বড়কর্তা বললেন, আমি অভ্যস্ত দুঃখিত প্রফেসর, রিপোর্টটা আর আপনাকে ফেরত দেওয়া হবে না।

আমাদের চোখে আপনি হচ্ছেন শরুপঙ্কের লোক, জার্মান ন্যায়দল।

—সে কি! অপ্রিয়ারটা যে আমারই। আর ওটা যে অসম্পূর্ণ।

—আর্য্যম সরি, প্রফেসর।

—দুঃস্বস্ত 'সরি'! এর কলিও যে নেই আমার কাছে—

—আর্য্যম সরি এগেন, হের প্রফেসর।

পাঠকের হয়তো মনে হচ্ছে আমি কানিয়ে বলছি। বিশ্বাস করুন—এতে একবিশু অতিরিক্ত নেই।

সেই হ্যাশ বেধে বর্তমানে হচ্ছেন লস অ্যালামসের থিওরিটিক্যাল ডিভিশনের ডিরেক্টর।

একমোদিত বিভাগের ডিরেক্টর জর্জ কিস্টিয়াকৌন্সি—সংক্ষেপে 'কিস্টি'। বস রাশিয়ান। বয়স তেরোশিশ। জন্ম কিয়েভ-এ। বংশোদ্ভিকদের বিচ্ছিন্ন করে রাশিয়ান বাহিনীর হয়ে কৈশোরে লড়াই করেছিলেন।

কুরকের ডিকুর দিয়ে পালিয়ে শেষ পর্যন্ত কপর্কটীন উদ্ভাস হিসাবে এসে পৌঁছান করেছিলেন। কুরকের ডিকুর দিয়ে পালিয়ে শেষ পর্যন্ত কপর্কটীন উদ্ভাস হিসাবে এসে পৌঁছান করেছিলেন।

আসেন মার্কিন-মূলুকে। গ্রিগটনে অধ্যাপনা করছিলেন—ওশি তাঁকে হয়ে এনেছে লস অ্যালামসে।

আসেন মার্কিন-মূলুকে। গ্রিগটনে অধ্যাপনা করছিলেন—ওশি তাঁকে হয়ে এনেছে লস অ্যালামসে।

দুর্ধর্ষ বেশরোয়া এই কিস্টি। একবার তিনি তাঁর সহকর্মীদের বলেছিলেন, তোমরা তোমরা এই

বিচ্ছিন্নকগুলোকে খানকা ভর পাও। ডিনামাইট নয় এই প্যাকেটগুলো—বাড়চাড়াই ফেটে পাবে না।

অন্ত পুতুপুত কর কেন?

তাঁর সহকর্মীরা সৌজন্যবোধে মাথা নাড়ে। বেশ বোকা বাব, তারা মেনে নেয় না তাঁর কথা।

থ্যাংকটিক্যাল কিস্টি বুঝতে পারেন—ওরা বিশ্বাস করছে না। তৎক্ষণাৎ আসেন বলেন

বিশ্বেশ্বরক-ভক্তি প্যাকিং কেসগুলো তাঁর গাড়িতে তুলে দিতে। অট-সংশী প্যাকিং-কেস গাড়ির দীর্ঘ

চড়িয়ে কিস্টি বিখিত সহকর্মীদের চোখের সামনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে গেরিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন

উনি?—চাবুকে সবাই। কোথাও যাননি কিস্টি। সামনের উবড়ো-খবড়ো মার্শের মাঝখানে বনিকটা

বেশরোয়া ভাইভ করে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসেন একমোদিত বিভাগের ডিরেক্টর। চোখ বড়

বড় করে দাঁড়িয়ে আছে সহকর্মীরা। কিস্টি গাড়ি থেকে নেমে এসে বললেন, সেখানে? কার্টলো? নাও

এবার গাড়ি থেকে ওগুলো নামাও।

আর এক রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক হচ্ছেন গ্যামো—জর্জ গ্যামো। তাঁর "One Two Three.

.Infinity" বইটি বিজ্ঞানের ছাত্র মারেরই অবশ্য-পাঠ্য। চুটকি হসিকতার, গল্প বলার, টাংর বানানোর

অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল তাঁর। জন্ম রাশিয়ায়—শিক্ষা গার্টেনসেন-এ। হাইস্কেনকেই, ওশি, টেলের

ইত্যাদির সহপাঠী। গ্যামো কীভাবে রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসেন তার গল্প শুনিয়াছেন উনি। ফুসের

গণী তখন নব্বো পার হয়েছেন গ্যামো। ছুটিতে উনি জার্মানী বেড়াতে যাবার সেক্স করলেন—দাসের

স্বচক্ষে দেখে আসলেন সেই অদ্ভুত মনুষ্যটিকে—আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর নাম। উচ্চমাত্রার

পরীক্ষায় গ্যামো অঙ্কে রেকর্ড বার্ক পেয়েছেন—এটাই তাঁর প্রাইম হিসাবে দাবী করলেন। বাবা বড়

হলেন খর্য্য দিতে—রাষ্ট্রী হলেন না রাশিয়ান গভর্নমেন্ট। সেইদিন থেকেই গ্যামোর বার ছিল রাশিয়

থেকে পালানো। আত্মগান-সীমাস্ত দিয়ে প্রথমবার পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ হল। সীমাস্তরক্ষীরা হয়ে ফেল

থেকে পালানো। আত্মগান-সীমাস্ত দিয়ে প্রথমবার পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ হল। সীমাস্তরক্ষীরা হয়ে ফেল

থেকে পালানো। আত্মগান-সীমাস্ত দিয়ে প্রথমবার পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ হল। সীমাস্তরক্ষীরা হয়ে ফেল

আত্মসম্মতির পরে কিশোরী মেয়েটি স্বামী হয়ে যায়। একটা নৌকা নিয়ে দুজনে বার হয়ে পড়েন একদিন কক্সপারের ফুকে। ওপারে রাশিয়ান এলাকা নয়। এই দুঃসাহসিক অভিযানটিও ব্যর্থ হল। কভের মধ্যে পড়ে এই দুর্ভাগ্য ঘটনার সলিল-সমাধি হতে বসেছিল। উদ্ধার করল আবার সেই সীমাস্তরক্ষীরা হল। রাশিয়ান বর্ডার-পুলিস। এবারও তাঁর আসল উদ্দেশ্য তারা বুঝতে পারেনি। কিন্তু 'কখন, ই, থ্রি'—ইনফিনিটি প্রু থিনি ভবিষ্যতে লিখবেন তিনি কি প্রথম আর দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হয়েই আমতে পারেন? ইনফিনিটি পর্যন্ত যেতে হয়নি, তৃতীয় প্রচেষ্টাতেই সাক্ষ্যমণ্ডিত হন। এসে পৌঁছালেন বার্মিনে। সেখানে সেই মনুষ্যটিকে, বিশ শতাব্দীর বিশ্বয়: আলবার্ট আইনস্টাইনকে।

লস-অ্যালামসের আর একটি অদ্ভুত চরিত্র ডব্লিউ ক্রাউস ফুকস। জার্মান, কিন্তু ইহুদী নন। ডব্লিউ ক্রাউস হাইমলিনের নাট্যী জার্মানী থেকে। কপর্কটীন অবস্থায় এসে পৌঁছান ইলোভে। বাবা ছিলেন শান্তিকামী প্রাইমারি কর্মচারক—সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তি। স্ট্রীকটল এবং নিউক। তিনি ছিলেন বিশ্বজগতের পুকারী, চিহ্নিতান কোয়েক্স-সম্মানায়ের একজন কর্মকর্তা। একটি কোয়েক্স-পরিবারেই অগ্রায় পদ ক্রাউস, ইলোভে। সাত-পাচ থাকতেন না, রাজনীতি থেকে শত হস্ত দূরে থেকে পড়াশুনা শেষ করলেন ইলোভে এসে। দুর্ভাগ্য ভাল বেজন্মট হল শেষ পরীক্ষায়। মাত্র দুই ঐ সময়ে ইলোভে—তিনি ক্রাউসকে সেমে আকৃষ্ট হলেন। ছুটিয়ে বলেন এক রিসার্চ স্কলারশিপ। সেখানেও দুঃখ হল। পরে জেমস চ্যাডউইকের নেতৃত্বে ইলোভে থেকে যে বৈজ্ঞানিক দল আটম-বোমা প্রকল্পে আমেরিকায় আসে তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে অটো ফ্রিশ (জীমাতী মাইটনারের সেই বোম-শো, থিনি নীলস্ বোর-এর বৃথি দেখেছিলেন), উইলিয়াম শেনী, পার্সি প্রকৃতির সঙ্গে এখানে আসেন। প্রকল্পে ছিলেন এক-বিজ্ঞ-এর গ্যাসীয় ডিফুশন প্রকল্পে। পরে চলে আসেন লস-অ্যালামসে। হ্যাশ মোকার, অধ্যাপনও করেন প্রকৃ, তবে মাতাল হন না। ব্যাচিলার, সুবর্ণন—মেয়েমহলে খুবই জনপ্রিয়।

সেমে মহাকর্ষের কথাই বসে উল্লে তখন বলি—ডব্লিউ ফুকস্ সম্বন্ধে লস-অ্যালামসে একটা গুজব বেশ চালু ছিল। তাঁর সঙ্গে নাকি মিসেস অটো কার্ল-এর একটু বিশেষ জাতের সন্তান ছিল। এমন গুজব তো রটতেই পারে। প্রথম কথা, ডব্লিউ ফুকস্ সুবর্ণন, ব্যাচিলার এবং প্রফেসর অটো কার্ল বৃদ্ধ অথচ তাঁর দ্বিতীয়প্রকৃতির স্ত্রী রোনাল্ডা কার্ল ডাকসাইটে সুবর্ণী এবং যুবতী। কঠোর-পরিহিত না-মোক বিশ-বাইশ বছরের ফারাক। ডব্লিউ ফুকস্ এবং রোনাল্ডা কার্ল দুজনেই স্বীকার করতেন তাঁরা দুজনে বাধ্যবদ্ধ। কিশোরী বয়স থেকেই রোনাল্ডা চিনতো ফুকসকে। বহুত জার্মানী থেকে পালিয়ে এসে ফুকস্ ঐ রোনাল্ডারের পরিবারেই আশ্রয় পায়। আলাপটা সেই আমলের, কিন্তু দুই সাতকের মন তাতে মানে না। তারা স্নাকে—এর শিগ্গে বৃথি গভীরতর এক গোপন ইতিহাস আছে—যার বেশ আশ্চর্য মেট্টেন।

লস-অ্যালামসে, বহুত শোটা মানহাটান প্রকল্পে ডব্লিউ ক্রাউস ফুকস্-এর একটা প্রকাত দান আছে—উনিই পরমাণু-বোমার ক্রিটিক্যাল-সাইজটা অঙ্ক করে বার করেন। সেই 'ক্রিটিক্যাল-সাইজ'-এর হিসাবটা এখনও হ্যাশ হয়নি। সেটা আজও চরমতম গোপন নথী। কিন্তু ক্রিটিক্যাল সাইজটা কী?

ফা ফাক একটা ছোট  $U_{235}$ -এর টুকরোর কোন নিউট্রন আঘাত করে একটি পরমাণু বিদীর্ণ করল। তা থেকে নতুন দু-তিনটি নিউট্রন জন্মান্ত করবে এবং দু-তিন দিকে যাবে।  $U_{235}$ -এর টুকরোটা অসংখ্য ছোট ছোট নন-বিদূত নিউট্রন দুটি হয়তো কিছুদূর গিয়েই থেমে যাবে, অর্থাৎ নতুন পরমাণু-অস্তর বিদীর্ণ করার আগেই তার যাত্রা শেষ করবে। এখন যদি আর একটু বড় মাপের টুকরো নিই তাহলে হয়তো একটি থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে নিউট্রন পাব। হয়তো শেষে ঐ চারটে নিউট্রনও মাকপথে বিলুপ্ত হবে। এমনভাবে বাড়তে বাড়তে আমরা এমন একটা নির্দিষ্ট আকারে পৌঁছাব যখন ঐ চেন-বিজ্ঞাপন বা 'চলারবর্তন-পদ্ধতি' অবশ্যাব্যী হয়ে পড়বে। সেই নির্দিষ্ট মাপকাঠিকেই বলে 'ক্রিটিক্যাল-সাইজ'। লস-অ্যালামসের বিজ্ঞানীরা চাইছিলেন ক্রিটিক্যাল-সাইজের চেয়ে একটু ছোট মাপের দুটি ইউরেনিয়াম টুকরোকে একটা বাধাদানকারী পদার্থের দু-পাশে রাখতে। যদি এমন হয় যে, আকাশ থেকে বোমা পড়তে পড়তে পর্বতি গলে যাবে, তাহলে দুপাশে পৌঁছানার আগেই দুটি 'সাব-ক্রিটিক্যাল' টুকরো পরস্পরের সংস্পর্শে এসে 'সুপার-ক্রিটিক্যাল' হয়ে যাবে। ফা অর্থ প্রচণ্ড বিশ্লেষণ। এই ব্যাপারটা চিত্র ৩-এ বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে।



করতেন না। নোবেল-প্রাইজলাভ নেখে, ডাফ, লরেল ইত্যাদিকে মুখের উপর বলতেন—‘বী বকছেন সার লাগনের মত’।—‘লাগনের মত’ কথাটি ছিল তাঁর প্রতিবাদের বাগ্য লব্ধ, মুজায়েদ।

সেনসরের কথাই যখন উঠল তখন বলি শুনুন। সেনসরের বড় কঠা ম্যাককিলভিওর সঙ্গে একবার খুব বেধে গিয়েছিল ফাইনম্যানের। ম্যাককিলভিও বলে, সার্কেটিক ডাবা ডি-কোড করা অপরোধ-বিজ্ঞানের একটা বিশেষ শাখা। ও-বিষয়ে যে গবেষণা করেনি তার পক্ষে এ দীর্ঘার সমাধান সম্ভবপর নয়। ফাইনম্যান বলেছিলেন, লুক হিয়ার ম্যাক, অপরোধ-বিজ্ঞানী কোনদিনই অজ্ঞাতের হামুলি কোন ছোট্ট ফর্মুলাও বুঝতে পারবে না, যেমন ধরুন অতি ছোট্ট একটা ফর্মুলা,  $E=mc^2$ । কিছু বুঝলেন? অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে ক্রিনিফোল্ডের সমস্যা নিয়ে আসুন আমার কাছে, এক সেকেন্ডে তা 'হুস'—

ফাইনম্যান দেখলেন তাঁর ক্রীকে লেখা প্রেমপত্রখানা খোলাখাম অবস্থায় নিয়ে এসেছে ম্যাককিন্সি।  
কী ব্যাপার? দেখা গেল—ফাইনম্যান ক্রীকে লিখেছিলেন, 'সাত হাজার ফুট উঁচুতে থাকার নিউ  
মেজিকোর গরমটা আমার ঠেঁব পাচ্ছি না।'

দুঃস্থ ক্রোধে ওর হাত থেকে চিঠিখানা ছিনিয়ে নিয়ে ফাইনম্যান কুচি কুচি করে ছিড়ে ফেলে দিলেন।  
হানটে হানটে ফিরে গেল ম্যাককিলডি।

প্রত্যেক ধর্মকে নিয়ে শুধুমাত্র আইনম্যান, একজ্যোতিষি। আমিও তো তাই বলতে চাই। এমন অজুত নাম আমি কীভাবে শুনিনি। প্রফেসর আইনম্যান। কে তিনি। আমার নাম মিষ্টার হেইলি।

—কইকের লোক নেই এই অভ্যুত্থাতে আপনি আমাকে 'প্রফেসর ফাইনম্যান' বলে ডাকবেন। If you call me such 'names' I'll report against you!

ফাইন্যান্স গভীরভাবে বলেন, প্রেমশত্রুটি আপনার উদ্দেশ্যে আমি লিখিনি মশাই। আপনি না কুসংস্কৃত হবেন।

ম্যাককিলিভি তবু অনুসন্ধানের সূত্রে বলে, তবু স্যার, না বুঝে কেমন করে চিঠি পাস করি বাবুন ? এই দুটো কথা—*Retep* এবং *Sbm. Obmota*-র অর্থ কি ?

যান নিয়ে ছবর ছাড়ল ম্যাকগিলক্রিভ। অসংখ্য ধন্যবাদ আনিয়ে বিদায় হল সে।

মাস্কুলিস্টির নাকে ফাইনম্যান কী পরিমাণ বাতাস ঘষেছিলেন তা অবশ্য সঠিক জানতে পারিনি কেউ। খনিটি নিম্নোক্তরূপ—

সিনটিনের পরে ম্যাককিনলি ভাকে একখানা টাইপ করা চিঠি পায়। ছোট্ট চিঠি। তাতে লেখা ছিল:  
 "প্রিয় ইভিটো,

তোমাকে চারটে খবর জানাচ্ছি। এই চিঠিখানা পড়েই ডিড়ে স্কল। আর খবর চারটে লেমালাম বিলে  
স্কল। হাজম করে স্কল। জানাজানি হলেই তোমার চাকরি নট। কুবলে ইদারাম।

এক নম্বর বকর: প্রফেসর ফাইনম্যানের পীটির নামে কোন পুরস্কার নেই।  
দুই নম্বর: পীটির একজন রাশান-এজেন্টের ছদ্মনাম।

চার নম্বর : চিঠিতে অক্ষরগুলো আদৌ উল্টোপাল্টা করে সাজানো ছিল না। ছিল, শেফ উল্টো করে

সাজানো। Retep উঠেই করলে হয় Peter; কেমন হো? এবার SBMOB MOTA কথাটি উঠে নিয়ে কুকুর ছেঁটা করত মুখ-সবট—কথাটি জানাজানি হলে তোমার চাকরি থাকবে কিনা!

३६

*Guess Who !"*

“বলতো কে?”-র নির্দেশ আধাআধি পালন করেছিল ম্যাককিলিভি। চিঠিখানা ছিড়ে ফেলে; কাউকে জানায়নি, কিন্তু ষোড়শ নিয়ে ছেনেছিল, ঐ অঙ্কাত পত্রলেখকের প্রথম ও তৃতীয় সংবাদ নিজের সত্য। এ কাহিনী-বর্ণিত বিশ্বাসঘাতক যতদিন না প্রেক্ষার হয় ততদিন—দীর্ঘ তিনটি বছর ম্যাককিলিভি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পাবেনি। তার হিতৈষী ঐ পত্রলেখককে খুঁজে বার করার চেষ্টাই করেনি সে। অনুশোচনায় আর অন্তর্গত কেটা হয়ে ছিল। পাঁচ তিনটি বছর।

লস অ্যালামসে নীলস বোর-এর প্রথম আবিষ্কার প্রসঙ্গে ফাইনম্যানের নামটা লিপিবদ্ধ রয়েছে দেখছি। প্রফেসর বোর কী একটা নুতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। লস অ্যালামসের বিজ্ঞানীদের তিনি সেটা জানাবার জন্য এসে হাজির হলেন, লেকচারের নির্ধারিত দিনের আগের দিন। পরদিন প্রফেসর বোর একটা নুতন কিছু বলবেন, তাই একটা চাকলা বহুই দেখা গিয়েছিল লস অ্যালামসে। সেইদিনই সম্ভাব্যে ফাইনম্যানের ঘরে টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। ফাইনম্যান কোন দাঁধা কবছিলেন কিনা জানি না, টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলেন, হ্যাঁলো!

—আমি জিম বেকার বলছি। আমরা এইমার এসে বৌয়েছি। বাবা আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। আপনি একবার পের্ট-হাউসে আসবেন?

ফাইনম্যান অবাক হয়ে বলেন, জিম বেকার। আমি ঠিক আপনাকে তো—

—আমার বাবার নাম নিকোলাস বেকার।

চমকে উঠেন ফাইনম্যান। মনে পড়ে যায় সব কথা। নীলস বোরের পুত্র আর্গী বোরও যে এসেছে আমেরিকায়, একথা স্মরণ হয়। নিশ্চয়ই তার ছদ্মনাম—জিম।

অবাক হয়ে ফাইনম্যান বলেন, আপনি ভুল করছেন না তো? আমাকে আপনার বাবা কেন খুঁজবেন? আমার নামই জানেন না তিনি।

—জানেন। আপনি ফিটার হেইলি তো?

—হ্যাঁ, তাই বাটে। আচ্ছা আমি এখনই আসছি।

ওভারকোটটা খায়ে চালিয়ে হাজির হলেন পের্ট-হাউসে। প্রফেসর বোর তাঁকে দেখেই বললেন, তোমার নামই তো ফাইনম্যান?

—ইয়েস, প্রফেসর।

—ঠিক আছে। বস। এই দেখ আমার রিপোর্ট।

রিপোর্ট দেখলেন কি? ফাইনম্যান তখনও ভাবছেন, লস অ্যালামসে এত এত পণ্ডিত থাকতে হঠাৎ তাঁকে পাকড়াও করলেন কেন প্রফেসর বোর। পরদিন যে রিপোর্ট সকলকে পড়ে শোনাবেন, হঠাৎ তা এই ভ্রম-ভ্রান্ত মধ্যরাত্রি থেকে শোনাতে বসলেন কেন বিশ্ববিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক? কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই বাধ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল তাঁর। আকস্মিক ভাবে গেলেন অন্ধ-সমুদ্রে। তারপরেই হঠাৎ চীৎকার করে ওঠেন, কী লিখেছেন মশাই পাগলের মত। এ কী হয়? জাটটা ‘আন-নোন’ আর সাতটা ‘ইকোয়েশন’—এ তো কোনদিনই সমাধান করা যাবে না।

পাশে ঠাঁড়িয়েছিলে জিম বেকার। কর্ণমূল লাগল হয়ে ওঠে তার। কোন মরমানুষ পিড়বেবকে ‘পাগল’ বলছে এমনটা সে শোনেনি তার জীবনে। প্রফেসর বোর কিন্তু নির্বিকার। বলেন, কারেই। কিন্তু এই অষ্টম ইকোয়েশনটাও তো আমাদের হাতে আছে।

শীতালী পাখীর মত ‘ফাই-থিটা-এপসাইলনের’ একটা ঝাঁক নেমে এল ব্র্যাক বোর্ডে। ফাইনম্যান বলেন, আই সী। আসুন তাহলে কবে ফেলা যাক।

রাত তিনটে নাগাদ শেষ হল অষ্টম।

ভোররাত নাগাদ প্রফেসর বোরকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এলেন উনি খবর জেতে। জিম বেকার এগিয়ে এল তাঁকে গাড়িতে উঠিয়ে দিতে। গাড়িতে উঠে হঠাৎ ফাইনম্যান প্রশ্ন করেন, একটা কথা, জিম। তোমার বাবা এত লোক থাকতে আমাকেই বা ডেকে পাঠালেন কেন?

—আপনার কথা বাবা শুনেছিলেন শিকাগো থাকতেই।

—কিন্তু এব্যানে তো ধ্রুতর বৈজ্ঞানিক আরও অনেক আছেন—ফের্মি, হ্যাঙ্গ বেথ, ডব্লিউ. ফ-

নরমান—

—জানি। তাঁদের ভেঁট আমার বাবাকে ‘পাগল’ বলবার সাহস রাখেন না—

—পাগল। পাগল কে বললো?

—আপনি বলছেন।

—হু। মি। ইম্পসিবল। আমি ডিক ফাইনম্যান প্রফেসর বোরকে—এ সব কী বকছ পাগলের মত?

—বাবা বলেছিলেন—আর সকলেই তাঁর থিয়োরিটা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেবেন। তাঁর প্রতি প্রত্যয়, সৌজন্যে, প্রতিবাদ করবেন না—তুলতুলো তাঁদের নজরে পড়বে না। পারলে আপনিই—

—তাই বলে আমি প্রফেসর বোরকে ‘পাগল’ বলব?

—বলব নয় স্যার, বলেছেন। আমি নিজের কানে শুনেছি।

খুঁজি থেকে নেমে আসেন ফাইনম্যান। বলেন, তাহলে চল ক্ষমা চেয়ে আসি।

—মীজ প্রফেসর। বাবা শুনে পড়েছেন। রাত সাড়ে তিনটে বাজে।

মন তার করে ফাইনম্যান ঘিরে এলেন নিজের ঘরে। না না, এ অসম্ভব। তিনি কর্ণও বিশেষ শতাব্দীর বিশ্বাস প্রফেসর নীলস বোরকে ‘পাগল’ বলতে পারে? তিনি? ডিক ফাইনম্যান। জিম বেকার বুঝই কতখানি পাগলের মত।

ফাইনম্যানের আর এক ব্যতিক ছিল মুখে মুখে চুটকি কবিতা রচনার। তেঁকে পা-টানা। প্রফেসর নীলস বোরকে কতবার কত মধ্যরাত্রি যে তিনি ‘পাগল’ বলেছেন এটা জিম বেকার কাউকে বলেনি। পরদিন বোর বক্তৃতা দিলেন। তাঁর প্রত্যয়ের পর অন্যান্য সহ-বিজ্ঞানীরা ফাইনম্যানকে বললেন, কেমন লাগল, প্রফেসর বোরকে?

ফাইনম্যান তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে জবাব দিলেন:

Professor Bohr	প্রফেসর বোর
Knows no whore!	মোর মনচোর।
Drinks no liquor,	কামিনীকাক্ষনত্যাগী
Is no bore.	সম্মাসী ঘোর।

হিংস্র জারিশ অধ্যাপকের অনেক জীবনীকার দীর্ঘ রচনায় তাঁর দেবতুল্য চরিত্র সম্বন্ধে লিখে গেছেন, কিন্তু মাত্র চারটি ছত্রে ফাইনম্যান যে প্রজ্ঞার্থী নিবেদন করেছিলেন, তা বোধহয় অনবদ্য। কবিতাটি শুনেই ব্রাউন্স ফুক্স বলে ওঠেন: আরে আরে। আপনি করছেন কি, প্রফেসর! বোর আবার কে? শুনলেন না, ঠিক নাম নিকোলাস বেকার?

ফাইনম্যান বলেন, আই বেগ জোর পার্টন। সে ক্ষেত্রে আমি বলব:

Nicholas Baker,	নিকোলাস বেকার—যুগান্তকারী।
Epoch maker,	আটমের গিরে যিনি—হানেন বাড়ি।
Atom breaker!	এই বাহা! তিনি—খাননা ভাড়ি!!
Yet he is not	
A liquor-taker!	

চরমতম অ্যাক্টিভিসম। যেন যুগান্তকারী আবিষ্কার করা অথবা পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করাও কিছু নয়। তার চেয়েও বড় বিষয়। লোকটা মন খায় না।

হো হো করে হেসে ওঠে সবাই। ডব্লিউ. বোরেন। এবার ব্রাউন্স ফুক্স-এর নামে একটা হ’ক। ঐ বোরেন ‘ফুলটা’ ধরিয়ে দিয়েছে।

ফাইনম্যানের জাপানী-তানাকা মুখে মুখে প্রজ্ঞাত:

Fuchs	ফুক্স-সাহেব তো গর্ভের এক বণ্ড।
Looks	একই পারেন করতে গাজন লণ্ড।
An ascetic,	সৌম্যদর্শন সম্মাসী এক ভণ্ড।
Theoretic!	

22



জানুয়ারীতে তৈরী করা হয় এই মিশন 'আলস'। তার কার্যের কারণে প্যাশ। ইচ্ছা এ কার্যের প্রথম অংশে আমরা চিনেছি।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলেন প্যাশ-এর মত 'অ-পদার্থ-বিদ'কে নিয়ে কাজ হবে না। তাই ওরা খোজ করতে শুরু করেন এমন একজনকে যিনি পদার্থবিদ্যাতে পটভূমিকী এবং অপরাধ-বিজ্ঞানেও। পাওয়া গেল জেমস সবার্সটী। স্যামুয়েল গাউডসমিট। ওলফগাং বৈজ্ঞানিক। গাউডসমিট-এর প্রাক্তন-ছাত্র—হাইজেনবের্গের সহায়্যার্থী অথচ ক্রিমিনোলজি হচ্ছে তাঁর প্যাশন। বৃদ্ধ বাবা-মা হল্যান্ডেই আছেন। যুদ্ধের আগেই তিনি ডেনমার্ক পালিয়ে বান, প্রফেসর বোর-এর অধীনে ডক্টরেট লাভ করে পাড়ি জমান মার্কিন যুগ্মকে। বর্তমানে ম্যাসাচুসেটস-এ ব্রোডার-একমে নিযুক্ত।

মনের মত কাজ পেলেন গাউডসমিট। প্রথমত, গোয়েন্দা কার্যক্রমের ন্যায় চলেন। দু-দফার, বৃদ্ধ পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাতের একটি সম্ভাবনা দেখা দিল। গত তিন বছর তাঁদের কোন চিঠিপত্র পাননি। হল্যান্ড এতদিন ছিল নাৎসীরাহিনী দখলে।

গাউডসমিট-এর এই অনুসন্ধানকার্য আর একটি পৃথক গোয়েন্দা কার্যক্রমের বিষয়বস্তু হতে পারে। স্থানভাবে আমাকে দু-একটা ইঙ্গিত দিয়েই শেষ করতে হল। কৌতূহলী পাঠক গাউডসমিট-এর স্মৃতিচারণ 'Alsos' পড়ে দেখতে পারেন।

তাঁর গ্রন্থ পড়ে জানতে পারছি, নোবেল-লরিমোট বৈজ্ঞানিক জোলিও-কুরি অধিকৃত-পৃথীতে বন্ধুক হাতে বাস্তব লাভাইয়ে অংশ নিয়েছিলেন। বর্ণনা দিয়েছেন—কীভাবে ফরাসী পদাধিকার জার্মান ব্রুহট মৃত্যুবরণ করেন। প্রফেসর ব্রুহট-এর ছাত্র রাউসেল পৃথীর মৃত্যুশুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। যেটাগুলো অপরিচীত যন্ত্রণা দিয়েও প্রফেসর ব্রুহট-এর কাছ থেকে তাঁর ছাত্রের তিক্ততা জানতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তারা বৃদ্ধ প্রফেসরকে পাঠিয়ে দেয় একটা কন্সেনসেশন ক্যাম্পে। অধ্যাপক নিবিচারে মেনে নিলেন এই বন্দীজীবন। সেখানে তিনি বন্দীদের নিয়ে গণিত-জ্যোতিষ চর্চা করতেন—আকাশের তারা চেনাতেন। অন্যভাবে শেষ পর্যন্ত প্রফেসর ব্রুহট মারা যান।

বলেছেন, হলওয়েক-এর কথাও। হলওয়েক একটা নতুন ধরনের মেশিনগান আবিষ্কার করে উপহার দিয়েছিলেন পারীর মুক্তি ফৌজকে। এ কথা জানতে পেরেছিল ফেল্টাগো। হলওয়েক ধরা পড়ার পর জার্মান গুপ্তচরদের বৈজ্ঞানিককে ঐ আবিষ্কারের সূত্রটা তাঁদের জানিয়ে দেবার জন্য নিষীদ্ধ শুরু করে। তিল তিল করে মৃত্যু বরণ করেছিলেন হলওয়েক—তাঁর অতিপ্রিয় মুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধে তাঁর আবিষ্কারকে ব্যবহৃত হতে দেননি।

গাউডসমিট-এর তালিকায় ছিল চারটি নাম। চারজনের পক্ষেই পরমাণু-বোম্বের তৈরী নির্ধারণ করা সম্ভব। তাঁরা হচ্ছেন—অটো হান, ফন সে, ওয়াইৎসেকার আর হাইজেনবের্গ। বিপদে জার্মানীর এ-গ্রাণ্ড থেকে ও-গ্রাণ্ডে তিনি ঝুঁকে ফিরেছেন ঐ চারজনকে। খবর পেয়েছিলেন, স্ট্রাসবের্গ-এ ছিল তাঁদের মূল কেন্দ্র। স্ট্রাসবের্গ তখনও নাৎসী ফৌজের দখলে। অবশেষে 1944-এর পনেরই নভেম্বর জেনারেল প্যাটিন-এর বিজয়ী বাহিনী প্রবেশ করল স্ট্রাসবের্গ-এ। কর্ণেল প্যাশ একটি সাইজিয়া গাড়িতে গাউডসমিটকে নিয়ে মেশিনগানের গুলিবর্ষণের ভিতরেই প্রবেশ করলেন স্ট্রাসবের্গে। গবেষণাগারের অবস্থান দেখানো মাপ সঙ্গে ছিল। ঝুঁকে পেতে দেখী হল না। সৈন্যদের নিয়ে ওরা চুকে পড়লেন ল্যাবরেটোরি ফ্লোরস্ট্রাশে। না, চারজনের একজনেরও সন্ধান পেলেন না। তবে যারা বন্দী হলেন তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি পাওয়া গেল—কিছুদিন আগেও ওরা এখানে ছিলেন। শহরের পতন আসন্ন বুঝতে পেরে জার্মান-বিজ্ঞানস্নর চার মহামণি পালিয়েছেন কাইজার উইলহেম ইনস্টিটিউটে। বিজ্ঞানীদের ধরা গেল না, উদ্ধার করা গেল কিছু গোপন নথী। সাংকেতিক ভাষায় লেখা। ক্রিমিনোলজি ছিল গাউডসমিটের বিলাস। সারাব্যাপ্ত মোমবাতির আলোয় গবেষণা করে তিনি ঐ সাংকেতিক-ভাষা ডি-কোড করলেন। পাঠোদ্ধারের পর বোঝা গেল বিশেষটিটা তৈরী করছেন যখন ওয়াইৎসেকার, হাইজেন। মাত্র দু-মাস পূর্বের রচনা। তা থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা গেল, জার্মান-বৈজ্ঞানিকেরা ইউরেনিয়াম অথবা প্লুটোনিয়ামের পরমাণুকে ক্রমাগত বিভীর্ণ করতে তখনও কোনও কোনও 'ট্রাইন-বিভাজকণ' ব্যবহার করে পারেননি। ইউ-238 থেকে ইউ-235-এর বিচ্ছিন্নকরণও সম্ভব হয়নি। তৎকালীন বিজ্ঞানিত বিশেষটি লিখে ডক্টর গাউডসমিট পাঠিয়ে দিলেন আমেরিকায়। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল তাঁর।

মার্কিন কর্তৃপক্ষ কিন্তু এ তথ্য আটো বিশ্বাস করতে পারলেন না। জবাবে তারা জানালেন, "আমাদের সন্দেহ, সহজে ভাঙা যায় এমন সাংকেতিক ভাষায় লিখে ওয়াইৎসেকার ইচ্ছা করেই ঐ বিশেষটি ল্যাবরেটোরিতে রেখে গেছেন, আমাদের চোখে ধুলো দিতে। দ্বিতীয় কথা, আপনার ধারণা ভ্রান্তও হতে পারে। অটো হান, ফন সে, ওয়াইৎসেকার অথবা হাইজেনবের্গ ছাড়াও অধ্যাত অজ্ঞাত কোন বৈজ্ঞানিক হতো নির্জন সাধনায় ঐ আবিষ্কার করে বসেছেন, যার কথা আপনি জল্পনাও করতে পারছেন না।"

এ-কথাও জবাবে ঐ মিলিটারী বড়কর্মে অতিমাত্রা নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট যে-কথা লিখেছিলেন তার আর অনুবাদ হয় না। যুদ্ধকালে সামরিক কর্তা এবং ডিপ্লোমাটেরা বরাবরই বৈজ্ঞানিকদের উপর চুড়ি পুরিয়েছেন। প্রফেসর বোর, ম্যাক্স বর্ন অথবা জেমস হ্যাডের মত বিশ্ববরণ্য বৈজ্ঞানিকদের ক্রিয়াজো অবেশ পালন করতে বাধ্য করেছেন ঐ সব সামরিক কর্তা আর রাজনীতির পবিত্রত্মন্যের মত। গাউডসমিট-এর এই চাবুকের মতো জবাবটি যেন সেই অপমানের প্রতিশোধ। গাউডসমিট মার্কিন সরকারকে লিখেছিলেন।

"A paper-banger may perhaps imagine that he has turned into a military genius overnight, and a trader in champagne may be able to disguise himself as a diplomat. But laymen of that sort could never have acquired sufficient scientific knowledge, in so short a time, to be able to construct an atom bomb."

[ কোন বর্তমিত্রি হতো মনে করতে পারে স্বাভাবিক সে একজন সামরিক পুরুষ হয়ে উঠেছে অথবা কোন ভীতিনাশার ঠিকি স্বাভ-পোহালে বিশ্বাত রাজনীতিকের ছদ্মবেশ হতো ধারণ করতে পারে—কিন্তু একজন স্বাভাবিক লোক এত অল্পসময়ে এতটা বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান লাভ কিছুতেই করতে পারে না যাতে সে পরমাণু-বোম্বের নির্মাতা হয়ে পড়বে। ]

দুঃখের বিষয় পত্রের প্রাপকটি সামরিক জীবনের পূর্বাশ্রমে রক্তের-মিশ্রি অথবা মদের কারবারী ছিলেন কিনা এ তথ্যটার সন্ধান পাইনি।

আরও পরে মিত্রপক্ষের বিজয়ী বাহিনী অধিকার করল কাইজার উইলহেম ইনস্টিটিউট। এবারও সৈন্যদের সঙ্গে ছিলেন কর্ণেল প্যাশ এবং গাউডসমিট। একজন সংবাদবহ এসে খবর দিল, ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটোরিতে কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে তারা গ্রেপ্তার করেছে—চিনতে পারছে না। গাউডসমিট তৎকালীন উঠে পড়েন। বলেন, চল এখনই গিয়ে দেখব।

গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলেন কর্ণেল প্যাশ নিজে। প্রশ্ন করেন তিনি, ডক্টর, এবার যদি জালে আপনার এইর গেম ধরা পড়ে থাকে তবে আপনি তাদের চিনতে পারবেন তো?

হান হাসলেন ডক্টর গাউডসমিট। বলেন, কর্ণেল, তাঁদের মধ্যে কেউ আমার অধ্যাপক, কেউ আমার সহপাঠী। আমি চিনব না?

চিনতে কোন অসুবিধা হল না সত্যি। বন্দী হয়ে পাড়িয়ে আছেন যারা, তারা জার্মানীর গ্রেট মন্ত্রী—নোবেল লরিমোট অটো হান, ফন সে এবং ওয়াইৎসেকার সমেত আরও পাঁচজন প্রধান নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট।

—হাউ ভু ভু ভু প্রফেসর!—প্রশ্ন করেন গাউডসমিট লজ্জায় লাল হয়ে।

—হু মিডল ব্রাশ, হাই বয়!—জবাব দিলেন বৃদ্ধ অটো হান। ইউরেনিয়াম পরমাণুর জদয় যিনি সর্বপ্রথম বিভীর্ণ করেছিলেন।

ধরা পড়লেন না শুধু হাইজেনবের্গ। স্বাভাবিক দিনটির সময় একটা সাইকেলে চেপে কাইজার ইনস্টিটিউটে ফেটে তিনি নাকি উত্তর ব্যাডেরিয়ায় বিকে বওনা হয়ে গেছেন। সেখানে ছিলেন হাইজেনবের্গের বী-পুত্র-পরিবার। শেষ মুহূর্তে কয়টি তিনি তাঁদের সঙ্গে কটিতে চেয়েছিলেন। পঁচিশ বছর বয়সে যিনি নোবেল-প্রাইজ পাওয়ার মত আবিষ্কার করতে পারেন, কলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় পদ সম্বাহন করে পরাজয়ের হলাহল আকর্ষণ পান করে নীলকণ্ঠ হতে যারা কৃতা নেই, সেই হাইজেনবের্গ স্বাভাবিক প্রায় একশ কিলোমিটার সাইকেলে পাড়ি নিয়ে চলে গেছেন উত্তর ব্যাডেরিয়ায়।

হাইজেনবের্গ সেইখানেই প্রেপ্তার হন—আরও পরে।

সেদিন কিন্তু ওরা হাইজেনবের্গের সাক্ষাৎ পাননি। তাঁর ল্যাবরেটোরির চিহ্নিত ঘরটি তলতল করে

খোজা হল। এখানে একটি জিনিস উদ্ধার করেছিলেন কর্ণেল পাশ—একটি ফটো। ঘরের টেবিলে ফটো-স্ট্যাণ্ডে রাখা ছিল। দুটি যুবক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে—কনভোকেশন গাউন পরে। সদা ডব্লিউ হ্যাডেন তাঁরা। একজন ওয়ানার হাইড্রেনবের্ক আর একজন স্যামুয়েল গাউনসমিট। পলাতক ও পশ্চাদ্ধাবনকারী।

গাউনসমিটের অনুসন্ধানকার্যের মর্মান্তিক উপসংহারের প্রসঙ্গে এবার আসি। ঝুজতে ঝুজতে এবং ঘুরতে ঘুরতে গাউনসমিট এসে পৌঁছলেন ইল্যাণ্ডে—দ্য হেগে। হেগ-এর ন্যাসনাল ইন্সটিটিউট অনুসন্ধান শেষ করে গাউনসমিট তাঁর সহকারীকে বললেন, কর্ণেল, একবেলায় জনা ছুটি চাইছি। শুবেলা আমি আসব না।

—কেন? কী করবেন শুবেলায়?

—দ্য হেগ হচ্ছে আমার লিডকুমি। শহরের ওয়াস্টে ছিল আমাদের বাড়িটা। তিন বছর আগেও সেখানে থেকে বাবা-মায়ের চিঠি পেয়েছি। বাবার সস্তরতম জন্মদিনে একটা কেবুলও করেছিলাম। জনি না, সেটা পেয়েছিলেন কিনা।

—আয়াম সরি। যান, গিয়ে বোঝ করে দেখুন।

পনের বছর পরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছে। রীতিমত কুঠী সজ্জান—বাঁশের বৌতব। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল উনিশ বছর বয়সে—জার্মানী, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড ঘুরে পৌঁছেছে আমেরিকায়। সদা স্কুল থেকে পাশ ছেলে আজ ডব্লিউ প্যাণ্ডা ব্রৌট। যুদ্ধ বাবার আগে গাউনসমিট আগ্রাণ চৌা করেছিলেন বুড়ো-বুড়ির ইমিগ্রেশান পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে মার্কিন মুলুকে নিয়ে যাওয়ার। নানান বাধা বিপত্তিতে সেটা শেষ পর্যন্ত ঘটে উঠেনি। গত তিন বছর কোনও ফরারই পাননি।

গাউনসমিটের এই প্রত্যাবর্তনের কাহিনীটা আমি নিজের ভাষায় বলব না; তাঁর রচনার অনুবাদ করে যাব। ভাবানুবাদ নয়, ত্রাত্তে আমার ভাবানুবাদ হওয়াতো অজ্ঞাত মিশে যাবে—আক্ষরিক অনুবাদ।

“জীপটাকে আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে রেখে হেঁটেই এনিয় গেলাম। বাড়িটা তখনও খাড়া আছে, কিন্তু কাছে এসে দেখলাম, সব ক’টা জানলাই অদৃশ্য। দরজা বন্ধ ছিল। জানলা দিয়ে লাফ মেরে ভিতরে ঢুকলাম। জনমানব নেই।—এ ঘরটা ছেলেবেলায় ছিল আমার নার্সারী। পরে পড়ার ঘর। চারিদিকে কাগজপত্র ছড়ানো—তার মধ্যে আমার স্কুল-হাডার স্যাটিকিকটখানি। চকিতে মনে পড়ল, এটা বরাবর বাবার ড্রয়ারে সমস্ত রাখা থাকত। দু-চোখ বুজে আমি বিশ-ত্রিশ বছর পিছিয়ে গেলাম। এখানে ছিল আমার অঙ্ক মায়ের টেবিলটা; এইখানে আমার বুককেসটা। আমার সেই অত অত বই সব কোথায় গেল?—পিছনে মায়ের সংখের বাগানটা আগুণায় ভরে গেছে। শুধু লাইলাক গাছটা নীরবে সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভয়ঙ্করের মাফখানে দাঁড়িয়ে মনে হল আমি চরম অপরাধ করেছি।—হয়তো ঐদের আমি খাচাতে পারতাম। আমেরিকান ভিসা পর্যন্ত তৈরী করা হয়েছিল—বাবার এবং মায়ের; বসি আর একটু বেশী ছুটোছুটি করতাম, যদি ইমিগ্রেশন অফিসে আরও বেশী করে ধর্না দিতাম, নিশ্চয়ই ঐ নৃশংস নাৎসীদের হাত থেকে ঐদের আমি রক্ষা করতে পারতাম। কী হয়েছিল তাঁদের? এখানেই মারা গেছেন? পাড়ার লোক কিছু বলতে পারবে? কিন্তু গোটা পাড়াটাই যে ঠীকা। চেনা মুখ একটাও দেখছি না—”।

এর মাসখানেক পরে একটি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে অনুসন্ধান করবার সময় ঐ গ্রন্থটির সমাহান হঠাৎ উনি বুজে পেয়েছিলেন। গ্যাস-চেম্বারে ঘাসের পাঠানো হচ্ছে তাদের নাম-বাম লেখা থাকত একটা রেজিস্টারে। তাতেই উদ্ধার করলেন দুটি নাম। বাবার এবং অঙ্ক মায়ের।

গাউনসমিট লিখছেন—

“And that is why, I know the precise date my father and blind mother were put to death in the gas chamber. It was my father's seventieth birth-day.”

“তাই আমি জানি, ঠিক কোনদিন আমার বাবা এবং অঙ্ক মা গ্যাস চেম্বারে শেষ দুবিত নিষাল নেন। তারিখটা ছিল আমার বাবার সস্তরতম জন্মদিন।”

জার্মানীতে আটম-বোমা সর্বপ্রথম অবিকৃত না হওয়ার চারটি প্রধান হেতু। তার প্রথম তিনটিও উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন মার্কিন আর ইংরাজ সাংবাদিক এবং ঐতিহাসিকের দল। কিন্তু D

Irving-এর লেখা “The German Atomic Bomb—the History of Nuclear Research in Nazi Germany” গ্রন্থটি পড়ে আমার মনে হয়েছে প্রথম এবং চতুর্থ কারণটাই সর্বপ্রধান। চারটি হেতু নিম্নোক্তরূপ—

প্রথমত—অনার্য এবং ইহুদী, এই অভ্যুত্থাতে হিটলার নেতৃত্বানীয় পদার্থ বিজ্ঞানীদের বিভাজন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত—থারার অবশিষ্ট ছিলেন তাঁদের নাৎসী যুদ্ধবাজদের অধীনে এমন দৈহিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছিল যা গবেষণার পবিশষ্ট। তৃতীয়ত—যন্ত্রপাতি বা গবেষণার জন্য উপযুক্ত টাকার ব্যবস্থা করা হয়নি এবং চতুর্থত—বৈজ্ঞানিকদের সাফল্যের বিষয়ে অনীহা, এমনকি অনিচ্ছা।

শেষ দুটিটারই নিষ্কার করব বিশেষভাবে।

1939-এর ছাফিশে সেক্টেম্বর, অর্থাৎ আলেকজান্ডার সাকস যেদিন আইনস্টাইনের চিঠি নিয়ে কলম্বো-স্টের সঙ্গে দেখা করেন তার পনের দিন আগে বার্লিনে জগৎ মেয় ‘ইউরেনিয়াম প্রজেক্ট’। নয়জন পদার্থ-বিজ্ঞানী এতে অংশ নেন—তার ভিতর উপস্থিত ছিলেন না অটো হান, ফন লে, ওয়াইৎসেকার বা হাইড্রেনবের্ক। ঠাড়া কেউ আমন্ত্রিত হননি। ঐ নয়জনও উচ্চতরের পদার্থ বিজ্ঞানী—কিন্তু তাঁদের নির্বাচনের আসল হেতু নাৎসীবাদের প্রতি তাঁদের অকৃত সমর্থন। মাসখানেকের ভিতরেই বোম্বকর কুর্পশঙ্কের টনক নড়ল—ডাক পড়ল ওয়াইৎসেকার এবং হাইড্রেনবের্কের। প্রকল্পের ‘কর্ণধার হলেন দুবাই, তাঁর অধীনে রইলেন হাইড্রেনবের্ক, যদিও পাতিভো হাইড্রেনবের্ক-এর স্থান অনেক উচ্ছে। অটো হানকেও ডাকা হয়েছিল পরে—কিন্তু হান সর্বসমক্ষে বলে ওঠেন, ‘হিটলারের হাতে আটম-বোমা তুলে দেওয়ার আগে আমি আত্মহত্যা করব।’

ঐর এক ছাত্র পৌঁছনোর বাল্যই না মেনে ছুটে এসে মুখ চেপে ধরেছিল প্রজেক্ট অধ্যাপকের।

মোট কথা, দ্বিতীয় জেরীর বৈজ্ঞানিকদের অধীনে শেষ পর্যন্ত ঐ চারজনকেই গবেষণার কাজে নিযুক্ত হতে হল। প্রথমে ঠাড়া স্থির করেছিলেন প্রতিবাদ করে শহীদ হবেন, কিন্তু মূলত হাইড্রেনবের্ক বুদ্ধিতেই ঠাড়া অন্য পথ ধরেন। ঠাড়া ভাব দেখান যেন আগ্রাণ প্রচেষ্টাতেও কিছু করতে পারছেন না। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং হাইড্রেনবের্ক বুঝাচ্ছে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন—

“ডিপ্টোটারিশপে তদায়ই সক্রিয়ভাবে বাধার সৃষ্টি করতে পারে, যাগা ভান করে যায় শাসনযন্ত্রের সঙ্গে সবককম সহযোগিতা করতে তারা প্রস্তুত। প্রতিবাদের অর্থ বন্দীশিবিরে আবদ্ধ হওয়া। সেখানে শহীদ হয়েও লাভ নেই—কেউ তাঁর নাম বা মতামতের কথা জানতে পারবে না। তার নামোচ্চারণই নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। বিশেষ জুলাই যারা নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে গ্রাণ মিল—তাদের মধ্যে আমার কিছু বন্ধুও আছে—তাদের কথা মনে করে আমার আত্মানুশোচনা হয়। আমার ভাবি—ওরাই কি প্রমাণ করে দিয়ে গেল না, ঐ শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানার—তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার, একমাত্র পথ হচ্ছে সহযোগিতার ভান করে যাওয়া?”

এর পর জার্মান বৈজ্ঞানিকের দল পরমাণুবোমা বানানোর প্রতিযোগিতায় কেন ব্যর্থ হয়েছিলেন সে কথা বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করে এ পরিচ্ছেদের যবনিকা টানব। যুদ্ধ চলাকালে হাইড্রেনবের্কের সঙ্গে প্রফেসর নীলস বোর-এর সাক্ষাৎ। তখনও প্রফেসর বোর ডেনমার্ক ছেড়ে পালিয়ে আসেননি। ডেনমার্ক তখন নাৎসী অধিকারে। বোর তাঁর ইহুদী এবং অনার্য সহকারী বন্ধুদের সকলকেই ইলেক্ট বা আমেরিকায় পাচার করেছেন—শুনা ল্যাবরেটরি ঠাকড়ে তিনি একা পড়ে আছেন শুধু এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে যে, হিটলার অস্ত্রত তাঁকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাবে না। ভয়ে সবাই কীটা হয়ে আছে।

এই সময় অটো হান, হাইড্রেনবের্ক প্রভৃতি স্থির করলেন প্রফেসর বোর-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা নিষাঙ্ক প্রয়োজন। আমেরিকা যেমন জার্মান পরমাণু-বোমার ভয়ে ভীত—এইসব বৈজ্ঞানিকও অনুগতভাবে ভাবছিলেন, মার্কিন পরমাণু-বোমায় তাঁদের সাধের জার্মানী ধ্বংসপূরীতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। তাঁদের দুঃখটা আরও বেশী—কারণ অতলাস্তিকের ওপারে থাড়া বোমা বানানো, ঠাড়া জনকেই জার্মান—ফ্রাঙ্ক, মাক্স বর্ন, ফিল্ডার্ট, টেলার, ফুকস, হাল, বেথো—সবাই ঐদের ঘরের লোক। ঐসব মার্কিন-প্রবাসী মধ্যযুরোপীয়দের একটা খবর দেওয়া দরকার যে, জার্মান পরমাণু-বোমা



একটা আন্তঃ-বাণ। তার তরে আগন্তাগেই তোমরা এ-দেশটাকে স্থানান্তরিত কর না। এ খবর পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার মত উপযুক্ত লোক একমাত্র ডেনিশ বৈজ্ঞানিক নীলস্ বোর। তার কথা এমন কেউ অবিশ্বাস করবে না যে মিথিষ্ণ বইয়ের প্রথম পাতাটা উন্মোচিত। কিন্তু কোডালের গলায় ঘকটা কে বাধে? তঁরা এই দৌত্যকার্যে পাঠালেন স্বয়ং হাইজেনবের্গকে। হাইজেনবের্গ 'ইউরেনিয়াম-প্রকল্পের' ডেপুটি ডাইরেক্টর, তার একটা শমনবাঁদা আছে। তার চেয়েও বড় কথা, হাইজেনবের্গ হচ্ছেন নীলস্ বোরের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র।

গুরুশিষ্যের সাফল্যকারী নিত্যস্বই দুঃখাগ্রজনক।

তার একটা কাকতালীয় হেতু আছে। হাইজেনবের্গ তার বিয়ের অনুসারে দু-নৌকায় পা দিয়ে চলছিলেন। বাহ্যিক জার্মান-সরকারকে মদ্য নিতে হচ্ছিল তাঁকে, যাতে তাঁর সহকর্মী বৈজ্ঞানিকদের উপর নাৎসী অত্যাচার না হয়। একদা জার্মানী যখন পোলাণ্ড অভিযান করে তখন এক স্বতন্ত্র সভায় হাইজেনবের্গ হিটলারকে প্রশংসা করে একটি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে সেটা নজরে পড়েছিল তাঁর অধ্যাপক নীলস্ বোর-এর। তাই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের দারুণ হয়েছিল তাঁর প্রিয় ছাত্র হাইজেনবের্গ তাঁর অধ্যাপক নীলস্ বোর-এর। এই 'বাইরে-এক ভিতরে-আর' নীতি কখনই করতে পারেন না সহজ সরল নাৎসী শাসকদের অশ্রু ভক্ত। ঐ 'বাইরে-এক ভিতরে-আর' নীতি কখনই করতে পারেন না সহজ সরল সোজাগাথের পথিক নীলস্ বোর। তাই হাইজেনবের্গ যখন কোপেনহেগেন-এ এসে তাঁর অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করলেন তখন অত্যন্ত গম্ভীর এবং উদাসীনভাবে তাঁকে গ্রহণ করলেন প্রফেসর বোর। অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন দু-জনে, জনান্তিকেই—কিন্তু কেউই মন খুলে প্রাণের কথা বলতে পারেননি। দুজনেই দুজনকে ভয় পাচ্ছিলেন। হাইজেনবের্গ শেষ পর্যন্ত মরিয়া হতে প্রস্তুত করে বসলেন, আপনি কি মনে করেন অনতিবিলম্বে পরমাণু-বোমা তৈরী হতে পারে?

নীলস্ বোর জবাবে বলেছিলেন, আমি তা মনে করি না।

—কিন্তু আমি করি স্যার। আমার দৃঢ় ধারণা, চেষ্টা করলে আমরা অনতিবিলম্বে ঐ রকম বোমা তৈরী করতে পারি।

উদাসীনভাবে বোর বলেন, হতে পারে। নাৎসী জার্মানীর ভিতরে তোমরা কতদূর কী করেছ তা আমি জানব কেমন করে?

হিতে বিপরীত হচ্ছে কুহাতে পেয়ে হাইজেনবের্গ বলেন, সে-কথা বলছি না স্যার। আশ্চর্য, আপনি কি মনে করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওরা অনেকটা এগিয়েছে?

আবার উদাসীনভাবে বোর বললেন, আমার মনে করায় কী এসে যায়?

মোটকথা হতাশ হয়ে হাইজেনবের্গ ফিরে গেলেন। আসল কথা খুলে বলার মত পরিবেশই ইচ্ছা পেলেন না তিনি। বহুতর এই সাফল্যকারে ভালোর চেয়ে মন্দই হল বেশি। নীলস্ বোরের ধারণা হল নাৎসী বৈজ্ঞানিকেরা অনতিবিলম্বে পরমাণু বোমা তৈরী করে ফেলবে। না হলে ওকথা বলল কেন হাইজেনবের্গ?

এই সাফল্যকারের পরেই বোর-এর এক বন্ধু গোপনে এসে খবর নিলেন তাঁকে জেদ্দার করায় সজ্ঞাবনা সেখা নিয়েছে। বোর সুইডেনে পালিয়ে গেলেন। সেখান থেকে মেনে করে ইংল্যান্ডে। পরে আমেরিকায়। নীলস্ বোর বহু সম্মান পেয়েছেন জীবনে—তার ভিতর একটি তাঁর মেনে করে ইংল্যান্ডে আসার সময় পেয়েছেন তিনি। ব্রিটিশ এয়ারফোর্স এই মূল্যবান 'কমডিটি'টিকে নিরাপদে সুইডেন থেকে ইংল্যান্ডে আনবার ব্যবস্থায় এতই সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন যে, তাঁকে একটি বোম্বাক বিমানে করে নিয়ে আসা হয়। বৃদ্ধকে বসতে বলা হল প্যারাসুট এবং লাইফ-কেট সেটে, বোম্বার গর্তটায় বিমিত বোর প্রস্তুত করলেন—এ কি। এখানে বসব কেন? গর্তের ভিতর?

পাইলট সবিনয়ে বললে, সেই রকমই নির্দেশ আছে স্যার। আমার মেনে আক্রমণ হলে আর্ট আপনাকে জীবন্ত বোম্বার মত সমুদ্রে ফেলে দেব। আদেশ আছে, মেনেটা ভেঙে গেলেও আপনাকে বাঁচাতে হবে। পিছন-পিছন আসছে একটা সী-মেন, সে আপনাকে উদ্ধার করবে।

ইংল্যান্ডে পৌঁছে জার্মান ইউরেনিয়াম-প্রকল্পেই সবচেয়ে প্রফেসর বোর যা বললেন তাতে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা নতুন করে শুনল হাজার—কাণ্ডে বাধ-এর।



বড়ই জুন ১৯৪৩। লস অ্যালামস থেকে দুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে ওপেনহাইমার এসেছে সানফ্রানসিস্কোয়। উঠেছে একটা হোটেল। ওর বী বয়েছে লস অ্যালামস-এ। হঠাৎ কেন ওকে সানফ্রানসিস্কোয় আসতে হল? তা কেউ জানে না। এমনকি মিনেস্ ওপেনহাইমারও নয়। হোটেল থেকে রাত আটটা নাগাদ বের হল ওপেনহাইমার। একটা টাক্সি নিল। ড্রাইভারকে বলল, চল—টেলগ্রাফ হিল।

রবার্ট জে ওপেনহাইমার স্বতন্ত্র ভাবে, ও টাক্সি ড্রাকার সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠল রাস্তার ওপাশে একটা গাড়ির চালক। লোকটা তাকে ছাড়ার মত অনুসরণ করে চলেছে আজ তাঁর মাস। লস অ্যালামস থেকে একই ট্রেনে সে এসেছে সানফ্রানসিস্কোয়। পোকটার নাম ডি-সিলভা। একজন এক, বি, আই, এজেন্ট। কর্নেল প্যাশ নিযুক্ত।

এফ. বি. আই-য়ের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে বিশেষ ক্ষমতাবলে জেনারেল গ্রোভস ওপেনহাইমারকে চাকরি দিয়েছেন। এ কাজের অধিকার তাঁর ছিল। কিন্তু তাই বলে এফ বি আই-টীক তাঁর কর্তব্য থেকে বিদূত হননি। তাকে ক্রিয়ারেপ সেওয়া হ্যানি জাতির স্বার্থে তার উপর নজর রাখবার আদেশ দিয়েছেন কর্নেল প্যাশকে। ওপেনহাইমারের প্রতিটি পদক্ষেপের রেকর্ড তৈরী হয়ে যাচ্ছে তার অজান্তে।

টাক্সিটা টেলিগ্রাফ হিল-এর একটা বাড়লো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ভাড়া মিটিয়ে ওপেনহাইমার ঢুক গেল ভেতরে। ডি-সিলভা সে বাড়ি থেকে একশ মিটার দূরে তার গাড়িটা পার্ক করে চুপচাপ বসে রইল টেলিফোনে ক্যামেরা হাতে। রাত বারোটা নাগাদ বাড়ির আলো নিবে গেল। সাধা রাত কেউ বার হল না বাড়িটা থেকে। পরদিন ভোরবেলা দরজা খুলে বাইরে গেল ওপেনহাইমার এবং একটি বছর বয়সের মহিলা। মেয়েটি গ্যাবরেল থেকে গাড়ি বার করল—ওপেনহাইমারকে নিয়ে চলে গেল এয়ারপোর্ট-এর দিকে। স্নেন ধরে ওপেনহাইমার চলে গেল পূর্বমুখে।

পরদিন বিস্তারিত রিপোর্ট পৌঁছে গেল কর্নেল প্যাশ-এর টেবিলে, থান-প্যাশেক ফটো সমেত। মেয়েটিকে সহজেই সনাক্ত করা গেল। ডক্টর মিস্ জীন ট্যাটলক্। নামকরা কমুনিষ্ট।

২৭ শে জুন জি-টু ডিভিশনের ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ কর্নেল প্যাশ একটা বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়ে নিলেন নিউ ইয়র্কে তাঁর বড়কর্তা কর্নেল ল্যাঙ্ডলেয়ার কাছে।

ত্রি দু-মাস পরে একদিন রবার্ট ওপেনহাইমারকে সেখা গেল সানফ্রানসিস্কোতে জি-টু ডিভিশনাল মেজকোর্ডার্সে লায়াল জনসনের কামরায়। জনসন ডি-সিলভার উপর-ওরাল এবং কর্নেল প্যাশ-এর অধীনে নিযুক্ত। বারই জুন রাত্রের বিশপেটখানা ডি-সিলভা এর মাধ্যমে উপরে পাঠিয়েছিলেন, ফলে মিস্ ট্যাটলক্-সংক্রান্ত সংবাদ জানতে বাকি ছিল না লায়াল জনসনের। আপ্যায়ন করে বসালো সে লস অ্যালামসের ডিরেক্টরকে।

শেনা গেল, ওপেনহাইমারের আগমনের হেতু হচ্ছে রোজি সোমানিটজ। ছোকরার পিছনে লেগেছে এক-বি-আই। সোমানিটজ ছিল বার্কলেতে ওপির ছাত্র, বর্তমানে লস অ্যালামসে। তাকে নাকি এক-বি-আই থেকে বের এনেছে জিআসাবাদ করতে। তাই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর স্বয়ং এসেছেন পুলিশ মেজকোর্ডার্সে তত্ত্বাবলাশ নিতে।

জনসন কমুনিষ্ট-প্রভাবের কথা আলোচনা করল, বললে সোমানিটজকে আপাতত নাকি ছাড়া যাচ্ছে না। আরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে তাকে। জনসনের দারণা, রীতিমত একটা গুপ্তচর বাহিনী মনহাটনে ডিবিই-এ গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। তারা ডলারে মাইনে পায় না, পায় কুবলুস-এ। ওপেনহাইমার গম্ভীর হয়ে বললে, আমি তোমার সঙ্গে একমত ক্যাণ্টেন। এমন ইঙ্গিত আমিও পেয়েছি।

—আপনি? কী ব্যাপার?

—জর্জ এলটেনটনের নাম শুনেই।

—বলেন কী? তার ফাইলটা আমি সপ্তাহে তিনবার ওপটাই। নামকরা বাশ্যান-এজেন্ট।

—সেই এলটেনটন একজন বালালকে পাঠিয়েছিল লস অ্যালামসে। কার্যোদ্ধার হ্যানি, কিন্তু সে তিন-তিনটে দরজায় হাঙা দিয়েছিল।



—বলেন কী! একটা বিস্তারিত করে বলবেন?

—বলতেই তো এসেছি—

আয়োপাশ্ব ঘটনাটা শুনে জনসন বললে, একেসর, এটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, আমার বন্ কর্নেল প্যাশ আপনায় মুখ থেকে সরাসরি শুনতে চাইবেন।

—আমার আপত্তি নেই আবার বলতে। কর্নেল প্যাশ তাঁর চেম্বারে আছেন?

—না, ডক্টর। উনি একটা জরুরী কাজে বেরিয়েছেন। আপনি কাল সকালে একবার আসতে পারবেন?

—পারব। আটটার সময়। বিকালের স্নেনে আমি ফিরে যাব।

কর্নেল প্যাশ তাঁর ঘরেই ছিলেন। কিন্তু ইচ্ছে করে কিছুটা সময় নিল তাঁর দ্বী জনসন। সে মনে মনে ছক করে ফেলেছে। ওপেনহাইমার ফিরে যেতেই সে কর্নেল প্যাশ-এর ঘরে ঢুকল। বিস্তারিত বলল সব কথা বুলে। কর্নেল প্যাশ বললে, এখনই ওকে ডেকে নিয়ে এসে না কেন?

—কিছু ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেট লাগাতে হবে স্যার। ডক্টর ওপেনহাইমারের স্টেটমেন্টটা ট্রেন-রেকর্ড করে রাখতে চাই।

প্যাশ বুশ হল তার অধীনস্থ কর্মচারীর দূর্বলশিঁথায়।

পরদিন ওপেনহাইমার যখন কর্নেল প্যাশ-এর ঘরে ঢুকল তখন সে জানত না, কতদূর কতক সে যা বলছে তা গোপনে ট্রেন-রেকর্ড হয়ে রইল এফ. বি. আইয়ের দপ্তরে। কর্নেল প্যাশ আশ্চর্য করেছিল, কোন কাউন্টার-এসপারানোয়েন্সের সূত্রে ওপেনহাইমার জানতে পেরেছিল, তাকে সন্দেহ করছে এফ. বি. আই। তাই সে নিজে থেকেই ভালমানুষী সেবাতে এসেছিল জি-ইউ সদর-দপ্তরে। অতুল লোমানিউজ-এর বিষয়ে তত্ত্বালাশ নিতে সে আদৌ আসেনি এবার সমন্বয়সিদ্ধিতে। এসেছিল পুলিশের সঙ্গে দহরম-মহরম করতে।

ওপেনহাইমারের গাছটা ছিল এইরকম—এলটেনটনের দালাল লস অ্যালামসে তিন-তিনজন বৈজ্ঞানিককে পর্যায়ক্রমে যাচাই করে। তিনজনই তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। ঐ তিনজন বৈজ্ঞানিকের নাম, অজ্ঞাত দালালটির নাম জানবার জন্য প্যাশ খুব পীড়াপীড়ি করে; কিন্তু কিছুতেই সেকথা বলতে রাজী হলেন না ওপেনহাইমার। তাঁর যুক্তি—দালালটি আসলে নিতান্ত ভালমানুষ—ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুকেই সে এমন কাজ করেছে। তার কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না—আর বৈজ্ঞানিক তিনজন তো প্রত্যাখ্যানই করেছেন। ফলে তাঁদের আর মিছে কেন জড়ানো।

পরদিনই কথোপকথনের ট্রেন-এর একটা কপি সমেত দীর্ঘ রিপোর্ট পাঠিয়ে দিল প্যাশ তার উপরওয়াল। কর্নেল ল্যাংডেল-এর কাছে—নিউইয়র্কে। তার রিপোর্টের উপসহায়ে প্যাশ লিখেছিল—

"This office is still of the opinion that Oppenheimer is not to be fully trusted and that his loyalty to the nation is divided. It is believed that, the only undivided loyalty that he can give is to Science and it is strongly felt that, if in his position the Soviet Govt. could offer more for the advancement of his scientific cause, he would select that Govt. as the one to which he could express his loyalty."

অর্থাৎ, ওপেনহাইমারকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। জাতির প্রতি তার অকৃত্রিম আনুগত্য নেই। তার একমাত্র লক্ষ্য: বিজ্ঞান। আজ যদি 'সাবিথেট গভর্নমেন্ট' তাকে বিজ্ঞানচর্চায় বেশী সুযোগ দেবার স্বেচ্ছা দেখায়, তবে সে অন্যায়সে ও-সঙ্গে যোগ দেবে!

অনতিবিলম্বে ল্যাংডেল ডেকে পাঠালেন ওপেনহাইমারকে। পুনরায় জেরা। নানভাবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ওপেনহাইমার দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করল, ঐ তিনজন বৈজ্ঞানিক অথবা ঐ দালালটির নাম প্রকাশ করে দিতে। বলল, আপনাদের সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করতে আমি প্রস্তুত—এজন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ কথা বলতে এসেছি। কিন্তু তাই বলে স্বাধীন অপরোধী নন তাঁদের 'গম' আমি কিছুতেই বলব না।

ল্যাংডেল বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। না বলতে চাইলে আর কী করব আমরা? ঐ তো নাৎসী জার্মানী অথবা স্তালিনের রাশিয়া নয়। আপনাকে কোনভাবেই বিবৃত করব না আমরা।

বুশ হয়ে ওপেনহাইমার ফিরে গেল লস অ্যালামসে। মিস্ টাটলকের এসব আদৌ উঠল না।

এখানেই কিন্তু মিটল না ব্যাপারটা। সমস্ত কাগজপত্র এফ. বি. আই-পাঠিয়ে দিল জেনারেল হোভার্ডকে—ট্রেন-রেকর্ড, মিস্ টাটলকের ফটো সমেত। লিখল, আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও আপনি ব্যক্তিগত দায়িত্বে ওপেনহাইমারকে নিয়ুক্ত করেছিলেন। আমরা আবার সুপারিশ করছি—তাকে অবিলম্বে বরখাস্ত করুন। এ ছাড়া আমাদের আরও তিনটি দাবী, প্রথমত—মিস্ টাটলকের সঙ্গে কেন ওপেনহাইমার রাত কাটালেন? দ্বিতীয়ত—ঐ তিনজন বৈজ্ঞানিক কে? তৃতীয়ত—ঐ দালালটি কে? এ তিনটি প্রশ্নের জবাব আপনার অধীনস্থ কর্মচারীর কাছ থেকে জেনে আমাদের জানান। ব্যাপারটার গুরুত্ব যাগেই। আপনার রিপোর্ট গেলে আমরা যুদ্ধসচিবের কাছে আমাদের রিপোর্ট পাঠাব।

জেনারেল হোভার্ড-এর মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। মানহাটিন ততদিন প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। শিকাগোতে ফেরি 'ড্রেন-রিজ্যাকশন' সাফল্যমণ্ডিত করেছে। ইউ 238 থেকে ইউ 235 পরমাণু বৃদ্ধীকরণও করা গেছে। ব্রুটেনিয়াম পরমাণু বিদীর্ণ করার ফর্মুলাও আবিষ্কৃত। এইসব তাত্ত্বিক সূত্রের সাহায্যে লস অ্যালামসে হাতে-কলমে বোমা প্রস্তুত হচ্ছে। সে কাজ যে তত্ত্বাবধান করছে, সে নেকটাই কবাবি জে-ওপেনহাইমার। ক্রাইস্ ফুন্স্ ইতিমধ্যে হিসাব করে বার করেছেন বোমার আকার, ওজন ও আকৃতি অর্থাৎ 'ক্রিটিক্যাল সাইজ'। ওপেনহাইমার বিভিন্ন বিভাগে তার অংশ তৈরী করেছেন এ অবস্থায় ওপেনহাইমার সম্পূর্ণ অনিবার্য। অর্থাৎ—

হোভার্ড ডেকে পাঠালেন ওপিকে। খোলাখুলি বললেন, তোমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ আছে। আমাদের সব কথা বুলে বলতেই হবে। বল, কে ঐ দালাল, কোন তিনজন বৈজ্ঞানিককে যাচাই করেছিল সে।

জবাবে ওপেনহাইমার যা বলেছিল, সেটাই তার জীবনে সবচেয়ে বড় মিথ্যা-ভাষণ।

তিনজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে দুজনের নাম সে বলেনি, বলেছিল মাত্র একজনের নাম। সে নামটা: রবার্ট জে-ওপেনহাইমার। দালালের নামটাও প্রকাশ করে দিয়েছিল সে এবার। তাঁর নাম হাকন শেভেলিয়াস।

সজ্ঞান মিথ্যাভাষণ! বাস্তবে যা হয়েছিল তা এই: বাকি দুজন বৈজ্ঞানিক অস্বীকার করে।

হাকন শেভেলিয়াস ওর স্বীকৃতির বন্ধ। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপনা করছেন 1938 থেকে। ওপেনহাইমারের বৌক ছিল সাহিত্যের প্রতি। কাব্য পাঠে তাঁর সখ ছিল। শুধু ইরোজি নয়, ফ্রেন্স ও জার্মান সাহিত্যও পড়তেন তিনি। এমন কি সংস্কৃতও। যত্ন নিয়ে সংস্কৃত শিখেছিলেন। সেই নৃত্যেই এই দার্শনিক মনোভাষার নির্বিরোধী সাহিত্যের অধ্যাপকটির সঙ্গে আলাপ। কৈশোরে এবং যৌবনে ওপেনহাইমার সামান্যদেব নিকে ঝুঁকেছিলেন একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। সেই আমলেই এলটেনটনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শেভেলিয়াস এবং ওপির। কিছুদিন আগে লস অ্যালামস থেকে ওপেনহাইমার সতীক ক্যালিফোর্নিয়াতে এসেছিলেন। পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন শেভেলিয়াস সতীক। সম্ভাব্যেবা। দুটি মহিলা বসে ড্রইংরুমে গল্প করছেন—ওপেনহাইমার উঠে গেছেন প্যানট্রিতে, ককটেল বানিয়ে আনতে। গল্প করতে করতে শেভেলিয়াসও উঠে এলেন। ওপি ডিক্যান্টারে ব্রাই মাটিনী ঢালছেন, হঠাৎ শেভেলিয়াস বললেন, এলটেনটনকে মনে আছে তোমার?

বুশ না ঘুরিয়েই ওপেনহাইমার বললেন, বিলম্বল। কেন?

—কদিন আগে সে এসেছিল আমার কাছে। তোমার খোঁজ করছিল।

—কেন? কোন প্রয়োজনে?

—না, ঠিক প্রয়োজনে নয়। বলছিল, রাশিয়া এবং আমেরিকা যদিও এ যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে লড়াই করছে, তবু দু-দেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হচ্ছে না।

অন্যমনস্তের মত ওপেনহাইমার বললেন, তাই নাকি?

—না? তুমি কি মনে কর না—তোমরা যেসব আবিষ্কার করছ রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকদের তা জানা উচিত। এটা তারা যা বার করছে তা তোমাদের জানা উচিত?

এঁদের ওপি তাকিয়ে দেখল বন্ধুর নিকে। হেসে বললে, তুমি কি চাও আমি পরমাণুবোমার ফর্মুলা ওদের দিয়ে দিই?

—আমি চাই, একথা বলছি না। তবে এলমেন্টন নিশ্চয় তাই চায়। রাশিয়াতে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি কতটা হয়েছে তাও সে জানতে চায়।

এর জবাবে ওপেনহাইমার বাস্তবে কী বলেছিলেন তা নিম্নলিখিত হয়নি। শেভেলিয়াভের মতে—‘আমার দৃষ্টান্ত মনে পড়ে, ওপি বলেছিল—ওভাবে মধ্য আমেরিকায় করা ঠিক নয়।’ ওপেনহাইমারের মতে, আমি মৃত্যুরে বলেছিলাম—‘সেটা তো বিশ্বাসঘাতকতা।’

মোটকথা এখানেই কথোপকথনের সমাপ্তি। ওরা ড্রাইকেনে ফিরে আসেন এবং পরস্পরের স্বাস্থ্য স্থান করেন।

সারা হচ্ছে এই যে, ওপেনহাইমার সম্প্রদায়ের জীবনে মারাত্মকভাবে প্রতিফলিত হয়। শেভেলিয়াভ আদৌ গুপ্তচরের বৃত্তি নিয়ে ও প্রসঙ্গ তোলেননি। নিজের কথাটা কখনো ‘অ্যাকাডেমিক’ আলোচনা করেছিলেন বন্ধুর সঙ্গে। ওপেনহাইমার যদি উৎসাহিত হতেন তবে হয়তো তিনি বলতেন—তাহলে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ কর। রাশিয়ার কথা সংগ্রহ কর, তোমাদের তথ্য ওদের জানাও।

ওপেনহাইমারের এই স্বীকারোক্তির ফলাফল শেভেলিয়াভের জীবনে মারাত্মকভাবে প্রতিফলিত হয়। তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করা হল অজ্ঞাত কারণে—এটা প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও কোনও অজ্ঞাত কারণে তিনি কোথাও চাকরি জোগাড় করতে পারেননি কাকি জীবনে। আইডেন্ট টাইপারি করে জীবন কাটিয়েছেন। দীর্ঘ দশ বছর ধরে শেভেলিয়াভ জানতে পারেননি তার কারণ। এ দশ বছরে বহু ওপেনহাইমারের সঙ্গে দেখাও হয়েছে বেকার দুঃশাহুর শেভেলিয়াভের। ওপেনহাইমার শুধু নৈতিক সহানুভূতি জানিয়েছেন।

দীর্ঘ দশ বছর পরে আসল ব্যাপারটা জানতে পেয়েছিলেন শেভেলিয়াভের সম্প্রতি। যুদ্ধ শেষে বন্ধন ওপেনহাইমারকে উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল আত্মীয়ের কাঠগড়ায়, ব্যস্তির প্রতি নিষাধঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে, ফ্রাঙ্ক বসে সর্বোদপত্রের পৃষ্ঠায় বেকার মানুষটা পড়েছিলেন আমেরিকার ওপেনহাইমারের বিচার কাহিনী। জবানবন্দিতে নিজ নামটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ইঁদুর ডেকে বলে উঠেছিলেন, ওগো শুনহঃ এই দেখ, কেন আমার চাকরি গিয়েছিল!

বন্ধুর সঙ্গে শেভেলিয়াভের আর কোনদিন সাক্ষাৎ বা পরালোচন হয়নি।

জেনারেল ফ্রান্স মিস্ টাটলকের প্রসঙ্গ আদৌ তোলেননি। কেন ওপেনহাইমার ঐ মহিলাটির সঙ্গে রাত কাটিয়েছিলেন সৌজন্যবোধে তা জানতে চাননি। তবে দশ বছর পরে কর্নেল গ্যাস যখন বিচারকের সামনে তার যাবতীয় নথীপত্র দাখিল করেন তখন ওপেনহাইমারকে সব কথা স্বীকার করতে হয়।



॥ প্রগার ॥

বারই এপ্রিল 1945। সকাল সাতটা বেজে নয় মিনিট।

ঘটনাটা বর্ণনা করার আগে তার পটভূমিটা একবার ঐতিহাসিক মূল্যায়নে বলিয়ে নেওয়া ভাল। জার্মানীর অবস্থা সঙ্গীন। বার্লিনের পতন হতে ব্যক্তি আছে মাত্র সাতেরোটি দিন। ওলিক থেকে রাশিয়ান রেড আর্মি, আর এদিক থেকে জেনারেল প্যাটনের হার্ড আর্মি বার্লিনের চুটি টিপে ধরেছে। যে কোনদিন যুদ্ধ শেষ হয়ে যেতে পারে—‘ডি-ডে’ পালানের আদেশ এসে যেতে পারে। জাপানেরও নাজিদের উঠেছে পৃথিবীর অপর প্রান্তে। তিল তিল করে জাপানের মূল ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে মার্কিন বাহিনী।

যে কথা বলছিলাম। ঠিক সাতটা বেজে নয় মিনিটে জার্মানের উপর উঠে দাঁড়ালেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডাইস-প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান। সেই ইতিহাসঘাত কাহিনীতে রুম। উপরে কুলছে উয়েয়া উইলসনের তৈলচিত্র। ঘরে রুজভেল্ট-কাহিনীদের সব কথাজন সভা। গত রাতে মারা গেছেন রুজভেল্ট। ঠার মরসেহ তখনও মাটির বুকে ফিরে যায়নি। চীফ জাসটিস হারলান স্টোনের হাত থেকে বাইলোটা নিয়ে হাইকোর্টফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বোকা করলেন ডাইস-প্রেসিডেন্ট—আই, হ্যাঁ এ-ট্রুম্যান ডু সলেনমনি সোয়াব-

সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান। দশ মিনিটের ভিতরেই শেষ। পূর্ববর্তী কাহিনীদের সমস্যা একে একে মরছে হেডে

বার হতে গেলেন। হ্যাটল্ড আইকস্, ফ্রেন্সি ওয়ালেস, হেনরি মর্চেন্টাও-ইত্যাদি ইত্যাদি।

দশ মিনিট হয়ে গেলে জার্মান থেকে নেমে এলেন সদ্যনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট এবং তখনই ঠার নজরে পড়ল হোমার চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন একজন। এক মাথা সালা বশধে চুল, বলিরেখাচিত বৃদ্ধ—হেনরি সিমসন, যুদ্ধসচিব।

—আপনি মাননি?

—হ্যাঁ, উপায় নেই। অত্যন্ত ভুলকী একটা কথা আপনাকে এখনই জানাতে চাই।

—যুদ্ধের সব কথাই তো জানা।

—এ, যুদ্ধক্ষেত্রের কথা নয়। এখনকার কথাই। আপনার মনে আছে প্রেসিডেন্ট—এনকোয়ারি করিটিক চেয়ারম্যান কাহিনী-বন্দ্য হ্যাঁ ট্রুম্যানের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে আমি একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ করেছিলাম।

—আছে মিসার সেক্রেটারি। মানহাটিন-প্রজেক্ট। যেখানে কোটি কোটি ডলার খরচ হয়েছে অথচ এক অতিশয় চিনিস্ত প্রজেক্ট বার হয়নি।

—ইয়েস! মানহাটিন-প্রজেক্ট।

যুদ্ধের দিকে একদিক দিয়ে নিয়ে ট্রুম্যান বললেন, দু-মিনিটের মধ্যে মূল তথ্যটা বলুন।

—মানহাটিন-প্রজেক্টে পরমাণু-বোমা তৈরী হচ্ছে, সত্যিই কোটি ডলার ব্যয়ে। আমাদের আশা প্রজন্মের মধ্যে সেটা তৈরী হয়ে যাবে। একটি বোমাও হয়তো লক্ষ লোককে হত্যা করা যাবে। অসীম শক্তিশালী এই বোমা।

জান হাসলেন হ্যাঁ ট্রুম্যান। বললেন, মিস্টার সেক্রেটারী। আমার অভিনন্দন। আশ্চর্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাইস-প্রেসিডেন্টকে শব্দে একবারটা জানাননি। কে কে জানেন?

—তার চেয়ে শুনুন—কে কে জানেন না। ডগলাস ম্যাকআর্থার জানেন না, জেনারেল প্যাটন জানেন না, আইসেনহাওয়ার জানেন না,—

—চাটল জানেন?

—জানেন।

—জালিন?

—না।

চিঠি লেখা হল। সেই চিঠিখানি নিউ ইয়র্কের হোয়াইট-হাউসে পৌঁছাল এপ্রিলের বারো তারিখ। কর্মতার বুকে নিতে দিন সাতেক সময় লাগল ট্রুম্যানের। যুদ্ধসচিব কিছু নাছোড়বান্দা। প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এত বড় একটা ব্যাপার তিনি কিছুতেই আর গোপন রাখলেন না। অগত্যা সময় করে নিয়ে ঐচিশে সকালে ট্রুম্যান বললেন যুদ্ধসচিবের সঙ্গে মানহাটিন-প্রজেক্টের কথা আলোচনা করতে। সে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন আর একজন মাত্র তৃতীয় ব্যক্তি—জেনারেল ফ্রান্স।

প্রেসিডেন্ট প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, এ-প্রজেক্টে হাত দেওয়া হল কার পরামর্শে?

হোবল্ড কটিল থেকে একটি চিঠি মেলে ধরলেন। দীর্ঘ পত্র। লিখেছেন আলবার্ট আইনস্টাইন, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে। তারিখটা, সেসের আগস্ট, 1939, তার লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া কয়েকটা ছবের উপর হুত চোখ বুজিয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট।

“It has been made probable through the work of Joliot in France, as well as Fermi and Seilard in America...that it may become possible to set up a number of chain reactions in a large mass of uranium....This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, extremely powerful bombs...”

‘ইলিও-ফ্রান্সিস-ফেরি’ সব অচেনা নাম, ‘চেন রিয়াকসান-অফ ইউরেনিয়াম’ ব্যাপারটা বোকা সেল না—কিন্তু শেষ পাঁচটা বৃদ্ধের পায়েল ট্রুম্যান—অসীম শক্তিশালী বোমার জন্ম হতে পারে।

—কিন্তু কী হবে এ বোমা নিয়ে? জার্মানীর পতন হতে তো আর এক সপ্তাহ। প্যাসিফিক-ফ্রন্ট বেতেও যে দর পড়ি—

বাহা নিয়ে অভিজ্ঞ সিমসন বললেন, প্রেসিডেন্ট! এই পরমাণু বোমার ব্যবহার করলো কি করলো না,

নিষাধঘাতক-এ



করলে কেমন করে, কোথায় করবো তা স্থির করতে পারে একটি উচ্চকমতাসম্পন্ন কমিটি। তাদের সুপারিশ আপনি মানতেও পারেন, নাও মানতে পারেন—

—টিক কথা। এমন একটি কমিটি তৈরী করুন তাহলে।

—আপনার এইরকম অভিকর্ষ হতে পারে মনে করে আমি পূর্বেই একটি বস্তু তৈরী করে এনেছি।

এতে পাচজন সদস্য আছেন।

প্রেসিডেন্ট কমিটি-সভ্যদের নাম অনুমোদন করলেন। পাচজনই সদস্য-বিশারদ। বৈজ্ঞানিকদের একজনও ছিলেন না কমিটিতে—অর্থাৎ যে বৈজ্ঞানিকদের প্রত্যক্ষভাবে পরামর্শ-বোমা তৈরী করছিলেন।

এ পঁচিশে এপ্রিলই গঠিত হয়ে গেল 'ইন্টারিম কমিটি'।

পঁচিশে এপ্রিল তারিখটা বুকে নিতে আবার একবার পৃথিবীর উপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া বাক। ঐ দিন:

ইতালির গণ-অনুষ্ঠান হল। শুভ আবাস থেকে ফ্যাসিস্ট বেনিটো মুসোলিনি আর তার শয্যাসিনী ক্রাবাকে বের করে আনলো উদ্ভাও বিদ্রোহীরা। হত্যা করে গাছে ঝাঁট ধরে ফুলিয়ে দিল, মাথা নিয়ে মিক করে।

জার্মানিতে ঐ একই দিনে রাশিয়ান স্যালফৌজ বার্লিন উপকণ্ঠে প্রথম প্রাচীর ভেঙে ভিতরে ঢুকল। ইভা ব্রাউন এলেন বার্লিন-বাঙ্কারে হিটলারের পরিণাম ভাগ করে নিতে।

জাপানে ব্যাপক বোমাবর্ষণে ঐ দিন মূলিসাৎ হয়ে গেল টোকিওর অনেকটা এলাকা।

মরিয়ানায়— অর্থাৎ হাওয়াই এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মাঝামাঝি প্রান্ত মহাসাগরের একটি নির্জন দ্বীপে ঐ দিন 509 নং কম্পোজিট ব্রুশ পারমাণবিক বোমার সামরিক পছন্দসমীতি নির্ভর শেষ করল।

যাই হোক, ইন্টারিম কমিটির দ্বিতীয় মিটিং বসল পেট্রাগানে, রিশে মে। কমিটির সদস্যরা বললেন—বৈজ্ঞানিক দলের ভিতর থেকে কিছু বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে কোঅর্ড করা দরকার। না হলে এই বোমা নিয়ে কী করা উচিত তা ঠাৱা নির্ধারণ করতে পারছেন না। তৎক্ষণাৎ সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হল আরও চারটি নাম। কম্পটন, ফের্মি, লরেন্স এবং ওপেনহাইমার। শেষোক্ত ব্যক্তি বাসে তিনজনই বিজ্ঞানে নোবেল-লরিয়ারেট।

ঐ চারজন ছাড়া বামবাকি কেউই সেদিন জানতেন না অ্যাটম-বোমা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে কিনা। প্রমাণ হওয়ার আগেই একটি কমিটি নির্ধারণ করতে বসেছেন— কোথায় গুটা ফেলা হবে। স্বপ্নেরটা ওরা পেতে শুরু করলেন দীর্ঘে দীর্ঘে, বাপে বাপে।

ওয়াইৎসকার একজন অতি উচ্চপদস্থ মার্কিন সামরিক অফিসারকে এই সময় গ্যাডিসমিটের রিপোর্টখানা দেখিয়ে বলেছিলেন, এতদিনে নিশ্চিত হওয়া গেল, কী বলেন? জার্মান জুজুর আর ভর নেই। আমাদেরও তাহলে এই নারকীয় কাণ্ডটা করতে হবে না।

প্রভিঞ্জ সামরিক অফিসারটি জবাবে বলেছিলেন, তাই কি হয় স্যার? এত খরচ পড়ল যার পেছনে সেটা ব্যবহারই হবে না? দেখবেন, বোমা ঠিকই পড়বে।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ওয়াইৎসকার। বহুতপস্বে ঐ বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের পরিণাম সম্বন্ধে অনেক প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকই ততদিনে ভাবতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে গ্যাডিসমিট-এর রিপোর্ট পাওয়ার পরে। এদের মধ্যে প্রফেসর নীলস বোর, এডিলার্ড, ফ্রাঙ্ক, ব্রোবিনোভিচ ইত্যাদি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাদের প্রচেষ্টার কথা একে একে বলি।

সর্বপ্রথম এ বিষয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন দার্শনিক প্রকৃতির প্রফেসর বোর। পরমাণু-বোমা তৈরী হবার ঠিক এক বছর আগে তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করেন ছাত্রবিশে আদর্শ 1944-এ। একটি সুলিখিত স্মারকলিপি ধরিয়ে দেন প্রেসিডেন্টের হাতে। ঐ রিপোর্টে বোর প্রেসিডেন্টকে অনুপ্রাণিত করেন অদাগত পরমাণু-বোমা প্রয়োগের বিষয়ে চিন্তা করতে। প্রফেসর বোর বাস্তবমুখী ছিলেন না—কিন্তু ঐ রিপোর্টে তিনি অদ্ভুত দুরদৃষ্টিতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। একস্থানে তিনি বলেছেন: 'বিশ্বব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তা আক্রমণকারীদের দ্বারা ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে। তাদের পতন অনিবার্য এবং অসম্ভব।

কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, যে-সব জাতি ঐ আশ্রয়ী নীতির বিরুদ্ধে কণ্ঠে দাঁড়িয়ে আজ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দেবে—কারণ তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বান-ধারণার মধ্যে মৌল পার্থক্য আছে।'

একদা বিশ্বশান্তির দৃব চেয়ে তিনি মিত্রপক্ষের তিন শীর্ষ-শক্তির ভিতর এই অসীম শক্তির অস্ত্রের বিষয়ে একটি সমঝোতায় আসতে প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এইভাবে গোপন সাক্ষাৎকারের কোন রেকর্ড রেখে বাণ্ডা পছন্দ করতেন না। নীলস বোরের সঙ্গে আলোচনার সময় তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না কেউ। প্রেসিডেন্ট কাউকে বলে যাননি তাদের কী কথাবার্তা হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রফেসর বোর-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে নৈতিক কারণে তিনি কোন ভাবাব দিতে অস্বীকার করেন। বলেন, প্রেসিডেন্ট যখন তা বলে যাননি—তখন আমার কিছু বলা শোভন হবে না।

মৌলিক প্রেসিডেন্ট এ-বিষয়ে অগ্রসর হয়ে কিছু করলেন না। নীলস বোর অতঃপর চার্চিলের সঙ্গে দেখা করেন। সে সাক্ষাৎকারের সময় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপসেষ্টা লর্ড চেরওয়েলও উপস্থিত ছিলেন। প্রফেসর বোর পরমাণু-বোমার ফলস্রুতি সম্বন্ধে দীর্ঘ আধবন্দ্য করে বলেন। বৈধ ধরে এতক্ষণ শুনিছিলেন চার্চিল। হঠাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। লর্ড চেরওয়েলকে বলেন: লোকটা কী বলতে চায়? রাজনীতি না পদার্থবিদ্যা?

What is he really talking about? Politics or physics?

নীলস বোর এ ব্যাপারে কী বলবেন ভেবে পাননি।

মর্মাহত হয়েছিলেন আলেকজান্ডার সাকলও। পারমাণবিক-বোমা প্রার তৈরী হয়ে এল অখচ জার্মানি বা জাপান তা তৈরী করেনি জেনে ধনকুবের সাকসও বীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর মনে হয়, বর্তমান যুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার হলে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য তিনিই পরোক্ষভাবে দায়ী হয়ে থাকবেন। তিনি প্রেসিডেন্টকে একটি খসড়া দাখিল করেন 1944-এর ডিসেম্বরে। তাঁর প্রস্তাবটা ছিল—

মিত্রশক্তি এবং নিরপেক্ষ দেশগুলির বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, ধর্মজগতের প্রধান ও আত্মজাতিক সংস্থা প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ঐ অস্ত্রের কার্যকারিতা পরখ করে দেখানো হবে। এভাবে এ অস্ত্রের প্রয়োগক্ষমতা প্রমাণ করে জার্মানী ও জাপানকে চরমপত্র দেওয়া উচিত নির্দিষ্ট তারিখের ভিতর আত্মসমর্পণের নির্দেশ জানিয়ে।

এ পরটিও রুজভেল্ট বিবেচনার জন্য রেখেছিলেন তাঁর দপ্তরে। যুদ্ধসচিবকে এর কথাও কিছু বলে যাননি।

পরমাণু-বোমার প্রয়োগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে উৎসাহী জন হাঙ্গেরিয়ান বৈজ্ঞানিক এডিলার্ড। 1939 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাকালে তিনিই ছুটে গিয়েছিলেন আইনস্টাইন-এর কাছে। এবার 1945-এ তিনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর চিত্র মানসচক্ষে দেখে শিউরে উঠলেন। তাঁর মনে হল, এ বোমার জন্য তিনিই একাধারে দায়ী। বোমা যাতে বর্ষিত না হয় সেজন্য প্রাণপাত করেছিলেন এডিলার্ড। ক্রমাগত চেষ্টা করেও হাতী ইমানের সঙ্গে কোন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে পারলেন না তিনি। অতিবাস্ত প্রেসিডেন্ট তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীকে পাঠিয়ে দিলেন জেমস্ বার্নেস-এর কাছে। বার্নেস একজন ক্ষমতাসাহী ডেমক্র্যাট সেনেটর। বহুতর এডিলার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক-সম্প্রদায়ের ভিতরেই তিনি সেক্রেটারি অফ স্টেট পক্ষে অবস্থিত হয়েছিলেন।

এডিলার্ড হানসিকতার দেখাই পেতে পুরস্কার বার্নেসকে কাবু করতে পারলেন না। অবশেষে অন্য বুদ্ধির অবহারণা করলেন তিনি, আমার মনে হয় এখনই রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের চুক্তিবদ্ধ হওয়া উচিত। আমি স্যার, বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের কথা ভাবছি না। ভাবছি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা।

বার্নেস হেসে বলেছিলেন, তাহাল বলব, বড় ভাবভাঙি ভাবছেন আপনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই এখনও শেষ হয়নি। আর ফর ফ্রোর ইনফরমেশন, প্রক্সেস, রাশিয়ায় ইউরেনিয়াম আদৌ নেই।

হতাল হয়ে ফিরে এলেন এডিলার্ড লস্ আল্যামসে। দেখলেন, সেখানে তাঁর সহকর্মী বৈজ্ঞানিকরা অনেকেই তাঁর সঙ্গে একমত। তাঁরা বললেন, জার্মানী যখন পরাজিত, জাপান নতজানু, তখন এ বোমা ব্যবহার কোন অর্থই হয় না।



কে একজন ( নামটা জানা যায়নি ) বলেছিলেন, কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের যুক্তি না শোনেন তবে আমরা এ কারখানায় ধর্মঘট করব। মার্কিন সরকার আমাদের সঙ্গে শলিখিত ভাবে লোকের চুক্তি করেছিলেন যে, এ অস্ত্র শুধুমাত্র আত্মরক্ষার্থে ব্যবহৃত হবে—আত্মরক্ষা রপ্তানির জন্য নয়। সরকার যদি চুক্তি না মানেন তবে সেটা হবে সরকারের চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

ফুকস্ নাকি জবাবে বলেছিলেন, এখন এ প্রকল্প যে অবস্থায় আছে তাতে আভ্যন্তরীণ-প্রাকল্পের দিয়েই বাকি কাজটা সম্পন্ন করা সম্ভব। নাট-বোম্বটুকুলা তো শুধু কয়ত বাকি, বহু।

লস্ আল্যামসে সেদিন কলকাতার কক্ষে অনেকক্ষণ এ নিয়ে আলোচনা হল। শিলির ইতিমধ্যে দুটি দল হয়ে গেছে। একদলের নেতা ওপেনহাইমার,—সে দলে আছেন ইন্টারিম কমিটির বাকি তিনজন সদস্য—ফের্মি, কম্পটন আর লরেন্স। অপর দল বোমবিয়োদী। সে দলের দলপতি অতিজ্ঞাত জার্মান বৈজ্ঞানিক নোবেল-সরিয়াট জেমস্ ফ্রাঙ্ক এবং তার সক্রিয় কর্মী হজিলার্ড। ঐরাব্রাই সাবজ্ঞান বৈজ্ঞানিক তৈরী করলেন একটি রিপোর্ট। তার নাম ফ্রাঙ্ক রিপোর্ট। তাতে সই দিলেন—ফ্রাঙ্ক, হজিলার্ড, বোমবিয়োদী এবং আরও চারজন। রিপোর্টখানি নিয়ে হজিলার্ড উপস্থিত হলেন ব্রাউন্স্ ফুকস্-এর চেম্বারে। কিন্তু সই দিতে অস্বীকার করলেন ফুকস্।

—কেন? আপনি তো বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে বলেই চিরকাল জানতাম আমি।

—আজ্ঞে না। ভুল জানতেন। এই বোমা তৈরী করতে দুই বিলিয়নে ডলার খরচ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বুঝেছেন? দুই বিলিয়নে ডলার।

—তাহলে আপনি কি কিছুই করবেন না?

—কেন করব না? জাপান যখন জ্বলবে তখন বেহালা বাজাব। নীরোগে তো তাই করেছিলেন। এই তো ইতিহাসের শিক্ষা।

ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন হজিলার্ড। শেষদিকে ফের্মি মত বলছিলেন। তিনি এবং আই রাবি একটা যৌথ পত্র লিখেছিলেন প্রেসিডেন্টকে, “এই অস্ত্রের বিধ্বংসী ক্ষমতার কথা মনে করে আমরা পরামর্শ দিই নৈতিক কারণে এর প্রয়োগ আপনি বন্ধ করুন।”

নীলস্ বোর-এর পর, ফ্রাঙ্ক রিপোর্ট, ফের্মির চিঠি—কিছুতেই কিছু হল না। আরও একটা চেষ্টা করেছিলেন হজিলার্ড। একক প্রচেষ্টা। গাড়ি নিয়ে একাই চলে গিয়েছিলেন লং-আইল্যান্ডের পকিশতম প্রান্তে। এবার বাড়িটা চিনতে অসুবিধা হয়নি। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক এবার সহজেই চিনতে পারলেন হজিলার্ডকে। ছয় বছর আগে তাঁকে সেবেছিলেন, সে ঠিক ছাত্র। অসোয়াপ্য সব কথা বলে বললেন হজিলার্ড। আইনস্টাইন তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন পুনরায় কলকাতাকে একটি পত্র লিখতে।

চিঠি লেখা হল। সেই চিঠিখানি নিউ ইয়র্কের হোয়াইট-হাউসে পৌঁছাল এপ্রিলের বাতায় তারিখ। কিন্তু প্রাপকের হাতে সেটা পৌঁছল না। পূর্বরাতে চিঠির প্রাপক ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট অস্ট্রিম নিম্নাস ফেলেছেন। চিঠিখানা বাবা ছিল, না-খোলা অবস্থায়, তার স্বলভিবিজ্ঞ হাবী টুম্যানের টেবিলে। অপারের হাতে। নিত্যই নিয়তির পরিহাস।



॥বারো॥

৯ই জুলাই ১৯৪৫। তিনখানি টেলিগ্রাম করলেন ওপেনহাইমার। একই বয়ান। প্রাপক তিনজন হচ্ছেন মিকাগোর আর্থার কম্পটন, বার্কলের আর্নেস্ট লরেন্স এবং নিউইয়র্কের লেসলি গ্রোভস্। তিনজনেই আমেরিকান। টেলিগ্রামের বক্তব্য ‘পত্রের তারিখের পরে মাছ ধরতে যাব। বৃষ্টি না পড়লে পরদিনই মত দাওয়ায়।’

তিনজনেই প্রকৃত ছিলেন। সামাজিক ভাষায় বক্তব্যও বুঝলেন। রবণা হলেন লেখতে।

তিনটি বোমা তৈরী হয়েছে এতদিনে। দুটি মুরটোনিয়াম পরমাণুর একটি ইউরেনিয়ামের। সর্বমোট খরচ হয়েছে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। অক্সায়েব হিসাবে তিনটিই প্রস্তুত। তবে সব কিছু ব্যর্থ লম্বে।

প্রায় মাত্র একটাই: ফটিবে তো?

হির হল, একটিকে ফাটিয়ে পরব করা হবে। লস্ আল্যামস থেকে ৩৩৭ কি-মি-দক্ষিণ-পশ্চিমে জনমানবহীন এক বিজন প্রান্তরে। জায়গাটির নাম আল্যামগর্ডো। মাস-ছয়কে আগেই স্থানটা নির্বাচিত হয়েছিল। ছয়মাস ধরে যাবতীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে ঐ মরুপ্রান্তরের গভীরে। সে ব্যবস্থার একটু পরিচয় দিই। যেখানে বোমাটা ফটিবে তাকে বলা হল ‘আউন্ট জিরো’। প্রশ্ন হল—কতদূরে রাখা হবে যন্ত্রপাতি? মানুষের পক্ষেই বা নিরাপদ দূরত্ব কতটা? পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণের পূর্বঅভিজ্ঞতা তো কারও নেই! আশঙ্কে ভুল হলে যে শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরাই উড়ে যাবেন। কী করা যায়? সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ছিল কিস্টিয়াকৌন্সির নেতৃত্বে গঠিত একটি বিশেষ কমিটির উপর। ‘কিস্টি’ ছিলেন বিজ্ঞান-কর্ম-নিপাত। কিস্টি বললেন, প্রথমে একটি নমুনা বোমা ফাটান। সাতই সে সেই বোমা ফাটানো হল—পরমাণু বোমা নয়, একশ-টন ওজনের ডিনামাইট ভূপ। তার বিস্ফোরণের নিম্নিত হিসাব করা হল। এবার ‘জেরো জেরো’ কতদূরে কে থাকবেন হির করা হল। পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা হিসাব-মতো হবে ৫০০০ টন টি-এন-টি-র সমান। অর্থাৎ ৫০ গুণ সব কিছু বাড়ানো হল। নমুনা-বোমার যে সাতটি এক কি-মি-দূরত্বে নিরাপদ মনে হয়েছে তাকে পরমাণু-বোমার ক্ষেত্রে ৫০ কি-মি-দূরে বসাতে হবে।

নির্ধারিত দিনের প্রায় আড়াই শতজন বৈজ্ঞানিক সমবেত হলেন ‘ট্রিনিটি-টেস্ট’ দেখতে। দুর্ভাগ্যক্রমে বৃষ্টি শুরু হল। আবহাওয়াবিদরা বললেন, রাত দুটোর পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। আউন্ট-জিরো থেকে দশহাজার গজ দূরে (অর্থাৎ আট কিলোমিটারের বেশি) তিনটি অবজারবেশন পোস্ট তৈরী হয়েছে। বিশেষভাবে নির্মিত ভূগর্ভস্থ গুহায়। এখানে কয়েকটি যন্ত্রের মাধ্যমে ফেড করা হবে বিস্ফোরণের ফলাফল। বেস-ক্যাম্পের দূরত্ব ফোল কিলোমিটার। সেখানে ফাঁকায় ঝাঁড়ানো—না ঝাঁড়ানো নয়, শোওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ঐ দশ হাজার গজ দূর থেকে লোভাম টিপে রেডিও-র মাধ্যমে বোমাটাকে ফাটানো হবে। তাই বলে অত দামী জিনিসটাকে তো বিনা রক্ষকে ফেলে রাখা যায় না। তাই হির হয়েছে দু-জন মেশিনগানধারীসহ দুঃসাহসী কিস্টিয়াকৌন্সি ঐ বোমার কাছে পাহারা দেন পাঁচটা পূর্বাহ্ন। এজিন-চালু অবস্থায় একটা জীপ বাড়ি থাকবে। ঠিক পাঁচটার ভরা কক্ষখাসে জীপে করে পালাবেন। কিস্টি পাকা ড্রাইভার। আধখটায় অনায়াসেই পৌঁছে যাবেন বোলো কিলোমিটার দূরের নিরাপদ বেস ক্যাম্পে।

কে যেন বলল, কিছু ধরন জীপটা যদি যান্ত্রিক গুণগোলে অচল হয়ে পড়ে?

গ্রোভস্ বললেন, সে কথাও ভেবেছি আমি। তাই তো কিস্টিকে পছন্দ করলাম। ও ভাল পৌঁড়ায়। কলেজ স্পোর্টস-এ প্রাইজ পেয়েছে। এবার আইজটা তো বড় সামান্য নয়—ওর গ্রাশ—কিস্টি আধখটায় নিরাপদ দূরত্বে যাবেই।

ওপেনহাইমারকে দশ হাজার গজ দূরত্বে ভূগর্ভস্থ কক্ষে রেখে গ্রোভস্ চলে গেলেন বেস ক্যাম্পে। অনেকেই আছেন সেখানে। প্রত্যেককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—গপনা শুরু হতেই মাটিতে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। চাও বোমার দিকে, মাথা উঠেটানিক। কানে তুলো। চোখ বন্ধ। তার উপর হাত চাপা দিতে হবে। আলোর কলকলি চুকে যন্ত্রের পর ওদিকে তাকাতে পার—তবে খালি চোখে নয়, বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো গগলস্ পরে। প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে সেই চশমা।

যেকোনো স্তম্ভিত শুরু করল ৫-১০ মিনিট লৈকে। প্রথমে পাঁচ-মিনিটের ভ্রমতে, পরে প্রতি মিনিটে। পাঁচটা উনত্রিশ মিনিটের পর প্রতি সেকেন্ডে।

পাঁচটা উনত্রিশেও কিছু জীপটা এসে পৌঁছল না। জীপটিনার ছটফট করছে সবাই। স্যাম্ অ্যালিসন নির্বিকারভাবে সেকেন্ডে ঘোষণা করল চলেছে—উনত্রিশ—আটত্রিশ—সাতত্রিশ।

মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড বাকি থাকতে জীপটা এসে থামল। পড়ি-তো-মরি করে তিনজনে চুকে পড়লেন ভূগর্ভস্থ নিরাপদ কক্ষে।

নয়—আট—সাত—

সবাই উবুড় হক্কে শুয়ে আছেন চোখ-কান বন্ধ করে।

একটিমাত্র ব্যতিক্রম। একজন এ আদেশ মানেননি। সজ্ঞানে। সাত সেকেন্ড বাকি থাকতে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন তিনি। বলে ওঠেন: দুস্তোর! দশ মাইল দূরত্বে এখানে ঘোড়ার ডিম হবে।

নোবেল লরিগেট লরেল শুয়ে ঠিক পাশেই। কানে তুলো গোঁজা, তবু শুনেতে শেলেন তিনি কথটা।  
কে এমনভাবে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বুকেতে পারলেন না। দুখ তুলতেও সাহস হল না—  
: চার... তিন... দুই...

চীৎকার করে ওঠেন আর্নেস্ট লরেল, শুয়ে পড়। মরবে তুমি!  
লোকটাও চীৎকার করে উঠে: কী বকছেন স্যার পাখলের মত!  
তৎক্ষণাৎ চিনতে পারেন লরেল। কিছু জবাব দেবার সময় ছিল না। ঘোমক বললে, নাউ।  
ট্রিনিটি-টেস্ট-এ যারা উপস্থিত ছিলেন তারা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা পরে সাংবাদিকদের  
থানিয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক ছাড়া একজন মাত্র সাংবাদিককে এ পরীক্ষার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।  
তিনি নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর উইলিয়াম লরেল। সকল বর্ণনাই এক সূত্রে বাধা। সুপারলেনটিভের  
ছড়াছড়ি। সেটাই স্বাভাবিক। অভিধান হাতড়ে কেউ উপযুক্ত বিশেষণ খুঁজে পাননি।

ফাইনম্যানের কথা বলি। একমাত্র তিনিই সোজা দাঁড়িয়ে ওলিকে চোখ বুজে তাকিয়েছিলেন।  
অভিজ্ঞতাটা উনি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যুগুত্রে সব সাদা হয়ে গেল। যেন অজ্ঞত সূর্য একসঙ্গে  
আকাশে উঠেছে। চোখ কলসে গেল। চোখে ও মাথায় যন্ত্রণা বোধ হল। আমার চোখ বন্ধ ছিল, গলস্  
এর নিচে। তাতেই ঐ অনুভূতি হল আমার। পরমুহুর্তেই যন্ত্রণা সত্ত্বেও আমি চোখ খুললাম। সাদা  
আলোটা ততক্ষণে হলুদ হয়ে গেছে। প্রকাত একটা দীর্ঘঘোর বলয় পাক বেতে বেতে উপরে উঠে  
যাচ্ছে। দীর্ঘঘোর ঐ কুণ্ডলির উপরে কমলা রঙের আর একটা আশ্রয়ের বলয়—তার কিনারগুলো সিমুতে  
লাল। উপরে, উপরে, আরো উপরে উঠে গেল। অনাবিষ্কৃত একটা নয়া সত্য প্রকাশিত হল যেন।  
পারমাণবিক বন্ধনযুক্ত মহানুভূত। অপরূপ দৃশ্য। তারপর অস্বাভাবিক একটা নিস্তব্ধতা। আমাদের বেস্  
ক্যাম্পের কেউ কোন কথা বলেনি। পুরো সেড মিনিটি। তারপর এল বিস্ফোরণের শব্দটি।

সেড মিনিটি পরে। লরেল এতটা আশ্চর্য হয়ে পড়েছিলেন যে, হঠাৎ বলে ওঠেন, ওটা কিসের  
শব্দ?

যেন এত বড় একটা বিস্ফোরণের পরে কোন শব্দই হবে না।  
ওপেনহাইমার দশ হাজার গজ দূরের 'এম'-পয়েন্টে। মন্ত্রমুগ্ধের মত তিনি নাকি বলে উঠেন:  
"নভেম্পশ্যাং দীপ্তমদেনেকবর্ণা ব্যাতাননাং দীপ্তবিশালসেত্রম।  
দৃষ্টা হি হ্যাং প্রবাবিতান্তরাহ্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিজ্ঞো।"  
—ইস নাট ঝীক প্রফেসর?—প্রশ্ন করেন জেমস ছাঙ্ক।  
—সো স্যার! ইটস্ স্যান্ডুটি।—জবাব দিলেন ওপেনহাইমার।  
—কী অর্থ কবিতাটার?

—হে পরমপিতা! আপনার আকাশম্পর্শী তেজোময় নানাবর্ণযুক্ত ঐ বিস্তারিত দুঃখমণ্ডল এবং  
উজ্জ্বল চোখের নিকে তাকিয়ে আমার হৃদয় আজ ব্যথিত। আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছি, আমি 'শমং'  
অর্থাৎ শান্তি হারিয়ে ফেলেছি।

অধ্যাপক ছাঙ্ক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আশ্চর্য কবিতা। ঐ কথাটাই ঠিক মনে হচ্ছিল  
আমার। জার্মান ভাষায় অবশ্য। এ বিস্ফোরণে একটা জিনিস হারিয়ে গেল শুধু— সেটা শান্তি। আমার  
হৃদয়ও আজ ব্যথিত।

গোতস্ অনতিবিলম্বে একটি টেলিগ্রাফ করেন পটসডামে, যুদ্ধসচিব স্টিমসনকে—  
"সম্মান নির্বিঘ্নে জন্মলাভ করেছে। স্বাস্থ্যবান শিশু। সে হাইহোল্ডে\* থাকলেও এখানে বসে তাকে  
সেবতে পেতাম। তার ডিভানি এখান থেকে আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাবে।"  
টেলিগ্রাফটা পাঠানো হল পটসডামে। জার্মানীতে। যুদ্ধসচিব তখন সেখানে। শুধু তিনি একা নন।  
হারী টুমানও। ঐ পটসডামে।  
পটসডাম।

\*হাইহোল্ডে স্টিমসনের বাড়ি। গোতসের অফিস থেকে তার দূরত্ব কত তা টেলিগ্রাফ ক্লার্ক না  
বুঝলেও স্টিমসন বুঝলেন।

নাথানিয়ালসের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতি করে দেখলেন: পটসডাম কোথায়? কীজন্য বিখ্যাত?  
পতকরা নিয়ানকই জন ছাত্র লিখবে নিকুল উত্তর—'বার্লিন শহরের দক্ষিণপশ্চিম শহরতলী।  
বার্লিনের পতনের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে এখানে বিজয়ী মিত্রপক্ষের শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল। এখান  
থেকেই জাপান-এ নতজানু হবার আদেশ প্রচলিত হয়।'  
পতকরা একজন হয়তো ভুল উত্তর লিখে বসবে। খোঁজ নিয়ে দেখবেন, বেচারি ফিজিক্স কিংবা  
ম্যাথসের। ভুল উত্তর লেখার নিন্দায় তাকে আপনি নব্বর দেখেন না। রোকাটা লিখেছে: পটসডামে  
আলবটো আইনস্টাইনে বাড়ি। বিতাড়িত হবার পূর্ব পর্যন্ত জীবনের পঞ্চাশটা বছর তিনি ওখানে  
কাটিয়েছেন।

স্থান-কাল-পাত্র! একে অপরের উপর নির্ভরশীল। স্থানটাকে আপাতত ধুক বলে ধরে  
মিন—দেখবেন, পরে কাল এর সঙ্গে ভাল রেখে চলছে। ধুকন কালটা এ শতাব্দীর দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়  
দশক। দেখবেন, পটসডামের বাস্তব সারি সারি পশ্চিম গাছের তলা দিয়ে হাতুয়ে প্রান্তর্ভ্রমণে বার  
হয়েছেন একজন শ্রৌত। সারা শহরতলী তখনও ঘুমাচ্ছে, ঘুমাশার ঘোর ভেদ করে পূবআকাশ থেকে  
সোনালী হাতছানি এসে পড়েছে স্বল্পরাত শ্রৌত মানুষটার কালা ওভারকোটের। ঠর এক হাতে ছড়ি,  
অপরহাতে ধরা আছে কুকুরের চেন। মুখে মোটা চুটুট। সারা শহরতলী ঘুমাচ্ছে, শুধু কৌতূহলী একটা  
দেয়ার কুতলী ছুটুয়ে তার পিছনে পিছনে—ওরই চুকটের ধোয়া। অনুগামী ধুমকুণ্ডলী আর অগ্রগামী  
কুকুর, হাতছানে চলছেন আইনস্টাইন। শুধু ঐ কুকুরটাই নয়, শ্রৌত বৈজ্ঞানিককে পিছনে ফেলে  
খোঁপে-খোঁপে ছুটুয়ে আরও একটা জিনিস। সেটা ঐ বৈজ্ঞানিকের চিন্তাবারা। শুধু বৈজ্ঞানিককেই নয়,  
বিশ্বকেই যেন কয়েক দশক পিছনে ফেলে যেতে চায় সেটা।

বলতে দিন 'কাল'টাকে। এগিয়ে আসুন দশক দুটেক। আমাদের এ কাহিনীর বর্তমান পটভূমিতে।  
1945 সালের যোলই জুলাই। ট্রিনিটি-টেস্টের ঐ চিহ্নিত মিনে। দেখবেন পাশের বসলে গেছে।  
পরিবেশটাও। সেই মীলআকাশ-সম্মানী পশ্চিমবঙলি উদ্বলীত। শহরতলী ঘুমাচ্ছে না—সেটা স্বপ্নান।  
পৃথক হাতে হাতে আর কারেনশান-ডায়ালস্-হলিহক নেই, কণ্ঠিটের ঢাক—ইটের খুপ আর  
মিলিটারী ডিসপোজালের শূন্যগর্ভ ক্যান। এবার পাশের হাঙ্গেন—বিজ্ঞানদলী তিন যুদ্ধবাজ—চার্লিস,  
টুমান আর জালিন।

যুদ্ধের তির্যক তিন প্রধান একাধিক বার মিলিত হয়েছিলেন। কুইকক-এ, তেহেরান-এ এবং  
ইয়ালটাড। টুমান অবশ্য ঐ প্রথম যোগ দিচ্ছেন শীর্ষ সম্মেলনে, ইতিপূর্বে এসেছিলেন ক্রজভেন্ট।  
শেষ শীর্ষ সম্মেলনের জন্য চিহ্নিত হয়েছিল পরাজিত বার্লিন শহর। দুর্ভাগ্যবশত বার্লিনে এমন একখানা  
বড় বাড়ি নজর পড়ল না, যেখানে এত বড় সম্মেলন হতে পারে। সমস্ত শহর তখন ধ্বংসযজ্ঞ। তাই  
শহরপ্রান্তে ক্রজভেন্ট-গ্রিন উইলহেল্ম-এর আবাসে আবৃত্ত হল ঐ মহাসম্মেলন। যোলই জুলাই প্রথম  
অধিবেশন করার কথা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, জালিন সময়মত এসে পৌঁছাতে পারলেন না। কী করা যায়?  
সমস্ত কলিতে প্রেসিডেন্ট টুমান বলেন বার্লিন শহর সেবতে। অর্থাৎ বার্লিনের ধ্বংসকূপ সেবতে।  
সঙ্গে ঠার সাঙ্গোপাঙ্গ। যুদ্ধসচিব স্টিমসন, সেক্রেটারি অফ স্টেট, নৌবিভাগের অ্যাডমিরাল সেই  
প্রকৃতি। এ কাহিনীর পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে সেই ধ্বংসকূপ পরিমার্জনের বর্ণনা বাছল্য মনে হতে পারে,  
কিন্তু বোকবরি এরও প্রয়োজন আছে। পরবশু-বোমা ফেলবার চূড়ান্ত আদেশ যিনি দিয়েছিলেন, সেই  
মনুবাটকে ঠিকমত চিনে নিতে হলে এটাও উপেক্ষা নয়।

প্রেসিডেন্ট ঠার স্মৃতিভরণে বলেছেন, "একটা বাড়িও নজর পড়ল না যেটা অনাহত। সবকিছু  
কর্তৃত্বময়। হয় ধ্বংসকূপ, না হলে হাড়-পাঁজরা বার করে দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসের মত। আমাদের গাড়ির  
কার্যাবলি দিয়ে খামল হাইকস্ চ্যাকলারির সামনে। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। সেই ঝোলা বারান্দার চিমুমা  
নেই—বেড়ির উপর দাঁড়িয়ে হিটলার তার অনুগামী নাসী যুদ্ধবাজদের সামনে বক্তৃতা দিত।"  
টুমান তো আর সেই ফিজিক্স অথবা ম্যাথসের ছাত্রটি নন—তাই খোঁজ করে দেখতে  
চাননি—আইনস্টাইনের বাড়িটা মুখ ঘুরড়ে পড়েছে অথবা 'হাড়-পাঁজরা বার করে দাঁড়িয়ে আছে'।

সম্প্রকাশিনীর উপসংহারে টুমান লিখেছেন—  
"It is a demonstration of what can happen when a man over-reaches"



himself...I never saw such destruction. I don't know whether they learned anything from it or not."

অর্থাৎ 'মানুষ তার কর্মতার ব্যতীরে হাত বাড়ালে কী পায় তারই অনিশ্চয়তা'। আমি এমন কবলে পড়ি কখনো দেখিনি। জাতি না, ভাষা এ থেকে আদৌ কোন শিক্ষা পেল কিনা।

ইতিহাস এর জবাব দিয়েছে। 'ওরা' কোন শিক্ষা পায় আর না পায়, প্রেসিডেন্ট টুয়ান যে কোন শিক্ষাই পাননি তার প্রমাণ হিরোসিমা এবং নাগাসাকি।

When a man over-reaches himself...

পরদিন সন্ধ্যায় জুলাই সকালে মার্কিন যুদ্ধসচিব এসে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী চার্লিসের সঙ্গে। বাড়িয়ে দিলেন একটি টেলিগ্রাম। তাতে লেখা— সন্তান নির্বিঘ্নে জয়লাভ করেছে।

চার্লিস আনন্দে আত্মহারা। তখনই দেখা করলেন টুয়ানের সঙ্গে। পরামর্শ নিলেন—এ কথা জাটিনকে যথাশক্তি জানাবার প্রয়োজন নেই। তুরস্কের টেকা সূত্রিয়ে রাবটাই বুঝিয়ে দেবে। শুধু দেখতে হবে, রাশিয়া যেন এই শেষ মওকায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে বসে। তারলেই তাকে লুটের ভাগ দিতে হবে। জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার বর্তমানে অন্যক্রমশাস্ত্র চুক্তি বজায় আছে। তাই থাক। জাটিন যেন আটম-বোমার কথা জানতে না পারে। টুয়ানের এটা ঠিক পদক্ষেপ হল না। চার্লিস তার সঙ্গে একমত হলেন না। ঐদিনই পটসডামে এসে উপস্থিত হলেন ইউরোপ-খণ্ডে মিলিত মিত্র বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল আইসেনহাওয়ার। আটম-বোমার বিষয়ে বিস্তারিত তিনি জানতেন না। সব কথা শুনে তিনি নাকি বলেছিলেন আশা করি এমন অস্ত্র আমাদের ব্যবহার করতে হবে না।

অথচ ঐদিনই টুয়ান তার দিনপঞ্জিকায় লেখেন—

'I then agreed to the use of the A-bomb if Japan did not yield.'

—অর্থাৎ সেই দিনেই ঠিক করলাম জাপান আত্মসমর্পণ না করলে আমি পরমাণু-বোমা ব্যবহার করব।

অবশেষে জাটিন এসে সৌহার্দ্যে পটসডাম-এ। শুক হল ঐতিহাসিক অধিবেশন। তিন রাষ্ট্রের প্রধান, তাঁদের দুরূহ রাজনৈতিক সহকর্মী আর দোষাধীরা হল। বুঝার উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রাসাদ গমগম করছে। যুদ্ধকালে এটা হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। যুদ্ধান্তে হাসপাতাল সাফ করে এই সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়েছে। হাসপাতাল ছিল নাথী জার্মানীর। জার্মানরা রাজধানীর ভিতর একটি ফুলের বাগান বানিয়েছিল। এত বোমা-বর্ষণেও ফুলগাছ নিঃশব্দিত হানি। হল এই অনুষ্ঠানে। ফুলগুলো তুলে এনে ওরা বিজয়-উৎসবের তোড়া বাঁধল। 'হল'—এক কেসডানে রাখা ছিল এক হাজার জেরেনিয়াম ফুলের প্রকাণ্ড একটা 'ব্রেডস্টার'—জাটিনকে স্মরণীয় জানাতে।

এক সপ্তাহ ধরে চলল অধিবেশন। পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হল। মিসিসাইন, ভারতবর্ষ, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, জার্মানীর ভবিষ্যৎ সিঁচিবে হল। জাটিন বললেন, ইতিপূর্বে তিনি বলেছেন—জার্মানির শত্রুদের তিন মাসের মধ্যেই তিনি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। তিনমাস প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে। এখন সময় হয়েছে নিকট, অনুমতি পেলেই তিনি জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘিঁড়তে প্রস্তুত। চার্লিস ভাব দেখাচ্ছেন, তুমি আর কেন মিছে কষ্ট করবে ভাই? আমরা দুজনেই ব্যাপারটা ম্যানেজ করে নেব।

সম্মেলন শেষ হয়ে এস প্রায়। টুয়ান প্রতিদিনই জাটিনকে হারামজ্বল স্বাবাসটি জানাবেন মনে করেন, অথচ হয়ে ওঠে না। চার্লিস এর যোরতর বিরোধী। হয়তো তাই ইতস্তত করছিলেন।

উনিশে জুলাই প্রেসিডেন্ট টুয়ান সকলকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করলেন। বিরাট আয়োজন। খান খান পানার অচল ব্যবস্থা। ডিনারের সময় পিয়ানো বাজাল মার্কিন বাহিনীর সার্জেন্ট ইউজিন লিস্ট। ভাল পিয়ানোর হাত ছিল ছোকার। বাজালো 'এ মাইনর', ওপাসে 42-এ শপ্ট্যার এককাল বিখ্যাত ওয়ালটজ। চমককার বাজালো। সঙ্গীত শেষ হতেই মহান নেতা জাটিন প্রস্তাব করলেন, সঙ্গীতজ্ঞের সম্মানে ওরা তিন নেতা একটি 'ট্রাস্ট' দেবেন। তৎক্ষণাৎ তিন নেতা মদের পাত্র হাতে এগিয়ে এলেন মার্চ করে। সার্জেন্ট লিস্ট-এর নাকের ডগায় এসে পানপাত্র তুলে ধরে তার স্বাস্থ্য পান করলেন। আডমিরাল লেহী তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন—উৎসব শেষে সার্জেন্ট লিস্ট ঠকে গলে, স্নায়ু, যুদ্ধের

সময় অনেকবার বৃত্তর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। কিন্তু এমন আতঙ্কগ্রস্ত আমি জীবনে হইনি। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি জাটিন-চার্লিস আর আমাদের প্রেসিডেন্ট মার্চ করে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন।

তার দুদিন পরে একুশে জুলাই ডিনার 'প্রো' কললেন কমরেড জাটিন। টুয়ান সাহেবের উপর টেকা বাড়লেন তিনি। আগেকার ভোজের থেকে পাঁচ কোর্স বেশি খাবার এল। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে তার নির্দেশে একটি জরী বিমানে মস্তো থেকে এসে উপস্থিত হল শ্রেষ্ঠ পিয়ানোবাদকের মল। আগের দিন কনসার্ট মিউজিক রাত একটায়—এবার রাত দেড়টা পর্যন্ত চলল সঙ্গীতের আসর। আশ ঘটা বেশি। চার্লিস মশাই নাকি গান ভালবাসেন না—না, শেফালীর পড়ে কোন অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে এটা আমি অনুমান করছি না। তিনি নিজেই তা লিখেছেন:

I was bored to tears. I don't like music. I wanted to go home.

চার্লিস-নাহেব নাকি গানের মাধুর্যেই উঠে চলে যেতে চেয়েছিলেন। টুয়ান তাঁকে আটকে রাখেন, বলেন এটা খরাপ দেখাবে।

তার দুদিন পরে চরম প্রতিশোধ নিলেন সিংহশিঙ চার্লিস। এবার তিনি হলেন নিমন্ত্রণকর্তা। লন্ডন থেকে এল কয়াল-এয়ারফোর্সের পিয়ানো-বাদকের মল। আডমিরাল লেহী লিখেছেন, 'গান যেমনই হ'ক, চার্লিস-সাহেবের কাঁচা চুকুম ছিল। রাত দুটোর আগে যেন গান-বাজনার-আসর না ভাঙা হয়। সিংহশিঙেই টুয়ান-সাহেবের উপর পাইপমুখো জাটিন মেয়েছিলেন টেকা। কিন্তু পিঠ তুলতে পারলেন না তিনি—চুকটমুখো চার্লিস এবার বাড়লেন ছোট্ট একখানি দুরি। তুরস্কের।

এদিকে টুয়ানের অবস্থা সেই 'ভবন-হাজারের মত। পেট ফুলছে ক্রমাগত। ফুলবেই। চার্লিসকে বললেন, চার্লিস বাজল করছেন জাটিনকে জানাতে—কিন্তু সামরিক শক্তি হিসাবে ব্রিটেনের চেয়ে রাশিয়ার স্থান অনেক উচুতে। তাই এবড় খবরটা জাটিনকে না বলা পর্যন্ত ঘুম হামিল না টুয়ানের। তাতে চার্লিস চটে যায় তো থাক। কে জানে—এই নিয়ে যদি যুদ্ধোত্তর-দুনিয়ার জাটিনের সঙ্গে তার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়ে যায়। তখন তো চার্লিস পাঁচিলের উপর বসে মিটিমিটি হাসবে—এতবড় দাঁড়িত নিতে সাহস হল না টুয়ানের। ছির করলেন, খবরটা জানাবেন—তবে কায়দা করে। অর্থাৎ সময়, পরিবেশ আর ভাষার জেতর থাকবে ওস্তাদী শ্যাচ। 'ধরি মাছ না টুই পানি' তস্বিতে।

পরদিন চবিশে জুলাই—অর্থাৎ হিরোসিমায় বোমাবর্ষণের মাত্র তেরদিন আগে—সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষিত হবার পর সবাই যখন একে একে চলে যাচ্ছেন তখন টুয়ান গুটিগুটি এগিয়ে এলেন জাটিনের কাছে। যেন মামুলি খোশ-খবর বলছেন, এমন ভঙ্গিতে বললেন, 'ভাল কথা মনে পড়ল—ইয়ে হয়েছে—শুনবেই আমার বিজ্ঞানীরা নাকি একটা মারণাস্ত্র বার করেছেন যার অখ্যাতবিক বিস্ফোরণ শক্তি—'।

এক নিম্নাসে কথাকটা বলে টুয়ান হাসিহাসি মুখ করলেন। চার্লিস দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশেই। উর্ধ্বমুখে চুকটের দোতা ছাড়ছিলেন নির্বিকারভাবে। যেন খবরটা নেহাৎই মামুলি। জাটিন বিলুপ্ত ঐশ্বর্য দেখালেন না। বললেন তাই নাকি? খুব আনন্দের কথা। ওটা ঐ ঐকিঙ্ক জাপানীদের মাথায় ঝাড়ুন তাহলে।

চাখাটা আমি বানিয়েছি। হয়তো ঠিক এ ভাষায় কথোপকথন হয়নি। এই ঐতিহাসিক আলাপচারীর কোন 'ভাইরেই' স্পীচ অফ ন্যারেশন' অনেক খুঁজতে পাইনি। যা পেয়েছি তা এই—

টুয়ান তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

"On July 24 I casually mentioned to Stalin that we had a new weapon of unusual destructive force. The Russian Premier showed no special interest. All he said was that, he was glad to hear it and hoped we would make 'good use of it against the Japanese'."

জাটিন গাড়িতে উঠে ওগন দেওয়া মাত্র চার্লিস বললেন, মহান নেতা-সাহেব কী বললেন? —কিছুই তো বললেন না। জানতেও চাইলেন না কী জাতের বিস্ফোরক।

চার্লিস তার স্মৃতিচারণে গ্রহে বিশ্বপ্রকাশ করে লিখেছেন:

"Nothing would have been easier than for him to say: Thank you so much for



telling me about your new bomb. I, of course, have no technical knowledge. May I send my experts in these nuclear sciences to see your experts tomorrow morning?"

"জালিন সহজেই বলতে পারতেন, এই বোমার কথা জানানোর জন্য ধন্যবাদ। আমি অবশ্য বিজ্ঞানের ব্যাপার ভাল বুঝি না। কাল বরং আমার পরমাণু-বিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞানীদের আপনার বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠিয়ে দিই, কী বলেন?"

চার্লিস তিনটি ভুল করেছেন। প্রথমত টুয়ান 'বোমা' শব্দটা আসৌ ব্যাবহার করেননি, বলেছিলেন 'মারণাশ্র'। দ্বিতীয়ত, 'পারমাণবিক' শব্দটাও উচ্চারণ করেননি টুয়ান—ফলে 'নিউক্লিয়ার' পদার্থ বিজ্ঞানীদের প্রসঙ্গই ওঠে না। তৃতীয়ত, চার্লিস জানতেন না জালিনের এ উদাসিনের মূল কারণ কী। জালিন ন্যাকা সেজেছিলেন মাত্র। তিনি জানতেন সবই, এবং এত জানতেন যে, এই পারমাণবিক অস্ত্রের যাবতীয় সংবাদ তাঁর গুপ্তবাহিনী সংগ্রহ করে যাচ্ছে। যথাসময়ে তার সবকটি খুঁটিনাটি জানতে পারবেন উনি।

সেখানে সেখানে কোলাকুলির সময় এমনই হয়ে থাকে। কোন সেয়ান কোন সেয়ানকে বেশি মারছে কোন সেয়ানই ত্রুটি বুঝতে পারে না। সবাই ভাবে আমি বুঝি জিতলাম। দেখি যে আসলে মারছেন মহাননেতা জালিন তা টুয়ান টের পেলেন বেশ কিছুদিন পরে—ম্যাকেরি কিং-এর পর পেয়ে।

এমনিই টুয়ান এবং সিটসনের কাছ থেকে এসে উপস্থিত হলেন মার্কিন স্থলবাহিনীর প্রধান, জেনারেল মার্শাল এবং বিমানবাহিনীর চীফ জেনারেল আর্নস্ট। তারা জানতে চাইলেন—পারমাণবিক বোমা আসৌ ফেলা হবে কি না,—হলে কবে হবে এবং কোথায় ফেলা হবে।

প্রথম দুটি প্রশ্নের জবাব পেলেন সহজেই: বোমা ফেলা হবে এবং যতশীঘ্র সম্ভব।

তৃতীয় প্রশ্নটির বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা হল। প্রথমে স্থির হয়েছিল এই পাঁচটি শহরের মধ্যে যে কোনও একটিতে ফেলা হবে সেই বিপরীত বোমা—হিরোসিমা, ককুরা, নীগাতা, নাগাসাকি অথবা কিয়োটো। সিটসনের অনুরোধে শেষ নামটা বাতিল করা হল। ওখানে নাকি আছে প্রাচীনতম বৌদ্ধমন্দির—বহু শতাব্দীর স্মৃতিবিজড়িত স্বর্ণমন্দির।

একটিমাত্র পারমাণবিক বোমায় কতটা ক্রটি হতে পারে সেটা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে অনেক আগে থেকেই নির্দেশ জারি করা হয়েছিল—এ পাঁচটি শহরে আসৌ কোন সাধারণ বোমা বর্ষণ করা হবে না। এই পাঁচটি শহরবাসী তাদের দুর্লভ সৌভাগ্যে এতদিন উৎকৃষ্ট ছিল। তাঁদের ধারণা—এটা নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা। তারা জানত না যে, তারা একমুহুরে নসিহকোপ্যাকের জিয়ানো কই মাহ!



॥ ভের ॥

ছায়াশে জুলাই পটসড্যাম থেকে ঘোষিত হল তিন বিশ্ববিজয়ীর শেষ চরমপত্র: অবিলম্বে জাপান যদি আত্মসমর্পণ না করে তবে তার চরম সর্বনাশ অনিবার্য।

তারপর যা ঘটেছে তা সর্বজনবিস্তৃত ইতিহাস। বাস্তবশক্তি জালিন জার্মানিতে এসে পটসড্যামে মিলিত হবার আগেই জাপান রাশিয়ার কাছে প্রত্যাব পায়িরেছিল—সে নাকি আত্মসমর্পণ করতে চায়। রাশিয়া যেন মধ্যস্থতা করে। জালিন জাপানকে সে সুযোগ সেননি। সে ইতিহাস আমি বিস্তারিত বলেছি আমার 'জাপান থেকে ফেরা' গল্পে। পুনরুজ্জীবন নির্যাসোজন। মেরিকনা জাপানের জবাব কী হবে তা ধরে নিয়েই যাবতীয় ব্যবস্থা বাড়ির কীটা ধরে করা হচ্ছিল। হোকুস্-এর ভাব্যত কোটি কোটি ভল্যর ব্যয় করে আমরা কী বানালাম তা পাচজনকে না সেখানে কৈফিয়ৎ দেব কী? অন্যত্র—

'No need to get so excited! It's better for a few thousand Japs to perish than a single of our boys.'

: অতটা উত্তেজিত হবার কী আছে? আমাদের একটা ছোকরার প্রাণ রক্ষা করতে কয়েক হাজার জাপানীকে প্রয়োজন হলে প্রাণ দিতে হবে বৈকি।

এসব যুক্তি আপনারা শুনছেন। খবরের কাগজে পড়েছেন। বোধকরি শোনেননি তার জবাবটা।

ক্রীস্টান পানরী শীল ওর প্রত্যুত্তরে যে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

'ত্রিক এই মুক্টিই একদিন সেবিবেছিলেন হিটলার—হল্যান্ডে বোমাবর্ষণের আগে, অথবা ইটালী নিকনজঙ্কপালে।'

সে যাই হোক, বাড়ির কীটা টিক টিক করে এগিয়ে চলেছে। জাপান জানে না, পৃথিবী জানে না সে কখন। প্রশান্ত মহাসাগরের এক অদ্ভুত বীশে একটি ব্রহ্মার গ্রহর গুপে চলেছে। টাইম-বন্দ। কোন দুর্ঘটনা না হলে সে বোমা ফাটবেই।

দুর্ঘটনা ঘটেছিল। একটা নয়—খুঁটুটো। তবু হিরোসিমা মুক্তি পেল না। প্রথম দুর্ঘটনা—ইন্ডিয়ানাপোলিস। বৃদ্ধ-জাহাজ জাপানী সাবমেরিনে সজিগসমাধি লাভ করল। এই জাহাজেই পাতানো-হয়েছিল পরমাণু বোমাটিকে, আমেরিকার কোন বন্দর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের নির্দিষ্ট দ্বীপপুঞ্জে। জাহাজের ক্যাপ্টেনও জানতো না, কী মহামূল্য সম্পদ সে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নৌবাহিনীর চিরাচরিত রীতি লঙ্ঘন করে তাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাতে সে স্বীকৃত হয়ে গেছে। ডেক-এর উপর এই যে বিভিন্ন বস্তুটি রাখা আছে এটাকে বাচাতে হবে—প্রয়োজনবোধে আর্কাষ্টেন জাহাজের সমুদ্র নাবিকের জীবনের বিনিময়েও। জাহাজ ডুবে গেলেও ওটা সমুদ্রে ভাসবে এমন ব্যবস্থা করা আছে। ইন্ডিয়ানাপোলিস এই অভিযান থেকে ফিরে আসেনি নিরাপদ বন্দরে—জাপানী সাবমেরিনে সেটা ডুবে যায়—কিন্তু নিরাপদে এই অজানা বস্তুটি প্রশান্ত মহাসাগরের নির্দিষ্ট বন্দরে নামিয়ে ফিরে আসার পথে। দ্বিতীয় দুর্ঘটনা রাজনৈতিক। চৌঠা জুলাই গ্রেট ব্রিটেনে গণভোট হয়। পটসড্যামে যখন মহাসম্মেলন চলেছে তখন ব্রিটেনে ভোটের গুন্টি হচ্ছে। চার্লিস নিশ্চিত ছিলেন সাম্রাজ্যের বিষয়ে—এত বড় বিশ্বযুদ্ধে তিনি বিজয়ী। তবু ফলাফল ঘোষিত হবার পূর্বমুহুর্তে তিনি ফিরে এলেন স্বদেশে। ছায়াশে জুলাই মধ্যরাত্রে ঘোষিত হল পটসড্যামের শেষ হুকুম, আর এই দিনই শেষ রাত্রে তার হল নির্বাচনের ফলাফল। চার্লিস হেরে গেলেন। নিকাল চারটার সময় চার্লিস এলেন ব্যক্তিগত প্যালেসে। পদত্যাগপত্র দাখিল করতে। এতবড় আঘাত আর অপমান তিনি কখনই করেননি। বেরিয়ে যাওয়ার মুখে সাংবাদিকদের গুপু বলেছিলেন—'আমি দুর্ভাগ্য, হুজুটা চূড়ান্তভাবে শেষ করার সুযোগ আমাকে দেনবাসী দিল না। তবে জাপানের পতন আসন্ন। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারা যত তাড়াতাড়ি ভাবছেন, তার আগেই। তার ব্যবস্থাও আমি করে এসেছি।'

হুজুই আগস্ট, বাড়ি দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তিনটি বিমান তখনা হল জাপানের দিকে। একটি বোমাক বিমান—নাম 'এনোলা গে'। তার গর্ভে একটি মাত্র বোমা। অকাত গোমো। তার পাইলট কর্ণেল টিবেট এবং বোমাক ক্যাপ্টেন পার্সন জানে কী বস্তুটি। আর কেউ তা জানে না। সকাল আটটা পনের মিনিটে রেডিওতে নির্দেশ এল—নির্বাচিত তিনটি শহরের সবগুলিতেই যদি আবহাওয়া খারাপ থাকে তবে বোমাবর্ষণ না করেই ফিরে এস।

পর পর তিনটি শহরের নাম মনে আছে পাইলটের: হিরোসিমা, ককুরা আর নীগাতা।

নটা বেজে পনের। বিমান তখন ৭৬৩২ মিটার উচুতে, গতিবেগ খণ্ডায় ৫২৫ কি. মি.। পিছনে পিছনে আসছে দুটি ফাইটার সেন।

দূরে দেখা গেল হিরোসিমা। ইতিপূর্বে বোমাবর্ষণ হয়নি সেখানে। শহরবাসী নিশ্চিন্ত।

পার্সন বোতামটা টিপল। বোমাটা বেরিয়ে যেতেই খানিকটা লাফিয়ে উঠল সেনটা। পরক্ষণেই সেনের মুখটা ঘুরিয়ে দিল টিবেট। ফুলশীত। পালাও — পালাও।

ইহাঃ অসম্ভাব্য আলো হয়ে উঠল সমস্ত জগৎ। পরমুহুর্তেই একটা হাজা খেল সেনটা। কয়েক সেকেন্ড পরে আবার একটা হাজা। প্রথমটা প্রাথমিক বিস্ফোরণের। বিস্ফোরণ হয়েছে মাটি থেকে দু-হাজার ফুট উপরে। দ্বিতীয়টা সেই বিস্ফোরণের প্রতিফল। পৃথিবীর বুকে আঘাত খেয়ে শব্দতরঙ্গের প্রতিধ্বনি। সেনটা তখন পনের মাইল দূরে।

পৃথিবীর বুকে থেকে মুখে গেছে একটা অনপদ। তার নাম হচ্ছে, হচ্ছে নয়, ছিল—হিরোসিমা।

পরদিন সাতই আগস্ট সকাল নয়টার সময় টোকিও শহরপ্রান্তে একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল একটা মিলিটারী জীপ। একজন মিলিটারি অফিসার এসে কড়া নাড়লেন দরজায়। কিমোনো-পরা এক বৃদ্ধ বার হয়ে এলেন: কী চাই?

—প্রফেসর নিশিনা, এখনই আমার সঙ্গে আসতে হবে। গতকাল থেকে আমরা হিরোসিমায় সঙ্গে কোন যোগাযোগ করতে পারছি না। না টেলিফোনে, না রেডিওতে। এইমাত্র গবর পেলাম সেখানে নাকি একটা—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা মাত্র বোমা পড়ছে। তাতে শহরটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আপনি এসে দেখুন।

প্রফেসর যোমিও নিশিনা হচ্ছেন জাপানের সবচেয়ে বড় নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। নীলস্ বোর-এর সঙ্গে কাজ করতেন। অটো হানের বন্ধু।

মুহূর্ত মধ্যে তৈরী হয়ে নিলেন নিশিনা।  
জীশে উঠতে যাবেন এক সাংবাদিক দৌড়ে এল। বললে, প্রফেসর, ওরা বলছে এটা পরমাণু-বোমা। এইমাত্র মার্কিন ব্রডকাস্ট শুনে এলাম। নির্জলা মিথ্যা প্রচার! কী বলেন?

—আমি তো এখনও কিছুই দেখিনি। যা শুনি তাতে মনে হয়— মিথ্যা নয়।  
যা দেখলেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন প্রফেসর নিশিনা। তবু মনোবল হারাননি। সমস্ত দিন অস্বাভাবিক বৃষ্টি প্রফেসর লবঙ্গাকৃষ্ট পরিদর্শন করলেন, মাপ-জোখ নিলেন—যেখানেই উপর বোমাটা ফেটে পড়েছিল সেখানে মাটি খুঁড়ে রেডিও-অ্যাকটিভিটির পরিমাণ নিরূপণ করলেন নিজের বিশদ যত্ন করে (চার মাস পরে তাঁর সেহে রেডিও-অ্যাকটিভিটির লক্ষণ দেখা যায় এবং দীর্ঘদিন তিনি নার্নিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন)। ফিরে এলেন যখন টোকিওতে, তখন উনি জানেন— তাশমারা কতটা উঠেছিল, কত উঠতে বোমাটা ফেটেছিল, বায়ুর গতি কতটা হয়েছে, কতটা টি-এন-টি-বোমার বিস্ফোরণের সমতুল্য এই দুর্ভাগ্য। পরে হিসাব করে দেখা গেছে প্রফেসর নিশিনার এই প্রাথমিক হিসাব নির্ভুল হিসাবের ৭৭ শতাংশ নির্ভুল।

টোকিওতে ফিরে এসেও রেহাই নেই। মিলিটারির লোকেরা বাড়ি যেতে নিল না ঠিকে। সোজা নিয়ে গেল সমরদপ্তরে।

একজন সাময়িক বড়কর্তা বললেন, প্রফেসর। কতদিন লাগবে এমন বোমা তৈরী করতে? মাসছয়েক পর্যন্ত আমরা গবর চেকিয়ে রাখতে পারি।

প্রফেসর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ছয় মাস কেন, ছয় বছর লাগা উচিত। আর আপনারা একটা কথা খেয়াল করছেন না—জাপানে ইউরেনিয়াম খালু আদৌ নেই।

—প্রফেসর। এই নতুন বিশদ থেকে উদ্ধারের কোনও পথই কি আপনি দেখাতে পারেন না?  
ক্রান্ত প্রফেসর বললেন, পারি। জাপান দুখণ্ডের উপর কোন মার্কিন বিমান এসে দৌছবার আগেই তাকে গুলি করে নাস্তে করে। সমুদ্রে।

এতক্ষণে নিশিনা ছুটি পেলেন। প্রায় মাতালের মত উল্টে উল্টে ফিরে এলেন সমরদপ্তর থেকে নিজ আবাসে। বাড়িতে ঢুকেই সেখান সেখানে অপেক্ষা করছেন দুজন সাময়িক অফিসার। ঠিকে সেখাই একজন লাফিয়ে ওঠেন। প্রফেসর! এখন আমার সঙ্গে একবার আসতে হবে। নাসানাকির সঙ্গে আমাদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোন সাজা দিচ্ছে না। না টেলিফোন, না রেডিওতে। কী হতে পারে বলুন তো?

পরমাণু-বোমার সাফল্যে মানহাটন-প্রজেক্টে যে অবিস্মৃত আনন্দের হিরোয়াল বয়ে গিয়েছিল এমন কথা বলতে পারি না। বজিলার্ড বলেছিলেন, ছয়ই আগস্ট তারিখটা আমার জীবনে একটা কালো দিন। আইনস্টাইন, ড্রাক্স, রবিনোভিচ প্রভৃতি মর্মান্বিত হয়েছিলেন এ সংবাদে। উইনি হিগিনসও নামে একজন বৈজ্ঞানিক রেডিওতে গবর শুনে মাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'যে কাজ এতদিন ধরে করলাম তার জন্য কিছুমাত্র গর্ববোধ করছি না। I am afraid that, Gandhi is the only real disciple of Christ at present!'

আর একজন বাস্তবচ্যুত জার্মান বৈজ্ঞানিক হেরমান হেলবার্ট লিখলেন একটা এপিক কবিতা The Bomb that Fell on America; তার একস্থানের অনুবাদ:

"বোমাটি পড়ল মার্কিন মূলকে—মাটিতে নয়, মাথায়।

কই? মানুষগুলো ছাই হয়ে গেল না তো?

যেমন গেছিল হিরোসিমায়?

না! মানুষের সেই বইল অবিকৃত।

বিহীন শুধু মন!

গলে পড়ে বসে পড়ছে মানুষের অস্তিত্বকল্প!

সর্বজনপ্রিয় আর নবাবম এক সারিতে এসে দাঁড়াল।

হারিতে গেল একটা সেতু—অতীতের সঙ্গে বর্তমানের।

এতদিনের শত্রু পৃথিবীটা প্রকাণ্ড জেলির মত ধ্বংসকে।

ক্রোড় পৃথিবীময় কুমিকণ্ড একটা!

না! পৃথিবীটা নেই। হারিয়ে গেছে!

এ আমরা কী করলাম।

হে আমার খদেশবাসী! এ তোমরা কী করলে?"

এ জাতীয় চিন্তা করার মানুষ কিছু মুষ্টিমেয়। লস আলামসে অধিকাংশই সেমিন আনন্দে আত্মহারা। ফলত মশাল হাতে শোভাযাত্রায় পথে নেমেছে সবাই। নাচে গানে হৈ-হারায়ে ফেটে পড়ছে। সবাই সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

ক্রাউন ফুকস্ বললে, আজ উৎসব হবে। সন্ধ্যারাত সবাই নাচবে। জোজের আয়োজন কর। খানা, পিনা ইত্যাদি নাচনা। দাঁড়াও গাড়িটা তার করি। মসের বন্যা বইয়ে দেব।

ফুকস্ বেহিয়ে গেল তার গাড়িটা নিয়ে সান্ডা-ফের দিকে। সান্ডা-ফে লস আলামস থেকে মাইল চলিল। খণ্ডা দুয়োকের মধ্যেই প্রচুর মন কিসে ফিরে এল আবার। মধ্যরাত পর্যন্ত চলল মদ্যপানের আসর। একমাত্র প্রফেসর ডাক্স সতীক উঠে চলে গিয়েছিলেন। এক লক্ষ আপনীর স্ত্রীকে মদ্যপানের মাধ্যমে অতিনিষিদ্ধ করতে তিনি পরাজয়। ফুকস্ মন নিয়ে ফিরে আসার পর উঠে গেলেন বজিলার্ড আর ফাইনম্যান। তাঁরাও উৎসবে যোগদান করতে অস্বীকার করলেন। ফুকস্ বলে, প্রফেসর বজিলার্ড! আপনিই তো আটম-বোমার তত্ত্বাবধ। আপনি পালাচ্ছেন কোথায়?

বজিলার্ড জবাব দিলেন না। মীরবে বেহিয়ে এলেন ব্যাকোরেট হল জেড়ে। উৎসব গুড়ের বাধে এসে সেখান ফাইনম্যান অঙ্ককারে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিও এ উৎসবে যোগদান করতে অস্বীকার করেছেন।

বজিলার্ড ফাইনম্যানকে বললেন, আশ্চর্য। আমি ভাবতেই পারিনি ফুকস্ লোকটা এমন। লক্ষাধিক জাপানীর স্ত্রীতে লোকটা পৈশাচিক উন্মাদে একেবারে নাচছে।

ফাইনম্যান বলেন, কেন প্রফেসর? আমি তো সেদিনই বলেছিলাম—

Fuchs/Looks/An ascetic/Theoretic!

পৃথিবীর অপর প্রান্তে ঐ ছতই আগাস্টের রেডিও নিউজের প্রতিজ্ঞার কথা বলি এবার:

ইলেক্টে 'ফর্ম হল' কারাগারে সন্ধ্যা ছয়টার নিউজ বুলেটিন শুনে লাফিয়ে ওঠে কারাগারক মেজর রিটনার। রেডিও নিউজে বলছে, লর্ডস মাঠে অস্ট্রেলিয়া গ্যাচ উইকেটে ২৬৫ করেছে। তার সঙ্গে একটা অদ্ভুত সংবাদ। আজ সকালে একটি মার্কিন বি-২৭ বিমান হিরোসিমায় একটা পারমাণবিক বোমা ফেলেছে। মুহূর্ত মধ্যে এক লক্ষ জাপানী হতাহত। বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা নাকি বিশ হাজার টি-এন-টি-বোমার সমতুল্য। জাপানে হিরোসিমা নামে কোন শহর আজ আর নেই।

মেজর রিটনার পোত সামলাতে পারে না। তার বন্দীশালায় তখন অটক আছেন পরাজিত জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টবৃন্দ। হাঁসের তৈরী আটম-বোমার ভয়েই এতদিন কাটা হয়ে ছিল মিত্রপক্ষ। মেজর রিটনার তৎক্ষণাৎ তলব করে বন্দীদলের বয়সছোঁট বৈজ্ঞানিকটিকে।

অনতিবিলম্বে লারি ফুকস্ করতে করতে এসে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক অটো হান। ইউরেনিয়াম-পরমাণুর ছন্দ বিনি সর্বপ্রথম সজ্জানে বিদীর্ণ করেছিলেন, সেই বিশ্বব্যপ্ত বৈজ্ঞানিক। রিটনার ঠিকে সম্মান করে বসালেন। খবরটা বসিয়ে বসিয়ে শোনালেন তাঁকে। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বৃদ্ধ অধ্যাপক। চুপ করে বসে বইলেন কয়েকটা মুহূর্ত—যেন মৌনতা অবলম্বন করছেন কোন পোকের বাতী শুনে। তারপর মুখ তুলে হঠাৎ বলেন, নিউজ-এ কি বলেছে, এটা পারমাণবিক শিল্পোৎপাদ?



—ইয়েস প্রফেসর।

বুদ্ধ অনামনক হয়ে পড়েন আবার। তারপর হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যায়। চমকে উঠে আবার বলেন, এককিউস মি। কী বললেন তখন? হ্যাক্লেড খাউজেও জাপানী মরা গেছে একটি বিস্ফোরণে?

—ইয়েস প্রফেসর। তাই তো বলল বেডিওভে।

—হ্যাক্লেড খাউজেও। এক লক্ষ।—বুদ্ধ উঠে পাঁজাতে গেলেন। পারলেন না। টপে পড়লেন সোফায়। মেজর রিটার্নার ছুটে আসে। ঠর নাড়ির গতি পরীক্ষা করে তৎক্ষণাৎ কিছুটা ব্রাণ্ড হাইয়ে দেয়। বলে, আপনি এখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন করুন—

—থ্যাঙ্ক মেজর। ই্যা, তাই করতে হবে। আমি—ঠিক—মানে পাঁজাতে শাব্বি না।

সম্মা সাতটায় বন্দীদের নৈশ আহার পরিবেশন করা হল। বন্দী-বিজ্ঞানীরা যে-যা চিহ্নিত চোরাগে গিয়ে বসলেন। ফন লে, ওয়াইৎসেকার, গেলার্ট, উইটজ, হাইজেনবের্ক প্রভৃতি। বলে ঠরা দশজন। হঠাৎ সকলের নজর পড়ল টেবিলের মাথাখানে সীটটা খালি। প্রফেসর অটো হান আসেননি। তিনিই নয়জোহা, সর্বজনপ্রিয়। মাথাখানের চোরাগানা ঠার।

ডাইর কার্ল উইটজ বললেন, প্রফেসর হানকে মেজর রিটার্নার ডেকে শারিয়েছিল মতামতের আগে। এখনও ফিরলেন না কেন তিনি? তোমরা অপেক্ষা কর, আমি ঠকে নিয়ে আসি।

মিনিট-মধ্যে পরে ডাইর উইটজ-এর কাছে ভাব দিয়ে বুদ্ধ অধ্যাপক ফিরে এলেন।

—কী হয়েছে স্যার? আপনি কি অনুভব?

—না না, আমার কিছু হয়নি। একটা খবর আ—ইমার বি. বি. সি. রেডিও ব্রডকাস্ট করেছে—বরটা বিস্ফোরকের মতই ফলিল—কিন্তু কেউ কোনও শব্দ করল না। পুরো সেড মিনিট।

ভরতা ভেঙে প্রফেসর হানই প্রথম কথা বললেন। ইতিমধ্যে তিনি সামলেছেন অনেকটা। হোসে বললেন, হাইজেনবের্ক, মাই বয়। তুমি হেরে গেছ। আমেরিকান বৈজ্ঞানিকদের কাছে। তোমার স্থান এখন দ্বিতীয় সারিতে।

দ্বিতীয় সারি। প্রফেসর হাইজেনবের্ক জীবনে কোন পরীক্ষায় কখনও দ্বিতীয় হননি। হান হাসলেন তিনি। বললেন, ইয়েস প্রফেসর। সে কথা আর বলতে!

সহ্য হল না ওয়াইৎসেকার-এর। বললেন, না। আমেরিকান বৈজ্ঞানিকদের কাছে নয়।

—নয়?

—না, প্রফেসর হান। আমরা হেরে গেছি হিটলারের ইহুদি-বিদ্বেষ নীতির কাছে। আমেরিকান লে? আইনস্টাইন, ম্যাক্স বর্ন, রেমন্স ফ্রাঙ্ক, নীলস বোর? নাকি বজিলার্ড, টেলার, ফের্মি, ফুক্স, ওয়াইনকফ, কিস্টি, রবিনেচিচ? হে? হে আমেরিকান?

মাথা নেড়ে প্রফেসর হান বললেন, আমি জানি না—এ বোমা কে বানিয়েছে। আমি শুধু জানি, আমার অপরাধিত শিষ্য হাইজেনবের্ক আজ দ্বিতীয় সারিতে।

—আমি স্বীকার করছি, স্যার! —মাথাটা নিচু করলেন হাইজেনবের্ক।

কিন্তু অত সহজে ওয়াইৎসেকার ছেনে নিলে—এ অভিযোগ। দুটোয় বসলেন, আমি মারি না একথা। হিটলারের হাতে তুলে দেব না বলেই আমরা ওটা বলাইনি—না হলে ওদের আগে, অনেক—অনেক আগে ওটা তৈরী করতে পারতাম আমরা।

আহারান্তে রাত নয়টায় বিজ্ঞারিত রেডিও বুলোটিং শুনলেন ঠরা। তারপর একে একে যে যার বিদ্যায় চলে গেলেন। “সত্য রাতি” সোফা করার কথা আজ আর কারও মনেও পড়ল না। হালের মধ্যে আটখানা খাট পাভা আর বয়জোহে দুজনের জন্য আছে একটি পুখক ঘর। ফন লে আর অটো হানের ঘর। সকলেই শুয়ে পড়লেন, কিন্তু ঘুম আসছে না কারও। হঠাৎ রাত দুটোর সময় প্রফেসর ফন লে এ ঘরে এসে বললেন—তোমরা একবার ও ঘরে চল। প্রফেসর হান যেন কেমন করছেন!

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে হাইজেনবের্ক। কেমন করছেন মানে? কী করছেন?

—আমার আশঙ্কা হচ্ছে, উনি আত্মহত্যার কথা ভাবছেন।

ওরা ধীরপদে একে একে আসে এ-ঘরে। মোমবাতি জ্বলছে বন্দীশালায়। স্তিমিত আলোকে দেখা যায় বাটের উপর চুপ করে বসে আছেন বুদ্ধ। চোখে উদগ্রাস্ত পাগলের দৃষ্টি। হাইজেনবের্ক সঙ্গতর্পণে এগিয়ে

আসে। হাতটা তুলে নেয় ঠার। সঙ্গিত কিবে পান বুদ্ধ। বিহ্বলের মত ডাকিয়ে দেখেন পুরাতন শিবির দিকে। হাইজেনবের্ক বললে, ছির হন প্রফেসর! হেরে গেছি তাতে হয়েছোটা কী? হারতেই কি চাননি এতদিন? আপনি নিজেই তো একদিন বসেছিলেন—হিটলারের হাতে আটম বোমা তুলে সেওয়ার আগে আত্মহত্যা করব আমি।

বুদ্ধের ঠোঁট খুঁটি নড়ে ওঠে। অক্ষুটে বললেন, সেজন্য নয়, ওয়ানার, সে জন্য নয়।

—তবে কী জন্য?

—ঐ ম্যাখমেটিক্যাল ফিয়ারটা। হ্যাক্লেড খাউজেও। টেন টু মি পাওয়ার ফাইট।

—কিন্তু আপনি তার কী করবেন, স্যার? আপনি কেন এতটা ভেঙে পড়লেন?

দু-হাতে মুখ ঢেকে বুদ্ধ হাতকাপে ভেঙে পড়লেন। আমি—আমিই যে ওদের প্রথম পথ দেখিয়েছিলাম, মাই বয়!—আমার হাতটা আজ রক্ত লাগ হয়ে গেছে—বেখ না। হ্যাক্লেড খাউজেও সোলস।

বলিরেখাচিত্র হাতটা বাড়িয়ে ধরেন মোমবাতির স্তিমিত আলোয়।

হাইজেনবের্ক ঠর মাথাটা নিজের বুদ্ধের উপর টেনে নেয়। পাকা তুলে ভরা মাথার উপর হাত বুলায়ে দিতে থাকে। যেন বাজা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

6.8.1945। বিজয়ী পৃথিবী আনন্দ-উৎসবে নাচছে। গোটা আমেরিকা আজ আলো-জ্বলমল। কম বেশি সবাই মাতাল। শুধু একটি লোক দৃঢ় পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছিল সাফা-ফের কাছে, কাস্টিলো ব্রীজ স্টেশনের দক্ষিণতম প্রান্তে। জায়গাটা জনবিরল। লোকটার পরনে হে রঙের সুট। মাথার টুপিটা নামানো, মুখে আলো পড়েনি। হাতে কিছু নেই। ঠোঁটে কুলছে সিগারেট। স্টেশনের শেষ প্রান্তে এখনটা আলো-আধারি। হঠাৎ বাড়িয়ে পড়ল লোকটা। দেশলাইয়ের শেষ কাঠিটা ছেলে নিলে বাওয়া সিগারেটটা ধরালো। সেই আলোর মুখের একটা আভাস দেখা গেল।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে এল আর একজন। বললে, পূর্ব-দিকে যাবার ট্রেন কখন পাওয়া যাবে বলতে পারেন?

লোকটা আগন্তুককে আপদমস্তক দেখে নিল একবার। ই্যা, সোশাকের বর্ণনা নিখুঁত। যেমনটি হবার কথা। নীল সুট, সদা-কালো জোরা কটা টাই, মাথায় বাউলার হ্যাট। তবু সন্দেহ ঘোচে না লোকটার। বলে, জানি না। কোথা থেকে আসছেন আপনি?

অতি নিম্নস্বরে লোকটা বলল: I come from Julius!

এতক্ষণে নিশ্চিত হওয়া গেল। শেকহ্যাণ্ড করল আগন্তুকের সঙ্গে। বললে, আমার নাম ডেব্রটার। আপনার?

—চার্লস রেমন্স। হাউ ডা বু ডু?

ডেব্রটার বললে, কোথাও গিয়ে কিছু খেতে হত।

—আসুন। স্টেশনের কাছেই আমার জানা একটা ভাল রেস্তোরাঁ আছে।

দুজনে এগিয়ে গেল জনকীর্প প্রাটফর্ম নিয়ে। আর কোনও কথা হল না পথে। প্রাটফর্ম-টিকিট ছিল দুজনেরই। দাবিল করে বেরিয়ে এল রাখায়। অনতিদূরে এক পানাগারে ঢুকল দুজন। দুজের একটা আলো-আধারি কোণে গিয়ে বসল। তখনও দুজন নির্বাক। এতক্ষণে নজর হল ডেব্রটারের, চার্লস-এর হাতে রয়েছে একটা অ্যাটিচি-কেস। কিন্তু ওর তো খালি হাতে আসার কথা।

ওয়েটার এসে পাঁজা। দু-পেগ কনিয়াকের অর্ডার নিয়ে চলে গেল। ডেব্রটার সঙ্গতর্পণে তার লকেট থেকে বার করে আনল একটা কাগজের টুকরো। নিশ্চয় রাখাল সেটা টেবিলের উপর। কোন একটা রেস্তোরাঁ-রিসেবের একটা হেঁড়া টুকরো। চার্লস নজর করলে দেখতে পেত রিসিটা'গোশেন ড্রাগন' পাব-এর মফের বিল। সানফ্রান্সিস্কোর একটি পানাগারের। তারিখটা চার মাস আগেকার। সে কিন্তু নজরই করল না এসব। সঙ্গতর্পণে তার হা-লকেট থেকে বার করল অনুরূপ একখণ্ড হেঁড়া কাগজ। ডেব্রটার দুটো টুকরো পরস্পরাশি জোড়া দিচ্ছিল যখন, তখন চার্লস নজর রাখছিল চারদিকে। না, কেউ লক্ষ করছে না ওদের। দুটি হেঁড়া কাগজ ধাক্কা ধাক্কা মিলে গেল। কুচিকুচি করে কাগজটা ডেব্রটার ফেলে নিল আশ-টোটে।



ওয়েটার এসে দাঁড়াল। নামিয়ে রাখল দুটি পানপাত্র। হলুদ রঙের পানীয়। পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করল ওরা নীরবে।

এরপর ডেব্রটার তার পকেট থেকে বার করল একটা পলমল সিগারেটের প্যাকেট। প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করল না কিন্তু। গোটা প্যাকেটটাই চার্লস-এর নিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, গুটি ম্যাডেন্স! —ইয়াহ।

চার্লস গ্রহণ করল সিগারেটের গোটা প্যাকেটটা। মুষ্টিবদ্ধ হাতটা চুকিয়ে দিল পকেটে। পরমুহুর্বেই হাতটা বার করে আনল। তাতে পলমলের প্যাকেটটা তো আছেই, আছে একটা লাইটারও। দুজনে দুটো সিগারেট বার করে ধরালো। ডেব্রটার এবার সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে নিজের পকেটে রাখল। যার সিগারেট তার পকেটেই ফিরে গেল।

ইতিমধ্যে সিক ওদের পাশের টেবিলে এসে বসেছে একটি ছেলে আর মেয়ে। তাদের চোখের সামনেই খটল ব্যাপারটা। মেয়েটা কেমন যেন ওদের দিকে তাকাসে বারে বারে। চার্লস অস্বস্তি বোধ করছে। ইঙ্গিত করল সে বন্ধুকে। দুজনে উঠে পড়ল। অতি ক্রতস্থান্বে গ্রাস দুটো শেষ করে।

ওয়েটার এসে দাঁড়াল। দাম মিটিয়ে দিল চার্লস।

স্নান হাসল ডেব্রটার। কী আশ্চর্য! চার্লস লোকটাকে টিপস দিল বিলের মাত্র শতকরা দশের হিসাবে। কী কৃপণ লোকটা! ভাবছিল ডেব্রটার। আর কেউ না জানলেও ওরা দুজন এবং রেমেসের ডান-পাশের ইনসাইড লাইনিংটা তো জানে, সিগারেট প্যাকেটের বদল হয়ে গেছে। লোকটার পকেটে এখন যে প্যাকেটটা আছে তার দাম মিলিয়ান নয়—বিলিয়ান ডলারের হিসাবে!

কিন্তু উপায় ছিল না চার্লস-এর। সে কত টিপস দেবে তারও নির্দেশ সে পেয়েছিল। টিপসের অঙ্কটা যেন এতবেশি না হয় যাতে ওয়েটারটা কৃতজ্ঞ হয়ে বিতীর্ণতার গর মুখের দিকে তাকায়। অবশ্য এত কমও যেন না হয়, যাতে অন্য কারণে সে চোখ তুলে তাকায়।

পথে নেমে এসে ডেব্রটার বলল, শুভ নাইট!

—জাস্ট এ মিনিট। তোমার স্ট্রিকেসটা ফেলে যাক।

হাত বাড়িয়ে স্ট্রিকেসটা চার্লস দিতে চায় ডেব্রটারকে। ভুটুটি কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ডেব্রটারের। বলে, কী আছে ওতে?

চার্লসকে চোখ বুলিয়ে একবার সেখান চার্লস। রাস্তার এদিকটা এখন জনশূন্য। নিঃকণ্ঠে বললে, ওজনটা তুমিই দেখ। অল ইন টোয়েন্টি গ্র্যান্ড ফিন্গার ডলার বিলস।

অর্থাৎ বিশ এবং পঞ্চাশ ডলারের খুচরা নোট। যা অপরূপ বিজ্ঞানের ভাষায় 'নব্ব্বা নোট' নয়। যা সহজে খরচ করা যাবে। ডেব্রটার একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। স্ট্রিকেসের ওজনটা বাম দিয়ে 'নেট ওজনে' ডলারের অঙ্কটা টেন-টু-ন্য-পাওয়ার কততে দাঁড়াবে আন্দাজ করতে তার কোন ব্রাইড-কপের প্রয়োজন হল না। বললে, এ শর্ত ছিল না তো—

—জুলিয়াস বিনা পারিশ্রমিকে কাউকে দিয়ে কোনও কাজ করায় না।

হঠাৎ ধক করে ছলে উঠল ডেব্রটারের চোখ দুটো। বললে, দেন গিভ মি ব্যাক মাই সিগারেট-প্যাকেট।

আথকে ওঠে রেমণ্ড: কী ব্যাপার?

—জুলিয়াসকে বল—ডেব্রটার অর্থের লোভে একাজ করছে না।

—ঠিক হ্যাঁ।

কোনরকম বিদায় সম্বাষণ না জানিয়েই চার্লস স্ট্রিকেসটা হাতে ইটিতে শুরু করে। একটা চ্যাকি আসছিল এদিকে। সেটাকে দাঁড় করায়। পালাতে পারলে সে বাঁচে।

ডেব্রটার অনামনস্বেষ মত ইটিতে থাকে ফুটপাথ ধরে।

সেই রাত্রে লস আলামসে ফিরে ডেব্রটার শোওয়ার আগে দিনপত্রিকায় লিখেছিল:

Others talk, hope, wait and are repeatedly disappointed, because they don't understand the true nature of political power. Well, I'm going to act. I've acted. May be I have prevented another World War.

: ওরা বাকবিত্তার করে, আশা করে, অপেক্ষা করে আর বারে বারে বোকা হয়, কারণ ওরা জানে না রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃত স্বরূপ। আমি ও জানে পা দেব না। যা করবার নিচ্ছেই করব। করেছে। হয়তো আজ আমিই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শব্দ রুদ্ধ করে দিয়ে গেলাম।

তারপর বাড়ি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

তবু শেষ হল না সিনটা। মিনিটলশেক বিজ্ঞানায় পড়ে থেকে আবার উঠল। আলোটা জ্বালল। মিনপত্রিকার পাতাবান পড়ল আবার। হাসল। ছিড়ে নিল পাতাটা। তারপর দেশলাই ছেলে লেখাটা পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

পাঠকের হয়তো সন্দেহ আছে—আমি অনেক আগেই বলেছি—এ বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যায়ন করতে বসে একটা সমীকরণ হবে দুটি ফল পেয়েছি। একটা বিলিয়ান ডলারের অর্থে এবং দ্বিতীয়টা শূন্য।

আশা করি হিসাবের কড়ি বাথে থাকনি।

$$X(X-10^9)=0$$

ইকোয়েশনের দুটি 'রুট'ই নির্ভুল। এ বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যায়ন বিলিয়ান ডলারেও প্রকাশ করা যায়; আবার বলা যায়, সেটা বোফ শূন্য। কিউ-ই-ডি।



## কেন ?



তিমি-শিকারীর দলটাকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হল। ইয়া, 'তিমি-শিকারীর দল।' যুদ্ধসচিবের নির্দেশ নিয়ে এম বি. আই. চীফের কাছে যখন অনুসন্ধানের আদেশ এল তখন তৈরী হল এই 'হোয়েলার্স-স্কোয়াড।' তিমি-শিকারীরা হারপুন দিয়ে বিশেষ আনবে সেই অতলসঞ্চারী তিমি মাছটিকে—ডেঞ্জটার। একা ডেঞ্জটার নয়, ইতিমধ্যে জানা গেছে, আরও দুজন ছোট-মাপের বিদ্যমান থাকবে এই দুর্ভাগ্যে প্রত্যেক অংশ নিয়েছে। তাদের ছদ্মনাম যথাক্রমে 'আলেক্স' আর 'ডগলাস'। এম বি. আই. অনুসন্ধান করে বুঝেছে—এ তিনজন পৃথক পৃথকভাবে গুপ্তচর-পদ্ধতিতে অংশ নিয়েছে, তারা সম্ভবত পরস্পরকে চেনে না। মানে বন্যমে হয়তো চেনে—গুপ্তচর হিসাবে ছদ্মনামে চেনে না। আরও জানা গেছে, সর্বনাশের সিংহভাগ দাবী করতে পারে একমাত্র ডেঞ্জটার একাই। আলেক্স এবং ডগলাস খিলিতভাবে যদি চার-আনা ক্ষতি করে থাকে, তবে ডেঞ্জটার একাই করেছে বাকী অন্য।

খুব দীর্ঘে দীর্ঘে অগ্রসর হতে হবে। রাতারাতি রাফনবোয়াল জালে ধরা পড়বে না। প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে এই দুটি চুনোপুটিকে : আলেক্স এবং ডগলাস। তাদের স্বীকারোক্তি থেকেই হয়তো পাওয়া যাবে ডেঞ্জটার-বধের তথ্য।

যুদ্ধসচিবের নির্দেশ পাওয়ার পর কর্ণেল ল্যাঙ্গডেল মূল পরিকল্পনাটা ছকে ফেলেছেন। কর্ণেল প্যাশকে নিজের চেয়ারে ডেকে নিয়ে তিনি পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দিলেন—

হোয়েলার্স-স্কোয়াডে থাকবে পাঁচটি ইউনিট। পাঁচটি বিভাগের পাঁচজন দলপতি থাকবেন। বিভাগের নামগুলি মূলত দেশ অনুসারে। হাঙ্গেরিয়ান-যুনিট অনুসন্ধান করবেন তিনজন বিজ্ঞানীর বিষয়ে, তাঁরা হলেন ফন নয়মান, হজিয়ার্ড এবং টেলার। এর মধ্যে মূল লক্ষ্য হলেন হজিয়ার্ড। তিনি কবাকর অ্যাটম-বোমা নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কাজ করে গেছেন। গোপনীয়তার নির্দেশ অমান্য করে লস-আলামোসের বৈজ্ঞানিকদের ভিতর প্রচার-পুঙ্খকা বন্টন করেছেন—বোমা-বিরোধী ফ্রন্ট গঠনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে রাশিয়ান-যুনিট। তার মূল লক্ষ্য কিস্টিয়াকৌন্সি। ইকিনোমিচ অবশ্য বোমা-নিক্ষেপের বিরুদ্ধে দল ও মত গঠনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন; কিন্তু গুপ্তচর-বৃত্তি কেন তাঁর চরিত্রের সঙ্গে বাধা যায় না। তা হোক—কবরটা পাচার হয়েছে রাশিয়ায়। ফলে দু-জন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিককেই যাচাই করে দেখতে হবে। তৃতীয় অনুসন্ধানী দল পরীক্ষা করবে অপর চারজন বৈজ্ঞানিককে। এই দলের কার্যপ্রণালী উপবৃত্তের আকার নেবে। কেন্দ্র একটা নয়; দু-দুটো। উপবৃত্তের এক কেন্দ্র ডিক ফাইনম্যান—সেই আপাত-হেলেনমানুব দুর্ধর্ষ প্রতিভাবান ব্যক্তিটি, এবং দ্বিতীয় কেন্দ্র অটো কার্ল। চতুর্থ দল যাচাই করবে তিনের ওয়াইসকফ আর এনরিকো ফের্মি। প্রফেসর মীলস, বোরকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর মত অনামনস্ত মানুষের পক্ষে কোন বড়স্কে অংশ নেওয়া একেবারেই অসম্ভব। পঞ্চম দলের লক্ষ্য একমাত্র একজন বৈজ্ঞানিক : রবার্ট জে ওপেনহাইমার।

কর্ণেল ল্যাঙ্গডেলের বিশ্বাস 'ডেঞ্জটার' একা নয়, আলেক্স এবং ডগলাসকেও এই পাঁচটি দলের অন্তর্ভুক্ত এই ব্যারোজনের সন্ধানকালেই হয়তো ঝুঁজে পড়বে যাবে, হয়তো উপগ্রহ হিসাবে। কর্ণেল প্যাশকে তিনি বললেন, পাঁচটি যুনিটের জন্য পাঁচজন দলপতিকে এখনই নির্বাচিত করতে হবে, এবং তুমি থাকবে এই পাঁচজনের শীর্ষস্থানে, যোগাযোগ-সঞ্চাকারী হিসাবে।

কর্ণেল প্যাশ জবাবে সবিনয়ে বললে, স্যার, আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আমি একটি বিকল্প প্রস্তাব রাখতে চাই।

—বল।

—আপনি নিজেই এই পাঁচটি দলের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে অপারেশন-হোয়েলার্স পরিচালনা করুন। আমি ঐ পাঁচটি দলের একটি বিশেষ দলের দলপতি হতে চাই।

—কেন ? কোন দলের ?

—পঞ্চম দলের। আমি ঐ ডিক ওপেনহাইমার কেন্দ্রের তদন্তকার নিতে চাই।

কর্ণেল ল্যাঙ্গডেল নীরবে কিছুক্ষণ ধূমপান করেন। তারপর বলেন, ও কে। তাই হোক। এবার যদি চারটি দলের দলপতি কাকে কাকে করতে চাও বল।

—আমার মনে হয় তৃতীয় দলটিকেও আপনি দু-ভাগ করুন। তার কারণ প্রফেসর অটো কার্ল শীঘ্রই ইংলণ্ডে ফিরে যাচ্ছেন, অথচ প্রফেসর ফাইনম্যান কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়েছেন। একজন গোয়েন্দার পক্ষে পৃথিবীর দু-প্রান্তে—

—কবেই। তাহলে আমাদের পাঁচজন লোকের প্রয়োজন।

—প্রফেসর ফাইনম্যানের পিছনে লেগে থাকবে ম্যাককিলিভি—যে ছিল লস অ্যালামোসে আমাদের সিকিউরিটি অফিসর। ম্যাককিলিভি আমাকে জানিয়েছে যে, ইতিমধ্যেই প্রফেসর ফাইনম্যানের বিরুদ্ধে কিছু গোপনতথ্য সংগ্রহ করেছে। ব্যাপারটা ঠী তা সে বলেনি, ওর মতে আরও একটা নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগৃহীত না হলে সে বিশেষাতি নিতে পারবে না। তাবধি, ম্যাককিলিভিকে কলোম্বিয়ায় বদলি করে দেব। দ্বিতীয়ত, প্রফেসর অটো কার্ল-এর বিরুদ্ধে নিযুক্ত করতে চাই উইলিয়াম জেমস হার্ডনকে। ছোঁকা আমেরিকান নয়, ব্রিটিশ—বর্তমানে স্টল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নিযুক্ত আছে। আমার সঙ্গে দীর্ঘ দিনের আলাপ। আপনি অনুরোধে জানালে স্টল্যাণ্ড ইয়ার্ড হার্ডনকে হারওয়েলে বদলি করবে।

—হারওয়েল কোথায় ? সেখানে কেন ?

—হারওয়েল অক্সফোর্ডের কাছাকাছি একটা আধা-শহর। সেখানে একটা নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরি তৈরি হচ্ছে। পারমাণবিক-শক্তিকে যুদ্ধোত্তরকালে মানব-কল্যাণে লাগানো যায় কিনা সেটি ব্রিটেন তাই দেখতে চায় হারওয়েলে। প্রফেসর অটো কার্ল সেই প্রকল্পে একটা চাকরি নিয়ে যাচ্ছেন। স্যার জন ককক্রফট-এর অধীনে। ক্রাউস ফুকসও যাচ্ছেন সেখানে।

লস অ্যালামোসে তখন 'ভাঙা হাট'। শিকির ভাঙার পালা। অথবা বলা যায় ফুলশয্যা-বৌতাত মিটে যাবার পর বিয়েবাড়ির অবস্থা। দেশ-বিদেশ থেকে বরযাত্রীরা এসে ছুটেছিল নিমন্ত্রণ পেয়ে। শুভকাজ নির্বিশেষে মিটে গেছে। পরের ঘরের মেয়ে এ বাড়িতে নববধূ হয়ে ঘোমটা টেনে বসেছে অমরমহলের গোপন একায়ে। এবার বরযাত্রীরা যে যার ভেদায় ফিরে যাবে। বিজ্ঞানীর দল প্রতিদিনই নতুন নতুন চাকরির নিয়োগপত্র পাচ্ছেন। ঘরোয়া বিদায় পূর্ব লেগেই আছে। যুদ্ধজয়ের মাত্র দু-মাসের মধ্যে ওপেনহাইমার তখন জাতীয় বীর। প্রথম মাসখানেক অভিনন্দন-সভার উপস্থিত থাকাই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। টেলার হাইড্রোজেন-বোমা আবিষ্কারের নতুন প্রকল্প নিয়ে মেতেছেন। হজিয়ার্ড বিরক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন এ নারকীয় মরণযজ্ঞ থেকে। অটো কার্ল আর ক্রাউস ফুকস ফিরে যাচ্ছেন ইংলণ্ডে—হারওয়েল-এ এ-পাশের প্রায়শ্চিত্ত করতে, পারমাণবিক-শক্তিকে মানব কল্যাণে ব্যবহার করা আর কিনা তাই পরীক্ষা করে দেখতে।

মার্কিন কর্মকর্তারা এতদিনে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তুল বললাম, পৃথিবীর নয়, আমেরিকার। রাশিয়ার সঙ্গে একটা চুক্তিবদ্ধ হলে ভাল হয়। তাঁদের বক্তব্য : হে বন্ধু, তোমাদের অ্যাটম-বোমা নেই, আমাদের আছে—তবু বিশ্বশান্তির মুখ চেয়ে আমরা নিজে থেকেই প্রস্তাব তুলছি; এস, একটা ডবললোকের চুক্তি করা যাক—আমরা দুজন কেউ কারও উপর অ্যাটম-বোমা ঝাড়ব না।

১৭৪৫ সালে মঞ্চেতে হল একটি মহাসম্মেলন—চতুঃপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠক। ফোর-পাওয়ার কনফারেন্স। অথচ ত্রিমাত্রব্রহ্মপুংগব। বামের এ-বিষয়ে সবচেয়ে উৎসাহিত হবার কথা, তাবাই শ্যামা চাপা লিঃ প্রজ্ঞাবতী। রাশিয়ান ডেলিগেট মলোটিভ বললেন, আপাতত ও আলোচনাটা মূলত্ববী থাক। পরবর্তী অধিবেশনে এটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে বরা।

আমেরিকা এটা আদৌ প্রত্যাশা করেনি। মলোটিভের ঔদাসীনের কোন হেতুই সেদিন বোকা গেল না।

সেটা বোকা গেল আরও চার বছর পর। ১৭৪৭-এর আগস্ট মাসে একটি মার্কিন বি-২৭ বিমান কতকগুলি ফটো দাখিল করল। ওয়াশিংটনের বিশেষজ্ঞরা সেই ফটো পরীক্ষা করে বুঝলেন, সাইবেরিয়ার কোন নির্জন অঞ্চলে রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা পরমাণু বোমা বিক্ষোভ ঘটিয়েছেন। তাই ফটো-ফটো প্রতিও-অ্যাকটিভিটির দাগ পড়েছে। অর্থাৎ পালা এতদিনে সমান-সমান হয়েছে। এতদিন বোকা গেল, পচন্দ্যামে জালিন এবং মঞ্চে সেখানে মলোটিভ কেন অমন ঔদাসীনা দেখিয়েছিলেন। দিঃ রাশিয়ায় তো ইউরেনিয়াম নেই। কেমন করে পরমাণু-বোমা বানাতে এরা ?



তখন ওরা তা বুঝতে পারেননি। হজিলাডকে তো বার্ভেস্ টাটো করে একদিন বলেই ছিলেন, পশুলাটা পেলেও রাশিয়া কোনদিন আটম বোমা বানাতে পারবে না। তার ভাড়াতে ইউরেনিয়াম নেই। আজ এ গ্রন্থ রচনাকালে পৃথিবী অবশ্য জানতে পেরেছে এ ধারণা সমাধান। রাশিয়ান জিওলজিস্ট বিখ্যাত পণ্ডিত ভরনাত্জি মহান নেতা সেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার অবকাশে এ ধারণা সমাধানটা ঘটনাচক্রে জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের। ভরনাত্জি বলেছেন, ১৯২১ সালেই সেনিন তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাশিয়ার প্রত্যেকটি প্রত্যন্ত দেশে যেসব বনিজ সম্পদ আছে তার বিস্তারিত অনুসন্ধান চালাতে। ওরা অর্থাৎ ভূতত্ত্ববিদগণ ইউরেনিয়ামের সন্ধান পেয়েছিলেন। বস্তুত সেনিন জীবিত থাকতেই পাঁচ-শাটটি কেন্দ্রে নিউক্লিয়ার রিসার্চের কাজ শুরু হয়ে যায়। এই চারটি কেন্দ্র হল—সেনিনগ্রাডের রেডিয়াম ইন্সটিটিউট এবং ফিজিক্স ইন্সটিটিউট আর মস্কোর লেবেভফ ইন্সটিটিউট এবং ইন্সটিটিউট ফর ফিজিক্যাল ম্যাথিমেটিক্স। পঞ্চম প্রতিষ্ঠানটি ছিল খারখতে অবস্থিত। অটো হানের আবিষ্কারের ঠিক পরেই রাশিয়ার শিক্ষামন্ত্রী—বৈজ্ঞানিক কাকতানভা বার্লিনে এসেছিলেন। অটো হানের বিজ্ঞানগণ্য তিনি বুটিয়ে সেকেন এবং অটো হানকে নানান প্রশ্ন করে ব্যাখ্যাটা জেনে নেন। তখনও, সেই ১৯৩৭-এও এটাকে গোপন তথ্য বলে কেউ মনে করত না। সেনিনের মৃত্যুপূর্তি, রাশিয়ার মূল-ভূখণ্ডে ইউরেনিয়াম আবিষ্কার এবং ওদের একদিনের সাধনার কথা লৌহ-অবনিকার এপারে কেউ জানত না। প্রথম জানল ঐ বি-২৭ মেনের রিপোর্ট পেয়ে, সাইবেরিয়ার আকাশে আটম-বোমা বিস্ফোরণের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ার পর।

কিন্তু সেসব কথা তো অনেক পরের। আগের কথা আগে বলি।

দৃশ্যভাষ্যের মধ্যেই কর্ণেল প্যাশ এসে রিপোর্ট করল কর্ণেল ল্যান্ডডেলের কাছে: স্যার, ভাল ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ-শাটটা টিমই কাজে লেগে গেছে; কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা হচ্ছে: তিনজনের মধ্যেই মূল অপরাধীকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

—কোন তিনজন?

—ডিক্ ফাইনম্যান, ওপেনহাইমার অথবা অটো কার্ল।

কর্ণেল ল্যান্ডডেল বলেন, ফাইনম্যান আর ওপেনহাইমার সবচেয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। ওদের দুজনের মধ্যে একজন যদি ডেব্রটার হন আমি বিস্মিত হব না। কিন্তু আমার এক মাসের বেতন এক বোতল ছইফির বিনিময়ে তোমার সঙ্গে বাজি রাখতে রাজী আছি, অটো কার্ল এর ভিতর নেই।

কৌতুক উপচে পড়ল প্যাশের মু-চোখে। বলল, স্যার, আপনার গৌরি মাসের মাইনেটা এভাবে হাতিয়ে নিতে আমার বিবেকে বাধছে। যা হোক, এত বড় কথাটা কেন বললেন?

—অটো কার্ল-এর 'আলোবাইটা' আমি যাচাই করে দেখেছি। নিবৃত্ত নীষক। দশই আগস্ট প্রফেসর কার্ল সান্ডা ফে থেকে মেনে চড়েন। এগারই সমস্তটা দিন তিনি ছিলেন নিউইয়র্কে। এগারো তারিখ সন্ধ্যায় তিনি স্বয়ং জেনারেল গ্রোভসের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

—সো হোয়াট?

—কী আশ্চর্য। তুমি ভুলে গেছ প্যাশ—ডেব্রটার ছয়ই আগস্ট রাতে সান্ডা ফে-র একটা আসবাগারে মাইক্রোফিলমটি হস্তান্তরিত করে। সেহেতু ঐ সময় প্রফেসর কার্ল সান্ডা ফে থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে ওয়াশিংটনে ছিলেন তার অকটা প্রমাণ রয়েছে—

বাধা নিয়ে প্যাশ বলে, স্যার। ও 'আলোবাইটা' আমিও যাচাই করে দেখেছি। শুধু তাই নয়, প্রফেসর কার্লের হঠাৎ ওয়াশিংটনে আসার কোনও জোরালো যুক্তি আমি খুঁজে পাইনি—একমাত্র যুক্তি ঐ 'আলোবাই' প্রতিষ্ঠা করা। তা থেকেই আমার মনে হয়েছে—

কর্ণেল ল্যান্ডডেল বাধা নিয়ে বলেন, তুমি পাগল না আমি পাগল বুঝে উঠতে পারছি না। কার্ল কেমন করে একই সময়ে কয়েক হাজার মাইল দূরত্বে—

—তাহলে আমার ইন্ডেন্টিফেশন রিপোর্টটা বিস্তারিত শুনুন—

কুজর গোরেন্স কর্ণেল প্যাশ। প্রতিটি পক্ষের তার নিবৃত্ত। এগারই আগস্ট কার্ল করে 'আলোবাই' আছে প্রথমই সে সেটা যাচাই করে দেখে নেয়। ফাইনম্যানের নেই, ওপেনহাইমারের নেই, হজিলাডের নেই। আছে যাদের তারা হলেন—ফন নরমান, ম্যাক্স বর্ন, ক্রাউস ফুক্স, অটো কার্ল প্রভৃতির। নরমান ২৯ অ্যালামসে ছিলেন, ম্যাক্স বর্ন রক্তস্রাব কক্ষে সত্রীক উপস্থিত ছিলেন, ক্রাউস ফুক্স এদিন রাতে

সবাইকে প্রচুর মন এনে বাধ্য হয়। মস্কো আসবে অবশ্যইই অংশ গ্রহণ করেন। একমাত্র হজিলাড ও ফাইনম্যান ছাপানে বোমাবসংগের জন্য কোন আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। তারা দুজনে হোতনাবার ছেড়ে চলে যান। বাকি রাত তারা কোথায় কাটান তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। অপর অটো কার্ল আগের দিন থেকে ওয়াশিংটনে ছিলেন।

ফলে আলোবাই-এর হিসাব অনুসারে তিনটি নাম লিপিবদ্ধ হল প্যাশ-এর ডায়েরিতে। ফাইনম্যান, ওপেনহাইমার এবং হজিলাড।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুসন্ধান সে শুরু করে অনামিত থেকে। ফটো তোলায় বাতিক কার আছে। মাইক্রোফিলম তৈরী করার মধ্যে উপযুক্ত যন্ত্র কার কাছে থাকতে পারে? এই সূত্র ধরে একটা অদ্ভুত তথ্য পেতে গেল। এর প্রথমই মনে হল, লস অ্যালামসে ফটো-ডীলার কে কে খোঁজ করতে হবে। তার কাছেই সন্ধান পাওয়া যাবে কে কে তার গ্রাহক, ফটোগ্রাফির বাতিক আছে কার কার। কথাগুলো সে ক্রাউস ফুক্সকে প্রদত্ত করল, 'অই সে ডইই, লস অ্যালামসে কোনো ফটোগ্রাফারের দোকান আছে? কিছু ফটো তুলেছি, ডেভেলপ করতে দিতাম।'

ক্রাউস ফুক্স জবাবে বলেন, লস অ্যালামসে কোন ফটোগ্রাফার নেই। সান্ডা ফে-তে পাবেন। তবে তাড়াতাড়ি থাকলে আপনি প্রফেসর কার্ল-এর দ্বারস্থ হতে পারেন। ঠর ফটোগ্রাফিতে ভীষণ ঝোঁক। নিজস্ব ডার্করুম আছে; সব কিছু নিজ হাতে করেন।

প্যাশ নির্বিকারভাবে বললে, না, শৌখিন ফটোগ্রাফার দিয়ে চলবে না। আমি যেটা ডেভেলপ করতে চাই তা হচ্ছে মাইক্রোফিলম।

—হ্যা, হ্যা—তার ব্যবস্থাও আছে। প্রফেসর কার্ল ছাত্রজীবন থেকেই ঐ মাইক্রোফিলম ব্যবহার করছেন। লাইব্রেরিতে বসে উনি নাকি কখনও লঙ্ঘনও নোট নেননি। পটাণ্ট ছবি তুলে নিয়ে চলে আসতেন।

এবারও নির্বিকার ভাবে প্যাশ বলে, তাই নাকি। তবে তো ভালই। ঠর কাছেই যাই—

—কিন্তু প্রফেসর বোধ হয় কাল গানফলিঙ্কো গেছেন। দাঁড়ান, জেনে নিই—

ফুক্স একটি ফোন করলেন। ও প্রান্তে ধরলেন ফ্রাউ কার্ল। শোনা গেল, ফুক্সের অনুমানই সত্য। প্রফেসর তাঁর ডেব্রায় নেই।

প্যাশ বলে—এখানে আর কেউ নেই যে ওর ডার্করুমটা ব্যবহার করে এটা ডেভেলপ করে দিতে পারে? আপনি পারেন?

—সর্বনাশ। আমি ফটোগ্রাফির কিছুই জানি না। আমার ক্যামেরাই নেই। আর তাড়াড়া তেমন ফটোগ্রাফি-কিশরদ পেলেও কাজ হবে না। আমি নিশ্চিত জানি, প্রফেসর ওর ডার্করুম তালাবদ্ধ করে গেছেন। কাউকে ব্যবহার করতে দেন না সেটা। ঐ ডার্করুমটা ঠর গ্রাণ। কাউকে ঢুকতেই দেন না সে ঘরে।

কর্ণেল প্যাশ তখন মনে মনে দুইয়ে-দুইয়ে-চার করছে। অটো কার্ল জার্মান। তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ বিশেষীর মতো। তিনি মাইক্রোফিলম তৈরী করতে পারেন। যন্ত্র নিজস্ব। ডেভেলপ করেন নিজে। ডার্করুমটা তাঁর গ্রাণ। কাউকে ঢুকতে দেন না। বাড়ির বাইরে গেলে সেটা তালাবদ্ধ থাকে।

ফুক্স আশ্বাস করতে পারে না, প্যাশের মনে তখন বড় উঠেছে। সে তখনও ঘোষণা চালায়। বলে, অদ্ভুত ফটো-তোলায় হাত চম্বলোকের। বিশেষ করে ট্রিক-ফটোগ্রাফি। আমি তো ঠর সহকারী হিসাবে পাঁচ বছর কাজ করছি, দেখেছি কী চমৎকার-আচ্ছা দাঁড়ান, ঠর তোলা একটি ট্রিক-ফটোগ্রাফ আপনাকে দেখাই—

আলমারি খুলে একটি ফটো বার করে আনে। পোস্টকার্ড সাইজ। ছবির ক্যাপশন, 'হোয়েন কার্ল কংগ্রেসুলেট্ কার্ল।' প্রফেসর কার্ল এটা ফুক্সকে উপহার দিয়েছিলেন।

আশ্চর্য ছবিটা। প্রফেসর কার্ল নিজেই নিজের করমর্দন করছেন। অর্থাৎ সুপাশেই অটো কার্ল। ফুক্স বললে, কী একটা পরীক্ষা সাফল্যশ্রুতি হওয়ায় কার্ল নাকি এই ফটোটা তোলেন। তিনি নিজেই নিজেকে অভিনন্দন জ্ঞান করেন। আমি তো আজও ভেবে পাই না, কেমন করে এটা তোলা গেল—

—সুপার-ইম্পোজিশন। দু দিকে দাঁড়িয়ে দুখানা সেল্ফ-ফটো নিয়েছিলেন প্রথমে, তারপর গ্রিন্ট করার সময়—জাস্ট এ মিনিট—



মাকপথেই প্রেমে যায় প্যাশ। পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা বার করে খাটের অভিনিবেশের সঙ্গে দু-তিন মিনিট পরীক্ষা করে ছলিটা। প্রতাপ বসে, আশ্চর্য।

—আশ্চর্য নয়?

—না, সেজন্য নয়। আমি যে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলাম তা ঠিক নয়। এ ছবি 'সুপার ইম্পোজিশন' নয়। মানে দুবার ফটো তুলে একটি প্রিন্ট বানানো হয়নি। একবারই স্ফাপ হয়েছে।

—কেমন করে বুঝলেন?

প্যাশ হেসে বলেন, ডক্টর! এটা নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নয়। কেমন করে আপনারা বোঝাবো? ফটোগ্রাফি হচ্ছে ক্রিমিনোলজির একটি বিশেষ শাখা। এই গ্রেন্ডলো লক্ষ্য করুন—ওয়েল, এক কথায় এটা সুপার-ইম্পোজিশন আদৌ নয়।

—কী জানি মশাই, আমি ওসব বুঝি না।

একটু ইতস্তত করে প্যাশ বলে, আচ্ছা ফ্রাউ কার্লকে আপনি ডেনেন?

—ঘনিষ্ঠভাবে। প্রফেসর কার্লের সহকারী হিসাবেই শুধু নয়, তাঁর প্রাকবিবাহ যুগ থেকে। কেন?

—আপনি ঠেকে আর একবার ফোন করুন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব। আপনিও আসুন না? অসুবিধা আছে?

—কিছু না। ফ্রাউ কার্ল আমার বাড়বী পর্যায়ের। তার সান্নিধ্যে আবহাওয়া সময় কাটাতে পারলে খুশীই হব আমি।

ফ্রাউ কার্ল অতি সুন্দরী। বয়স বছর ত্রিশেক। প্রফেসর কার্ল-এর চেয়ে অল্পত কৃতি বছরের ছোট। নির্ভাবান প্রটোটাইট। কোয়েকারি। জন্ম ডিয়েনায়—বাল্যকাল কেটেছে জার্মানিতে। ক্রাউস ফুকসের পিতা ডক্টর প্যাশের ফুকসের মন্ত্রণা। ক্রাউস ফুকস-এর পিতৃসেব প্যাশের ফুকস ছিলেন তাঁর আমলে একজন বিখ্যাত জার্মান কোয়েকারি। বিশ্বজাতৃহের পুজারী। নাৎসীদের হাতে নিপতীত হয়েছিলেন—ফেল খেটেছেন, কিন্তু জার্মানী ত্যাগ করে যেতে অস্বীকার করেন। ফ্রাউ রোনটা কার্ল তাঁর আদর্শ এই বিশ্বজাতৃহে অনুপ্রাণিত, সেই সূত্রেই ক্রাউস ফুকসের সঙ্গে তাঁর আলাপ। ছিপছিপে একহারা চেহারা, সাবা ধপধপে ম্যাটিনম গ্রুপ চুলের গোছা লুটিয়ে পড়েছে কাঁধের উপর, যৌবন অটু। এক সম্ভ্রানের জননী। সম্ভ্রানটি মরা গেছে, অগত দেখলে মনে হয় অবিস্মৃতিত বকসী।

ওদের সমাদর করে বসালেন ফ্রাউ কার্ল। শ্যাম্পেন বাব করে আনলেন। ফুকসকে হমক মিলেন, আজকাল তো এ পাড়া মাভাতেই দেখি না।

—আর এ পাড়ায় আসব কী করতে? দরকার ছিল প্রফেসরের সঙ্গে—আটম-বোমার জন্য। সে দরকার তো মিটেই গেছে।

—ও। অর্থাৎ আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। কেমন তো? অকৃতজ্ঞ কোথাকার। একদিন তোমার বিছানা সাফা করা থেকে ঘরদোর পরিষ্কার করা সবকিছু আমাকে দিয়ে করাতনি?

—নিশ্চয়ই না। তুমি নিজের গরজে ওগুলো করতে।

—নিজের গরজ। কী গরজ ছিল আমার?

—তোমার কিংকার ঠিক রাখতে।

প্যাশ বাধা দিয়ে বলে ওঠে—কীজ, মিসেস কার্ল। তৃতীয় ব্যক্তির সামনে এভাবে হ্যাটে ইন্ডি ভাঙবেন না।

ব্যক্তি যে ওঠে রোনটা। হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো পিছনে সরিয়ে নিতে নিতে বলে, আপনি যা ভাবছেন মোটেই তা নয়। ক্রাউস যখন নাৎসীদের লাগি খেয়ে ইলেণ্ডে পালিয়ে এল তখন প্রথমে আমাদের বাড়িতেই আশ্রয় পায়। ছেঁড়া পাংলুন, জুতোয় তামিমাঝ—নেহাং দয়াপূরক হয়ে আমি তখন আমার পকেট-মানি থেকে—

হঠাৎ নিজেই কী ভেবে থেমে পড়ে।

ফুকস বলে, কেন মিছে কথা বলছ রোনটা। সত্যি কথাটা ঢেপে যাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। কর্নেল প্যাশ জাত-গোয়েন্দা। ঠিকই আন্দাজ করছে সে।

—কী সত্যি কথা?—গর্জে ওঠে রোনটা।

—সে সময় তুমি আমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলে।

রোনটা হয়তো মেয়েই বলত ফুকসকে। বাধা দিল প্যাশ। বললে, মিসেস কার্ল, আপনি কি ফাইনম্যানের সেই বিখ্যাত তানকাটা শুনেছেন। ডক্টর ফুকসের উপর।

—“তানকা” কাকে বলে?

—জাপানী কবিতা—তিন চার লাইনের। প্রফেসর ফাইনম্যান মুখে মুখে অমন কবিতা-রচনায় নিরুত্থ। উনি ডক্টর ফুকস সহজে বলেছেন:

“Fuchs...Looks... An ascetic...Theoretic.” অর্থাৎ ফুকসকে দেখলে মনে হয় ভালো মানুষ। আসলে ডক্টর ফুকস—পদ্যপূরণ করে রোনটা নিজেই—পাজির পা-ঝাড়া! অকৃতজ্ঞ। শয়তান।

ফুকস উঠে দাঁড়ায়। আত্মমি নত হয়ে ‘বাও’ করে: থ্যাংকস্ ফর দ্য কম্মিউমেন্টস্।

কাঁধের কথায় আসে প্যাশ। বলে, মিসেস কার্ল, আপনার রাগস্থ হয়েছি একটা বিশেষ কৌতুহল মেটাতে। এই ফটোখানি প্রফেসর কার্ল উপহার দিয়েছিলেন ডক্টর ফুকসকে। এটা তিনি কেমন করে তুলেছেন জানেন?

ফটোখানি হাতে নিয়ে রোনটা হাসে। বলে, আপনিই বলুন না।

আমি প্রথমে ভেবেছিলাম—ট্রিক ফটোগ্রাফি। দুটো শনগেটিভ সুপারইম্প্রাস করা। কিন্তু পরে পরীক্ষা করে দেখলাম, তা নয়। আপনি কিছু জানেন?

—জানি। আপনি যে অনবদ্য তানকাটা এই মাত্র শুনিয়েছেন, তার প্রতিদান হিসাবে এ গোপন বহুসাজ আপনার কাছে ফাঁস করে দেব। কেবল একটি শর্তে—প্রফেসরকে বলবেন না। এই ফটোখানা দেখিয়ে সে অনেককে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

—বেশ বলব না, এবার বলুন।

—এ ছবি একবার মাত্র একশোজ করে তোলা হয়েছে। কোনও ফটোগ্রাফিক ট্রিক এর মধ্যে নেই। এ-পাশে অটো কার্ল, ও-পাশে হাল কার্ল।

—হাল কার্ল? তিনি কে?

—প্রফেসর কার্ল-এর যমজ ভাই। মজাতে আছেন। তিনিও ফিজিসিট।

অনেক কষ্টে কর্নেল প্যাশ তার অভিযান্ত্রিক গোপন রাখল। কী আশ্চর্য। কী অপরিমিত আশ্চর্য। প্রফেসর অটো কার্লের এক যমজ ভাই আছে, যে নিজেও পদার্থবিজ্ঞানী, সেও নিউক্লিয়ার ফিজিসিট এবং মজাতে থাকে।

সেদিনই প্রফেসর অটো কার্ল-এর ব্যক্তিগত ফাইলটা প্যাশ আবার হাতড়ে দেখল। ই্যা, ‘কোপ্তেনেয়ারে’ প্রফেসর কার্ল লিখেছেন, তাঁর একটি ভাই আছে। সে বিজ্ঞানী। মজোর লেবেডফ ইলুট্রিটে গবেষণা করছে। তার বয়স যা উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রফেসর অটো কার্ল-এর সঙ্গে ছবছ এক। অর্থাৎ একটু অল্প কমলেই এক-বি-আই বৃদ্ধিতে পারত—এ হাল কার্ল হচ্ছেন অটো কার্লের যমজ ভাই। এতদিন সে অমরা কেউ কাষে দেখিনি। কিন্তু সেকথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করা নেই।

—কাহিনীটা শেব করে প্যাশ কর্নেল ল্যান্ডডেলকে বললে, এবার বলুন স্যার, আপনার একমাসের মাহিনা বাজি ফরবেন?

কর্নেল ল্যান্ডডেল শুধু বললেন, ষ্ট্রেন্ড।

—অর্থাৎ ঐ হাল কার্ল যদি কোন ডিমোম্যাটিক পাসপোর্ট নিয়ে আমেরিকায় এসে থাকে, এবং প্রফেসর অটো কার্ল-এর আইডেনটিটি ভিস্ত-এর একটা নকল তাকে রাশিয়ান গুপ্তচরেরা নিয়ে থাকে তাহলে অনায়াসে লস আল্যামোসের প্রতিটি কোন্ডে হয়তো সে প্রবেশ করেছে। অপর পক্ষে এগারই আশস্ট ওয়ানিটনে গোতসের ঘরে যে লোকটা অল্পসময়ের জন্য হাজিরা দেয় সে যদি হাল কার্ল হয়, তাহলে প্রফেসর অটো কার্ল অ্যালেবাই সয়জে নিশ্চিত হয়ে সাজা ফে-তে গিয়ে মাইক্রোফিল্মটা হস্তান্তরিত করতে পারেন।

—আই সী।—বললেন সৎক্ষেপে কর্নেল ল্যান্ডডেল।

‘আলেক’ দ্বা পড়ল 1946-এর তেশরা মার্চ।



তার মাস-তিনেক পরে স্যার জন, প্রফেসর কার্ল আর ডক্টর ফুকস চলে গেলেন হারওয়েলে। অ্যালেক্সের প্রকৃত নাম ডক্টর অ্যালেন নান মে। ইংরেজ। যুদ্ধের প্রথম দিকে এসেছিল কানাডার। সেখান থেকে শিকাগোতে। সে যে খবর পাঠিয়েছিল তা সামান্যই। প্রথমত বোনটা U<sub>235</sub> এর। দ্বিতীয়ত সে সময় ম্যাগনেটিক সেপারেশনে দৈনিক চারশ গ্রাম U<sub>235</sub> পাওয়া গিয়েছিল। এ ছাড়া 162 মাইক্রোগ্রাম পরিমাণ U<sub>235</sub> সে ল্যাবরেটরি থেকে পাচার করে এবং রাশিয়ান গুপ্তচরের হাতে সমর্পণ করে। এই তার অপরাধ।

ওশ বেইলি কোর্টে তার বিচার হয়। সংক্ষিপ্ত বিচার। নান সোধ স্বীকার করে। দশবছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে যায় তার।

অ্যালেন নান-এর জবানবন্দী থেকে ডেক্সটার অথবা ডগলাস সর্বশেষ কোন তথ্যই জানা গেল না। বস্তুত সে ঐ দুজনের সঙ্গে কোন সময়েই যোগাযোগ করেনি।

ইতোমধ্যে অন্যান্য সূত্র থেকে এটুকু বোঝা গেছে, ডগলাস মধ্য-ইউরোপের লোক। আমেরিকান বা ইংরেজ নয়। প্যাশ-এর ধারণা ডগলাস এবং ডেক্সটার একযোগে কাজ করেছে। তারা পরস্পরকে চেনে। এক্ষেত্রে তারা নিশ্চয়ই সেই যোগসূত্রটুকু বজায় রেখে চলছে। এখন দুজনেই দুজনের মৃত্যুবাণ। একজন ধরা পড়লেই অপরজন বেশি করে বিপদগ্রস্ত হবে। এই যুক্তি অনুসারে কর্নেল প্যাশ তাঁর নজর রাখবার ব্যবস্থা করল সম্ভাব্য ডেক্সটারদের উপর—অর্থাৎ ফাইনম্যান, অটো কার্ল এবং ওশেনহাইমারের সঙ্গে কে কে দেখা করতে আসছে। হারওয়েলে থেকে এই সূত্রে তাকে জার্মান জানালো একজনের নাম—ব্রুনো পল্টিকার্ডো। সংক্ষেপে ব্রুনো অথবা পলি। জ্যোতিষ ইতালীয়ান। এনরিকো ফেরি হার, কিছুদিন জোন্স-কুরির বিজ্ঞানাগারেও রেডিও অ্যাকটিভিটির উপর কাজ করেছে। পরে পলিতে আসে কানাডায়। ‘চক-রিচার’-একসঙ্গে যুক্ত ছিল। পরমাণু-বোমার বিষয়ে অনেক কিছু জেনেছে সে। যুদ্ধান্তে ফিরে গেছে ইংলণ্ডে। হারওয়েলে চাকরির খান্দায় আছে। তাকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে অটো কার্লের বাড়িতে। মনে হয়, দুজনের দীর্ঘদিনের জানাশোনা। প্রফেসর অটো কার্ল বর্তমানে হারওয়েলে ইনস্টিটিউটের মুনস্বর কর্ণধার। প্রধান কর্মকর্তা হচ্ছেন ডিরেক্টর স্যার জন ককক্রফট। ব্রিটিশ ডেলিগেশানের কর্ণধাররূপে মানহাটান প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন যুদ্ধের সময়। তাঁর অধীনে আছেন প্রফেসর কার্ল। তিন নম্বর চেয়ারে বসেছেন ডক্টর ক্লাউস ফুকস। শোনা গেল, প্রফেসর কার্ল নাকি ভিতরে ভিতরে আশ্রয় চেষ্টা করছেন যাতে ব্রুনো একটা চাকরি পেতে যায় ওখানে। কেন?

হারওয়েল-এ প্রথম আবির্ভাবের দিনটির কথা কোনদিন ভুলবে না বোনটা। জুন 1946। রৌদ্র-করোচ্ছল সুন্দর একটি প্রভাত। অক্সফোর্ড থেকে একটি ট্যাক্সি নিয়ে প্রথম এল ওরা। ওরা তিনজন। প্রফেসর অটো কার্ল, তাঁর স্ত্রী বোনটা আর ক্লাউস ফুকস। তার মাস-তিনেক আগে আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন স্যার জন—হারওয়েলের ডিরেক্টর। মালপত্র তখনও এসে পৌঁছায়নি। লগুন থেকে ট্রেনে চেপে এসেছিল অক্সফোর্ড। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে হারওয়েল।

রোদ ঝলমল সবুজ-প্রান্তরের মাঝখানে দিয়ে কুমারী মেয়ের সিঁথির মতো পড়ে আছে সড়কটা। মাঝে মাঝে খামারবাড়ি—যব আর বালির ক্ষেত। পাড়া-স্বরার দিন শুরু হয়নি, রৌদ্রে ঝলমল করছে সবুজ সতেজ শপলার আর এলুম গাছের সারি। বিসর্পিল পথে গাড়ি চলেছে। কেউ কোন কথা বলছে না। নীরবে উপভোগ করছে এই প্রথম আবির্ভাব মুহূর্তটি; আর নতুন যুগে, নতুন পৃথিবীতে নতুন করে পাঁচার প্রভাতী সূর।

হঠাৎ দূর থেকে দেখা গেল পুরানো হারওয়েল গ্রাম। গড়, টালি আর ব্রেকের হাল। যেন সারি সারি খেলাঘর। চিমনি দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোয়া উঠছে। গ্রাম্য কুকুরগুলো এখনও বোধ্যয় মোটর-কারে অভ্যস্ত হয়নি। তারদ্বারে প্রতিবাদ জানাচ্ছে তারা। হঠাৎ বোনটার নজরে পড়ল একটি উঁচু টিলা। তার মাথায় একটা ছোট বাঙালোর মতো মনে হচ্ছে।

—ওটা কী?—কৌতূহলী বোনটা প্রশ্ন করে।

নিউক্লিয়ার-ফিজিক্স-এর দুই পণ্ডিত আগ্রহ করলেন। অজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া উপায় কি? জবাব দিল ক্যাব-ড্রাইভার। বললে, ম্যাডাম, ওটা হচ্ছে ‘হোয়াইট-হর্স অফ উইকিটন’। এখানেই একদিন সেন্ট জর্জ সেই ড্রাগনটাকে বধ করেছিলেন। আজ সেই সেন্ট জর্জও নেই, ড্রাগনও নেই—পড়ে আছে শুধু সাদা ঘোড়াটা।

—সাদা ঘোড়াটা। বল কী! এতদিন ধরে আছে?

—আছে ম্যাডাম। বিশ্বাস না করেন তো দেখে আসুন। আমি না হয় আশ্রয়টা অপেক্ষা করছি। কারবুরেটোরটাও গণগোল করছে। এই ঠাঁকে দেখে নেই।

বোনটা তো তৎক্ষণাৎ এক পায়ে খাড়া। নিঃশব্দী ঝাঁপান সে। বাইবেল তার কণ্ঠস্থ। সেন্ট জর্জ এখনেই সেই ড্রাগনটাকে বধ করেছিলেন শুনে রোমাঞ্চ হয়েছে তার। গাড়ি থামতেই সে নেমে পড়ে। বলে, এস হোমর।

দুই প্রফেসর কার্ল বলেন, ওহ মাই! আমাকে মাপ কর ডার্লিং। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত।

—তবে তুমিই এস—বোনটা ডাক দেয় ক্লাউসকে।

ক্লাউস ইতস্তত করে। প্রফেসর কার্লই তাকে উৎসাহ জোগান—যাও, দেখে এস। আমি বরাং এখনেই আছি। একটু পাখচাচি করি ততক্ষণে।

পায়ে পায়ে ওরা দুজন এগিয়ে চলে। বোনটা আর ক্লাউস। বিসর্পিল পথে শাকদণ্ডীর একটা মোড় ঘুরেই বোনটা বলে, তুমি অত মুখ গোমড়া করে আছ কেন বলত তো ক্লাউস। জোর করে ধরে আনলাম বলে।

—জোর করে মানে? আমি তো খেঁজায় এ চাকরি নিয়েছি। তোমার উপরোধে পড়ে মোটেই নয়।

—জানি। আমার উপরোধে পড়ে তুমি করে কোন কাজটা করেছে?

মনে মনে কাঁটা হয়ে ওঠে ক্লাউস। এই প্রশ্নটিকে সে সবচেয়ে ডরায়। সে কিছুতেই ভুলতে পারে না, সাত-আট বছর আগেকার একটা ঘটনা—চিরচরিত ব্যক্তি লজ্জন করে কুমারী বোনটাই একদিন হস্তব্দ তুলেছিল—ক্লাউস ফুকসকে অমন্ত্রণ জানিয়েছিল তার জীবনের ভোণে। ক্লাউস নিজেই সে প্রশ্নবর্তী প্রত্যাশ্যন করেছিল সেদিন। তাই প্রসঙ্গটা ঘোরবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, সেন্ট জর্জ আর ড্রাগনের ব্যাপারটা কী?

পথের মাঝখানেই থামকে পড়ে বোনটা। প্রতিপ্রশ্ন করে, তুমি কি ঝাঁপান?

—আমার বাবা তো বটেই।

—বাবার কথা তুলো না। তাঁর নাম উচ্চারণ করারও যোগ্য নও তুমি।

—কী কুশলিল। আমার বাবার নাম আমি বলব না?

—না বলবে না। যে সেন্ট জর্জের নাম শোনেনি—

টিলায় মাথায় সতাই ছিল একটা অদ্ভুত জিনিস। প্রায় দু-হাজার বছরের প্রাচীন ছবি। পাথরের গায়ে খোদাই করে আঁকা—খোঁড়া একটা। সাদা চক্কর পাখাড়, তাই ওটা সাদা ঘোড়া। কিম্বদন্তীর সেন্ট জর্জ নাকি সাদা ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলেন ড্রাগনকে বধ করে বন্দি। ‘ড্যামসেল-ইন-ডিস্ট্রেস’কে উদ্ধার করে আনতে। বিপদ যুগের ঐ শিল্পকর্মটি দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রীরা আসে হারওয়েলে।

টিলায় উপর থেকে দেখা গেল ট্যাক্সিটা। খেলাঘরের পাড়ি যেন। প্রফেসর কার্ল পাখচাচি করছেন; আর বনটে হুলে ক্যাব-ড্রাইভার হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ইঞ্জিনের ভিতর।

শাকদণ্ডী পথে ফেরার সময় বোনটা বললে, আচ্ছা ক্লাউস, ধর আমি যদি একদিন ঐরকম বন্দিরী হয়ে পড়ি—তুমি অমন সাদা ঘোড়ায় চেপে আমাকে উদ্ধার করতে আসবে।

হঠাৎ অকাল-ক্যাটোনে স্মিহাস করে ওঠে ক্লাউস। বলে, কী পাগল তুমি, বোনটা। এযুগে কি ড্রাগন পাওয়া যায় পথে-ঘাটে?

বোনটা অপ্রস্তুত হল না মোটেই। বললে, কেন পাওয়া যাবে না? হয়তো তার চেহারাটা পলটুয়ে—তাই সহজে চেনা যায় না; কিন্তু ড্রাগন আছে বইকি আজও।

ওর কথার মধ্যে কী যেন একটা কেনার সুব ছিল। তাকে উঠল ক্লাউস।

হারওয়েল জায়গাটাকে কিছু ভাল শেগা সোল ক্লাউস ফুকস-এর। শুধু জায়গাটিই নয়, গোটা প্রকল্পটি। আলদীনের আশ্রয়-অশ্রুপ থেকে বঁরা বার করেছেন একটা দৈত্যকে—কিন্তু তাকে সেওয়া হল শুধুমাত্র দ্ব্যবসের আদেশ। এ টিক হয়নি—এজন্য এ গুপ্তধনের সন্ধানে প্রাণপাত করেছেন—ক্লারকো-কুরি সম্পত্তি-চ্যাডউইক-ফের্মি আর অটো হান। হ্যা, ফুকস স্বীকার করে, প্রথম সাক্ষ্য সে নিজেই আনলে—আত্মহারা হয়ে মন বিনতের ভুটেছিল—কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। এতদিনে সে পথের সন্ধান পেয়েছে। মানব-কল্যাণে যদি এই মহাশক্তিকে কাজে লাগানো যায়, তবেই



সার্থক হবে অর্ধশতাব্দীব্যাপী সাধনা। সেই আয়োজনই হচ্ছে হারওয়ারে। মনপ্রাণ তাই ঢেলে দিল ফুক্স।

সমস্ত কারখানাটা উঁচু কীটা-তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সামনে সোহাগ বড় পেট। বস্তুধারী পাহারা। তাকে 'পাস' দেখিয়ে তবে তুমি ঢুকতে পারবে এ-বাড়িতে। ঢুকতেই সামনে একটি বিতলবাড়ি। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস। এখানেই কাজ করতে হয় তাকে। সারার জনের পাশের ঘরে। ও-পাশে প্রফেসর কার্ণের অফিস। আগে এটা ছিল রফেল এয়ার ফোর্সের একটা আন্তর। বিমানবাহিনীর কর্মীদের ধরগুলোই পাওয়া গেছে আপাতত। নতুন নতুন বাড়িও হচ্ছে। একতলা বাড়ি সব—সামনে ফুসের বাগান, পিছনে সবুজির। স্টাফ-কোয়ার্টারসকে বা-হাতে রেখে যদি এগিয়ে যাও তাহলে আবার একটা কীটা-তারের বেড়ার সামনে নিয়ে দাঁড়াবে। আবার পাস দেখাতে হবে। ভিতরটা কারখানা নয়, বিজ্ঞানাগার। সবচেয়ে অবাক হয়ে যাবে আর্টিমিক পাইলটকে দেখে। প্রকাণ্ড একটা গোলাকৃতি গম্বুজ—যেন রোমের কলোসিয়ামের অনুকৃতি। ওর কাছে নিয়ে দাঁড়াতে ভয় হবে তোমার। সম্মুখে হঠাৎ ঠিক হিরোসিমা-নাগাসাকির কথা মনে পড়বে না, তবুও গা ছমছম করবে। মনে হবে অজানা-অজেনা এক অরণ্যের মাঝখানে এসে পড়েছ বুদ্ধি। চারদিক অন্ধকার তকতক করছে—হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার যেন। হঠাৎ নজরে পড়বে একটা বিজ্ঞপ্তি: শূন্যান নিবেশ। হয়তো ধড়াস করে উঠবে বুকের ভিতর। হাতের ছালস্ত সিগারেটটা কোথায় ফেলবে ভেবে পাবে না। তখনই একজন কর্মী হয়তো এগিয়ে আসবে, বলবে—অমন ঝাংকে উঠবেন না স্যার; আর্টিমিক-পাইলট কোন ডিনামাইটের স্থপ নয়—সিগারেটের আগুনে ওটা জ্বলে উঠবে না। ঐ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে যাতে জায়গাটা নোবো না হয়।

ফুক্স আর কার্ল এখানে গৌহানোর বছর দেড়েক আগেই এ প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে। এখন এখানে শ-মুয়েক কর্মী কাজ করে। তার মধ্যে জনা ত্রিশেক হচ্ছে বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান-চর্চা তারা করেছে সামান্যই, জানও অল্প। বয়স বিশ-পঁচিশ। আসলে ওরা সবাই যুদ্ধ-ফেরত। ফিজিক্সের চর্চা ছেড়েছে তিন-চার বছর আগে—কেমব্রিজ-অক্সফোর্ড-হার্ভার্ড-ইটনে। চলে গিয়েছিল মরণশয় যুদ্ধে—ওরা মূলত টেকনিশিয়ান, হাতে-কলমে কলকন্ডার কাজই শুধু জানে। স্যার জন তাই ব্যবস্থা করেছেন সমগ্র হাতে চারদিন তাদের নিয়ে থিওরেটিক্যাল ক্লাস করতে হবে। ক্লাস নেন তিনি নিজে, আর তাঁর দুই সহকর্মী—প্রফেসর কার্ল আর ডক্টর ফুক্স। ছেলগুলো প্রাণবন্ত—মৃত্যুকে বারে বারে দেখেছে চোখের সামনে। নীতিবোধের বালিই কম—কিন্তু নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার সঙ্কল্প আছে।

ওরা তিনজনই মাত্র পদস্থ অফিসার—বাদবাকি তো ছেলে-ছোকরা। আরও দুজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ফুক্স-এর। উইং কমান্ডার হেনরী আর্নল্ড আর ডক্টর স্যামুয়েল স্ট্রট। আর্নল্ড ছিলেন বিমানবাহিনীতে, স্ট্রট গভীর স্বভাবের মানুষ, বিপত্নীক। তিনি হারওয়ারের স্পেশাল সিকিউরিটি অফিসার। এখানে অবশ্য সিকিউরিটির অতটা কড়াকড়ি নেই, যেমন ছিল লস অ্যালামোসে। সেখানে প্রত্যেকের ছদ্মনাম ছিল, স্বনামে কারও পরিচয়ই ছিল না। এখানে সেসব কিছু নেই। তবু পারমাণবিক-তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যখন হচ্ছে তখন গোপনীয়তার প্রয়োজন আছে বইকি। আর ডক্টর স্ট্রট এখনকার মেডিক্যাল অফিসার। ছোট একটা রাউন্ডডোর ডিসপেন্সারি আছে তাঁর। অত্যধিক মানুষ। আছেন সপরিবারে, স্ত্রীপুত্র পরিজনদের নিয়ে। সুখী পরিবার।

এখানে এসে এতদিন পরে ক্রাউস-এর মনে হচ্ছে, জীবনে নেতৃত্ব ফেলার দিন এসেছে বুদ্ধি। এখন ওর বয়স পঁয়ত্রিশ। এতদিন সংসার করার কোনও ইচ্ছাই ছিল না। এখন আর পঁচতনের পরিবারের দিকে তাকিয়ে ওরও মনে হচ্ছে এই নির্বাক ব্যাচিলারের জীবনে সে কোনদিনই শান্তি পাবে না। 1946-এ প্রথম যখন চাকরিতে ঢোকে তখন ওর প্রোজেক্ট ছিল বছরে 275 পাউণ্ড, এখন উপার্জন করছে 1500 পাউণ্ড। অর্থাৎ মাসে প্রায় আড়াই হাজার টাকা। 1946-এ যুদ্ধোত্তর ইংল্যান্ডে এ উপার্জন বড় কম নয়। কিন্তু বিবাহ করার, সংসার করার একটি প্রচণ্ড বাধাও আছে। সে বাধা—ক্রাউ রোনটা কার্ল।

এ ধারণ সমাধানটা বুঝতে হলে ক্রাউস ফুক্স-এর অতীত জীবনটাকে জানতে হবে। ক্রাউস জার্মানী থেকে প্রাণ নিয়ে যখন ইংলণ্ডে পালিয়ে এসেছিল তখন ওর বয়স মাত্র বাইশ। জার্মানীর ভিতরে

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উৎসাহী ছাত্রনেতা ছিল সে। রাজনীতির দুর্গবর্ধে সে ছিল ন্যাশনাল সোসালিস্ট পার্টির বিরুদ্ধ বলে। ছাত্র-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। হঠাৎ দেখা গেল ওর বিরুদ্ধ দল, ঐ ন্যাশনাল সোসালিস্ট পার্টি জার্মানীর স্বাধীনতা দখল করেছে—তার নাম হয়েছে নাসী পার্টি। ঐ দলের নেতা অ্যাডলফ হিটলার হয়েছে জার্মানীর মণ্ডুকের কর্তা। 1933-এর বিশেষ জানুয়ারী—যেদিন হিটলার জার্মানীর স্বাধীনতা দখল করল, সেদিন কিরেন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিটলারের অনুগামীরা তম তম করে ঝুঞ্জেছিল বিপ্লবসেলের ঐ ছাত্রনেতাকে—পাদরী ফুক্সের সেই পুর্ববিত্ত পুত্র ক্রাউস-কে। স্বর পেয়ে ক্রাউস আত্মগোপন করে। প্রথমে পালিয়ে যায় পারীতে, সেখান থেকে কপর্দকহীন অবস্থায় ইংলণ্ডে।

ফ্রান্স রোনটা হেন্সফোর্ট-এর বরস তখন মাত্র সাতের। হাইস্কুলের ছাত্রী। তার বাবা ছিলেন পাদরী ফুক্সের একজন গুণগ্রাহী। ফুক্স অপর পেল তাঁর পরিবারে। সমারসেট-এ। মিস্টার হেন্সফোর্ট-এর বিপত্নীক। তাঁর বড় মেয়ে ফ্রান্স রোনটাই ছিল গৃহকর্তী—মাম সতের বছর বয়সে। আরও দুটি ছোট ছোট ভাইবোন—এর পরিচয় ছিল তার উপর। এর উপর এসে স্ট্রট ক্রাউস—বাইশ বছরের প্রাণবন্ত তরুণ ফুক্স ভর্তি হল ক্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে। চার বছর সে ছিল এই পরিবারে, রোনটার অভিভাবককে। শুধু তাই নয়, রোনটা ছিল তার মাস্টারনি, পিগিমিপি আর কি। তার কাছেই ইংরেজি ভাষাটা শিখেছিল। পরিবর্তে ক্রাউস রোনটার শক্ত শক্ত অঙ্কগুলো কয়ে লিখত। সে সময় ক্রাউস ছিল মুখচোরা, বইয়ের শোক। চার বছর পরে ক্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে যে বছর দর্শন ও অঙ্কশাস্ত্রে ডক্টরেট পায় রোনটা সে বছরই গ্রাজুয়েট হল। আর সেই বছরই মারা গেলেন ওর আশ্রয়দাতা—রোনটার বাবা।

জার্মান বিজ্ঞানের সেই দুর্গভ প্রভিভা বাস্তব্যত মাত্র বর্ন তখন এডিনবার্গে পদাধিকার অধ্যাপক। ক্রাউস ফুক্সের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর অধীনে একটি স্বল্পারশিপ জুটিয়ে নেন। ক্রাউস সমারসেট ছেড়ে চলে আসে স্ট্রটল্যান্ডে, এডিনবার্গে।

সেই বিদায়মুহুর্তেই স্ট্রট একটা ঘটনা যার প্রতিক্রিয়া সারাজীবন ধরে অনুভব করছে ক্রাউস। রোনটা ততদিনে একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। সনোবটা চালাবার মত ব্যবস্থা হয়েছে তার। একদল ককরের তাকশো ভরপুর। ক্রাউস এতদিনে প্রফেসর মাক্স বর্নের অধীনে রিসার্চ করার সুযোগ পেয়েছে শুনে সে অভিনন্দন জানাতে এল ক্রাউসকে। কথাপ্রসঙ্গে বললে, তুমি তো এবার এডিনবার্গে চলে যাবে। আনন্দের সঙ্গে এই বোধহয় ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

ক্রাউস বললে, তা কেন? এডিনবার্গ এখন কিছু সাগর পারে নয়। যোগ্যবোধ রাখলেই রাখা যেতে পারে অকণা তোমার যদি গরজ থাকে।

—আমার? কী মনে হয় তোমার?

—কী জানি। চিঠি লিখলে জবাব দেবে তো?

হঠাৎ মুখটা নিচু করল রোনটা। বললে, আর আমি যদি বলি—চিঠি-লেখার দূরত্ব থাকতে-চাই না আমি?

—মানে?

ওর চোখে চোখ রেখে রোনটা বললে, আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই। সেটস্ পেট ম্যারেড, ক্রাউস।

—তা কেনম করে সম্ভব? আমার ছাত্রজীবন এখনও শেষই হয়নি।

একটা বীক্‌বাস গড়েছিল রোনটার। তারপর বললে, আমি কি তাহলে তোমার প্রতীক্ষায় থাকব? এবার জবাব নিতে দেবী হল ফুক্স-এর। একটু ভেবে নিয়ে বললে, আমি পুণ্ডিত রোনটা। তা হবার নয়। রাখা যে কী, তা তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু আমি আমার জীবনের সঙ্গে তোমাকে কোনদিনই ছাড়িয়ে নিতে পারব না।

স্বপ্নিত হয়ে গেল যেন রোনটা। বহু কষ্টে সে যেন আত্মসমরণ করল। তারপর প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললে, তাহলে তোমার আগের প্রস্তাবের জবাব দিই, আমাকে চিঠি লিখ না। কারণ জবাব আমি দেব না।

ক্রাউস শুধু বলেছিল, আরাম করি।



ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল রোনটা।

সে আজ নয়-দশ বছর আগেকার কথা। ক্রাউস কিন্তু ঠর কথা মনে নেয়নি। এডিনবার্গে পৌঁছে চিঠি লিখেছিল। একাধিক পত্র। রোনটাও ছিল তার সংকল্লিত অটুট। একটি চিঠিরও জবাব দেয়নি। তারপর যেমন হয়। ক্রমশঃ ক্রাউস ভুলে গেল তার প্রথম যৌবনের বাস্তবীকে। তিন বছর পর হ্যাঙ্গ বর্নের কাছে দিসিস দাখিল করে পেল ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধি। ইতিপূর্বে হয়েছিল পি-এইচ-ডি—এবার হল ডি-এস-সি। খবরটা উৎসাহভরে জানালো রোনটাকে।

এবারও কোন জবাব এল না।

ক্রাউস ক্রমশঃ ভুলে গেল মেয়েটিকে। তারপর রোনটার সঙ্গে ওর দেখা হল সুদূর সাগরপারের দেশে। আমেরিকায়। লস আলামোসে। ততদিনে রোনটা হয়েছে মিসেস কার্ল। একটি সম্মানের জননী। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মানটি ঝাটেনি। তাকে চোখেই দেখেনি ক্রাউস। দেখেছে ফটো। অসংখ্য ফটো। একটি গোটা অ্যালবাম ভরা ছিল আলিসের ছবিতে। বহিন ছবি। সদ্যোজাত অবস্থা থেকে তার সংক্ষিপ্ত তিন-বছরের জীবনের শেষ মিনিট পর্যন্ত। প্রফেসর কার্ল-এর ছিল ফটো তোলায় বাস্তবিক। বহিন ছবিও তুলেছেন অনেক। মুভি ক্যামেরাতেও। তাই চোখে না দেখলেও রোনটার কন্যা আলিসকে ক্রাউস ভালভাবেই চেনে। মেয়েটা রোনটার মত দেখতে হয়নি মোটেই। রোনটা 'ব্রিটিশ'—সোনার বরণ তার মাথাভরা চুল, রোনটার মুখটা টিকলো—মেয়েটি ছিল 'বুনেট,' তার মুখটাও গোলাগাল।

রোনটার চেয়ে তার স্বামী কাঁশন বছরের বড়। এমন কিবাহে রোনটা যে জীবনে সুখী হয়নি তা বুঝতে অনুবিধা হয় না। এমন অসমবয়সের পুরুষকে কেন পছন্দ করল রোনটা? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায়নি সে। জিজ্ঞাসাও করা যায় না এ কথা। প্রফেসর কার্ল মহাজনী—অধ্যাপক অথবা পণ্ডিত হিসাবে তাকে যেকোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন করবে; কিন্তু ঈশিচন বছরের একটি মেয়ে তার কোন্‌ স্তরে অভিভূত হয়ে স্বামী হিসাবে তাকে নির্বাচন করল?

তাই আজ এতদিন পরে সেই মেয়েটির চোখের সামনেই সংসারী হতে কেমন বেন অস্বাভাবিক বোধ করে ক্রাউস। বাস্তবী তার হয়েছে অনেক। তার রূপ, যৌবন এবং রোজগার দেখে অনেক মেয়েই উৎসাহ বোধ করেছে। ও নিজেই কেমন বেন অপরাধী বোধ করে তাতে। মনের মাত্রটা বাড়িয়ে দেয় শুধু।

হারওয়ার্ডে এসে আরও একটা অনুভূতি হয়েছে। তার মনে হয়, সর্বদাই যেন একছোড়া অদৃশ্য চোখ লক্ষ্য করছে ওকে—ওকে নয়, ভদ্রসেব। প্রফেসর কার্ল, রোনটা আর ক্রাউসকে ক্রমান্বয়ে লক্ষ্য করে যাচ্ছে কেউ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, কিন্তু সর্বদাই যেন এক অদৃশ্য সম্মানীর দৃষ্টির শিকার হয়ে বয়েছে ওরা। কেন এমন মনে হয় ওর? রোনটার প্রতি তার, অথবা তার প্রতি রোনটার অস্থির যে গোপন অনুভূতি আছে সেটাই কি আবিষ্কার করতে চায় ঐ অদৃশ্য গোয়েন্দা চোখ-জোড়া? স্যোপাল আঙুলে বুকে উঠতে পারে না। শেষ পর্যন্ত একদিন সে মরিয়া হয়ে এসে হাজির হল হেনরী আর্নল্ডের দরবারে। খুলে বললে তার ঐ অদৃশ্য অনুভূতির কথা। সব কথা শুনে হে-হো করে হেসে উঠল আর্নল্ড। বললে,—না না, ডক্টর ফুক্স, আমি আপনার পিছনে কোনও গোয়েন্দা লাগাইনি। বুদ্ধস্য তরঙ্গী ভারী। সুন্দরী মিসেস কার্ল এবং যৌবনদীপ্ত প্রফেসর ফুক্স যে পরস্পরকে কী চোখে দেখেন, তা আমার ভালই জানা আছে। এবং এ কথাও জানি যে, মিসেস রোনটা কাচের প্রাকবিবাহ জীবনের বন্ধু ছিলেন আপনি। নিশ্চিত থাকুন ডক্টর ফুক্স, আপনারা কোন সামাজিক কেসেলারির মধ্যে ফেলবার স্তম্ভ উদ্দেশ্য আমার আসে নেই।

ডক্টর ফুক্স রাড়িয়ে ওঠে। বলে, না না, আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আপনি গোয়েন্দা লাগিয়েছেন এ কথাও বলছি না। কিন্তু আমার এমন মনে হচ্ছে কেন?

এর জবাবে হেনরী আর্নল্ড হামলেট থেকে একটি উদ্ধৃতি শুনিয়াছিলেন—ডক্টর অফ ফিলসফি তার দর্শনের মাধ্যমে যে স্বপ্ন দেখতে অক্ষম তাও নাকি দুনিয়ায় সম্ভব।

আদোপাশ্ব কিছুই বোঝা যায় না। উঠে আসছিল ক্রাউস। তাকে আবার ফিরে ডাকল আর্নল্ড, বাই না এয়ে ডক্টর, এই ফটোগুলো দেখুন তো। ঐসের কাউকে চেনেন?

হান তিন-চার ফটো বার করে দেখায়। ক্রাউস ছবিগুলো উল্টেপাল্টে দেখে। আর্নল্ড বলে, ঐসের কাউকে কখনও লস আলামোসে দেখেছেন? দরুন প্রফেসর কার্ল-এর বাড়িতে?

—হ্যা, ঐকে দেখেছি। ঐকে চিনিও। ঐর নাম ডক্টর আলেন নান মে।

—আর দুজনকে?

—না চিনি না। কিন্তু কেন বলুন তো? কে ঐরা?

—আপনি খবরের কাগজ পড়েন না?

—বিশেষ নয়। কেন?

—ডক্টর আলেন নান মে-র নাম এ সম্বন্ধে প্রতিদিন খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে। সেগেননি?

—না। কেন? তিনি কি নতুন কিছু আবিষ্কার করেছেন?

—না। বাড়ি গিয়ে ক-দিনের পুরানো খবরের কাগজ উল্টে দেখবেন। আর একটা কথা। এখানে, এই হারওয়ার্ডে—বিশেষ করে প্রফেসর কার্ল-এর বাড়িতে অস্বাভাবিক কিছু দেখলে আমাকে গোপনে এসে জানিয়ে যাবেন।

অবাক হয়ে যায় ক্রাউস। বলে, কেন বলুন তো? কী ব্যাপার?

আর্নল্ড জবাব দেয় না। ব্যাক থেকে ধানকচক 'লণ্ডন টাইমস' নিয়ে ঠুঞ্জে দেয় ওর হাতে। বলে, শুধু নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পড়লেই চলবে না ডক্টর, একটু-আধটু দুনিয়ার খবরও রাখতে হবে। যান, এগুলো পড়ে দেখুন। আপনার প্রশ্নের জবাব ওতেই পাবেন।

তা পেল ক্রাউস। কাগজে সাড়ম্বরে বার হয়েছে আলেন নান মে-র গুত্তরগুত্তির কাহিনী। তার দিন সাতেক বাসে ঘটল ঘটনাটা। অদৃশ্য একটা অভিজ্ঞতা।

কী একটা কাজে ক্রাউস এক সম্ভ্রাহায়ে লগনে গিয়েছিল। একাই মাসে দু-একবার সে এভাবে শহরে যেত। সঙ্গে নিয়ে যেতে লম্বা লিস্ট। হারওয়ার্ড-মিসেসের নানান শৌখীন জিনিসের অর্ডার। কোন কোন দিন রবিবারটা সে লগনেই কাটিয়ে আসত—কোন হোটেলে। সেবার কী মনে হল, ও ফিরে আসবে বলে স্থির করল। সাউথ কেনসিংটন স্টেশনের নিকে যাচ্ছে, হঠাৎ পথের মাঝখানেই ওকে লাকড়াও করলেন প্রফেসর কার্ল, কোথায় চলেছ হে?

—হারওয়ার্ডেই ফিরব। আপনি এখানে?

—ওয়েয়েলেতে গিয়েছিলাম। জি. ই. সি. কোম্পানিতে। কাজ মিটে গেল, এখন ফিরে যাচ্ছিলাম। প্রফেসর কার্ল গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। নিজের গাড়ি। এখানে এসে কিনেছেন। নিজেই ড্রাইভ করছেন। ফুক্স উঠে বসল ওর পাশে। মালপত্র তুলে দিল পিছনের সীটে।

—প্যারামুসেটার কী হবে হে? তুমি তো ব্যাচিলার।

—ওটা মিসেস ফটের অর্ডার। ডাক্তারবাবুর ব্যাকার জন্য।

—বেশ আছ তুমি। এবার নিজের ল্যাভটা কাটো। আমাদের বলে নাম দেখাও।

ক্রাউস হাসল। জবাব দিল না।

শহর ছেড়ে শহরতলীতে এল ওরা। ক্রমে অক্সফোর্ডের দিকে ফাঁকা রাস্তায় পড়ল। বেলা তখন পাঁচটা। গ্রীষ্মকাল। সূর্য অস্ত যেতে তখনও ঘণ্টা চারেক। বেশ রোদ আছে। ফাঁকা অ্যাসফল্টের রাস্তায় পড়ে পিঁড় বাক্সলেন প্রফেসর। বললেন, অনেকদিন আমার বাড়ি আসছ না তো। কেন?

কী বলবে ক্রাউস? প্রফেসর কার্ল-এর বাড়ি তাকে টানে; কিন্তু ইচ্ছে করেই সে এড়িয়ে চলে। রোনটার মুখোমুখি ঈড়ালেই আজকাল সে বিরেকের দংশন অনুভব করে। রোনটা দিন দিন তেমন বেন হয়ে যাচ্ছে। বেশ রোপা হয়ে গেছে। মানসিক অবসাদে ভুগছে যেন। সেখানেই মনে হয়, মেয়েটা অসুখী। ওর নীরবতাকে পাত্তা না দিয়ে প্রফেসর আবার বলেন, সময় পেল এস। মাঝে মাঝে তোমাকে দেখলে রোনটা তবু একটু খুশি হয়।

—কেমন আছে সে আজকাল?—মাঝুলী প্রশ্ন।

—ভাল নেই ক্রাউস। মাঝে মাঝে বিট হচ্ছে আজকাল।

—বিট হচ্ছে। কেন? ডক্টর ফট দেখেছেন? কী বলছেন তিনি?

—বলছেন মানসিক অসুখ। সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে দেখাতে বলছেন।

—অশ্রুর্ষ তো। এ খবর তো জানতাম না।

—এস একদিন, কেমন? কালই এস না। কাল তো রবিবার। আমার ওখানে ডিনার খাবে। ডক্টর ফুক্সের সঙ্গেও আলাপ হয়ে যাবে।

—ডক্টর বুনো কে?

—কাল এস। আলাপ করিয়ে দেব।

সূর্য পশ্চিম দিকলয়ে হেলে পড়েছে। সড়ক জনমানব শূন্য। অক্সফোর্ড ব্রোড ওয়া তখন গেরার্ড ক্রস আর বেকমফিল্ডের মাঝামাঝি। সন্ধ্যা তখন ঠিক ছটা বেজে সাত মিনিট। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ কী একটা বস্তু এসে প্রচণ্ড আঘাত করল সামনের উইণ্ডস্ক্রীনে। টোঁচির হয়ে ফেটে গেল সেটা। গাড়ি তখন ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে যাচ্ছিল। ক্রাউস ফুকস্ এ আকস্মিক ঘটনায় একেবারে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যেন। প্রফেসর কিন্তু নিবিকারভাবে মাইল তিনেক অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে এলেন। তারপর গাড়ি থেকে নেমে ভাঙা উইণ্ডস্ক্রীনটা পরীক্ষা করে বললেন—ইট মেরেছে কেউ।

ততক্ষণে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে ক্রাউস। ইতিমধ্যে সে লক্ষ্য করে দেখেছে, ড্রাইভার আর তার সীটের মাঝামাঝি খাড়াশিষ্ট গদির মাঝখানে একটা নিটোল ছোট গর্ত হয়েছে। তার ভিতর অতুল চলিয়ে সে উদ্ধার করে আনল একটা ছোট্ট সীসার গোলক। বললে, না। একটা রাইফেল থেকে ছোঁড়া হয়েছে এটা।

প্রফেসর কার্ল গুলিটাকে হাতে নিয়ে পরীক্ষা করলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বললেন, ঠিক বলেছ। এটা রাইফেলের গুলি বলেই মনে হচ্ছে। নিশ্চয় কোন শিকারীর কাণ্ড। পরগোশ মন্বন্তে গিয়ে আমাদের শেষ করে ফেলেছিল একেবারে।

পাহাড়ের উপরে চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন। খুঁজতে থাকেন শিকারীকে।

ক্রাউস বললে, বুলেটটা দিন। ওটা আর্নল্ডকে দেখাতে হবে।

—শাগল। যুগ্মক্ষেত্রেও এ কথা ওকে বল না। বাঘে ঝুলে আঁঠুর যা। আমাদের ধরে টানটানি শুক করবে। নাও ওঠ। চল, ফেরা যাক।

ফুকস্ গাড়িতে ওঠে না। বলে, প্রফেসর, আপনি একটা কথা খোয়াল করছেন না। এখানে বাঘ হরিণ বা বাইসন নেই। খরগোশ মারতে শিকারীরা এ অঞ্চলে আসে বটে, কিন্তু খরগোশ শিকারে কেউ এ জাতীয় বুলেট ব্যবহার করে না।

তু দুটি ঝুঁকতে যায় প্রফেসর কার্লের। গম্ভীর হয়ে বলেন—কী বলতে চাইছ তুমি?

—আমি বলতে চাইছি, কেউ আপনাকে অথবা আমাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে একটা রাইফেল থেকে ফায়ার করেছে। নবরটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখনই গিয়ে আমাদের আর্নল্ডকে সব কথা বলতে হবে।

দু-এক মিনিট চুপ করে বসে থাকেন প্রফেসর। তারপর গম্ভীরভাবে বলেন, আমার সেটা ইচ্ছে নয়।

—আমি এক শর্তে ব্যাপারটা গোপন রাখতে রাজী আছি।

চমকে মুখ তুলে ওর দিকে তাকালেন প্রফেসর কার্ল—কী শর্ত?

—আপনি যদি স্বীকার করেন, আমাকে নয়—আপনাকে গুলি করতেই হত্যাকারী গুলিটা ছুঁতে হবে।

—যাঃ। তা কেমন করে জানব আমি?

—আপনি জানতেন। না হলে উইণ্ডস্ক্রীনটা চুরমার হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি ত্রেক কবতেন।

এমন দশ মিনিট পাগলের মত ড্রাইভ করে এসে তিন মাইল দূরে গাড়ি পাড় করিয়ে পাহাড়ের উপর শিকারীকে খুঁজতেন না।

মুখটা সাদা হয়ে গেল প্রফেসর কার্লের। জবাব দিতে পারলেন না তিনি।

—দ্বিতীয়ত, ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না—রাইফেল দিয়ে এমন বুলেটে যে খরগোশ শিকার করা হয় না, তা আপনারও জানা ছিল। এবং তৃতীয়ত, আমি খটনাচড়ে এ গাড়িতে উঠেছি। হত্যাকারী অনেক আগে থেকেই এখানে আপনার পথ চেয়ে বসে আছে। আমি যে এ-গাড়িতে ফিরব—তা সে আপনাকে জানত না। জানতে পারে না।

আবার অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন প্রফেসর কার্ল। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, লেইং ফুকস্। প্রত্যেকের জীবনেই এমন কিছু অঘাট থাকে যা অন্যকে বলা যায় না। আমি স্বীকার করছি—আমাকে হত্যা করবার জন্যই রাইফেলধারী এ কাজ করেছে। কিন্তু আমি চাই না সৌ। উই:

কম্পনের আর্নল্ড জানতে পারুক। সময় হলেই আমি তাকে বলব। কথা দাও, তুমি নিজে থেকে কিছু বলবে না।

—বেশ। জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ-কথা তাকে জানাব না।

—কনবাদ।

এতদিনে একটা সমস্যার সমাধান হল ক্রাউস ফুকসের: কেন ওর মনে হত একজোড়া অদৃশ্য চোখ ওদের দিবারাত্র পাহারা দিয়ে চলেছে। অদৃশ্য চোখের শিকারী সে নয়, রোনটা নয়—প্রফেসর অটো সার্ন।

পরদিন প্রফেসর কার্ল-এর বাসায় গিয়ে আলাপ হল আর একটি পরিবারের সঙ্গে। ডক্টর বুনো পলিকার্ডো। প্রফেসর কার্ল-এর বন্ধু—বন্ধু ঠিক নয়, বরষে অনেক ছোট। ক্রাউস-এর চেয়েও দু বছরের ছোট। সে সপরিবারে এসে উঠেছে প্রফেসর কার্ল-এর বাসায় অতিথি হয়ে। নামকরা নিউক্লিয়ার ছোট। প্রফেসর কার্ল অত্যন্ত ঘেঁহু করেন তাকে। হারওয়ার্ডে তার যাতে একটি চাকরি হয় তার মিডিসিট। প্রফেসর কার্ল অত্যন্ত ঘেঁহু করেন তাকে। হারওয়ার্ডে তার যাতে একটি চাকরি হয় তার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ক্রাউস থাকে ব্যাডলার্স ডব্লিউরিটে, কিন্তু প্রফেসর কার্ল পাচ-কামরার বাঙালো পেয়েছেন। সতসাবে তো কুন্ডে দুটি প্রাণী—স্বামী-স্ত্রী। তাই বাকি দুখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছেন বুনো পরিবারকে।

বুনো ইটালিয়ান। ভদ্র পীসায়। বৃহৎ পরিবারের সন্তান। সাত আটটি ভাইবোন। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা পৃথিবীতে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ত্রিযন্ত্র ছিল এনরিকো ফের্মি। তার অধীনে গবেষণা করেছে রোম থাকতে। সেখান থেকেই ডক্টরেট করে। পরে চলে আসে পরীতে। সেখানে জোন্স ও কুটির গবেষণাগারে রিসার্চ করে। এখানেই সে বিবাহ করে—হেলেনকে। তার কুমারী জীবনের নাম হেলেন মেরিয়ান। সুইডেনে বাড়ি। স্টকহোমে ছিল তার বাপ মা। ওদের তিনটি সন্তান—জিল, টিটো আর অ্যান্টোনিও। অ্যান্টোনিও সবার ছোট। বছর দেড়েকের ছুটফুটে বাচ্চা। তিন বাচ্চাকে লেয়ে রোনটার বজিত মাতৃহ যেন এতদিনে একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে। হেলেনকে সে সব সাহা-সাহিত্য থেকে মুক্তি দিয়েছে। তিন বাচ্চা নিয়ে মেতে আছে রোনটা।

ডিনারের আসর জমিয়ে রাখল বুনো একাই। নানান গল্পে, চুটকি হাসিকাতায়। রোনটা বাচ্চাদের নিয়ে মেতে আছে, ক্রাউস-এর সঙ্গে ভাল করে কথা বলার সময়ই যেন নেই।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুজন পরিচিত ব্যক্তি—সতীক ডক্টর বট এবং সিকিউরিটি অফিসার আর্নল্ড। খানাপিনা মিটেতে বেশ রাত হল। বিদায় নিয়ে বের হবার সময় আর্নল্ড বলল, ডক্টর ফুকস্ আসুন আমার গাড়িতে। আপনাকে শৌছে নিয়ে যাই।

—চলুন।

গাড়িতে উঠে আর্নল্ড বললে, কেমন লাগল এই বুনো পরিবারকে?

—চমৎকার। ডক্টর বুনো তো খুবই অমায়িক লোক। খুব হাসি খুশি, আমুদে। তরলোক এখানে চাকরি পেলে আমাদের জীবনযাত্রাটাই বদলে যাবে।

—তা হবার নয় ডক্টর। পূর্ব সন্ধ্যা ডক্টর বুনো এখানে চাকরি পাবেন না।

—কেন? উনি তো অত্যন্ত পণ্ডিত।

—পণ্ডিতের জন্য আটকাবে না। ওর ক্রিয়েটেল পাওয়া শক্ত।

ক্রাউস ধকল দিয়ে ওঠে, এই আপনাদের এক ব্যক্তিক। সব কিছুতেই বাজাবাড়ি। সবাইকে শুধু সামলহ করেই জীবনটা গেল আপনাদের—

—কী কত বলুন? এটাই তো আমাদের চাকরি। ডক্টর বুনোকে চাকরি দেওয়ার মানে হয়তো আপনার মত একজন নিরীহ বৈজ্ঞানিকের প্রাণ বিপন্ন করা।

—আমার? কেন, আমার প্রাণ বিপন্ন হতে যাবে কোন দুশয়ে?

—কোন দূর থেকে কেউ হয়তো একটা রাইফেল তাক করল ডক্টর বুনোকে বধ করতে। লভ রোজের রাইফেল। এবং গুলিটা আপনার সীটের আরও চৌদ্দ ইঞ্চি ডাইনে সরে এসে বিধল। আপনাকে বাচ্চাতে পারব তাহলে?

স্বস্তিত হয়ে গেল ক্রাউস। ব্যাপারটি হল না তার। আর্নল্ড নিজেই হেসে বলল, কই, নামুন এবার। আপনাদের বাসার এসে গেছেন যে।





এই ঘটনার বাস্তবানুক পূর্বে হঠাৎ মুক্তিপত্রের সম্ভাবনা পেলে ক্রাউস ফুকস্। নতুন করে বাচবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিল অচমক্য। ওর বাবা প্যান্টের এমিল ফুকস্ ওকে কিয়েল থেকে হঠাৎ একটা চিঠি লিখে এই নতুন জীবনের ইঙ্গিত পাঠিয়েছেন। ডক্টর এমিল ফুকসের বয়স তখন আশির কাছাকাছি। যুদ্ধ চলায় সময় তিনি দীর্ঘদিন নাৎসী বন্দীশিবিরে কাটিয়েছেন। যুদ্ধের মুক্তি পেয়ে চলে গেছেন কিয়েল-এ। এখন সেখানে চার্চের যাজক তিনি। এই কিয়েল-এই একসময় পড়ত ক্রাউস। বুদ্ধ চিঠিতে জানিয়েছেন, কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর ক্রাউস ফুকসকে পদাধিন্যাস অধ্যাপকপদে বরণ করতে ইচ্ছুক। সে যদি তার বর্তমান চাকরি ছেড়ে দেয় এবং ন্যাশনালিটি পরিবর্তন করতে রাজী থাকে তবে এই বুদ্ধ বয়সে তিনি পুত্রের কাছাকাছি থাকতে পারেন।

ক্রাউসের জীবনে এ বুদ্ধের অঙ্গমান অসামান্য। এই দুনিয়ায় সে যে-কোন মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা করে তার অন্যতম তার জনক-এ পান্টরী ফুকস্। সারা জীবন তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। একা হাতে। নাৎসী অত্যাচারের চূড়ান্ত হয়েছিল ওদের পরিবারে—যদিও ওরা ইহুদী ছিল না। ক্রাউসের মা সে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন, ক্রাউসের ছোটবেলাও আত্মহত্যা করে। ক্রাউসের দাদা নিকটস্থ হয়ে যায়। তবু দীর্ঘরে বিশ্বাস হাবাননি বুদ্ধ। আত্মীয়ে একা হাতে লড়াই করে গেছেন। ক্রাউস নিজে জার্মানী থেকে পালিয়ে আসার বুদ্ধকে কোনভাবেই সাহায্য করতে পারেনি। তাই বুদ্ধ পিতার আত্মনে সে বিচলিত হয়ে উঠল। বুদ্ধ অবশ্য কিয়েলে একা থাকেননা। মানুষ করেছেন ওর মা-হারা একমাত্র নাতিতিকে। ও যদি কিয়েলে গিয়ে অধ্যাপনা শুরু করে, সংসার পাতে, তাহলে এ নাবালকটিরও ব্যবস্থা হয়। এ বিষয়েও এই বুদ্ধটি বিচলিত।

পিতৃদেবের চিঠিখানি নিয়ে সে গিয়ে দেখা করল হারগয়েলের সর্বময় কর্তা স্যার জনের সঙ্গে। স্যার জন বাস্তববাদী। সোজা কথাই মানুষ। বললেন, হারগয়েলের তিন-নব্বয়ের চাকরির চেয়ে নিয়মসম্মত কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ আকর্ষণীয়। কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন আছে। তুমি কি নিজেই ন্যাশনালিটি বদলাতে প্রস্তুত? কিয়েল বর্তমানে রাশিয়ান গভর্নমেন্টের এজিন্যারে। কমুনিজমকে মেনে নিতে পারবে তো?

ভেবে দেখি—বলে ফিরে এসেছিল ক্রাউস।

এরপর দেখা করেছিল প্রফেসর কার্ল-এর সঙ্গে। রোনাল্ডি খুব খুশি হয়েছে এমন ভাব দেখালো। বললে, নিশ্চয়ই নেবে এ চাকরি। প্যান্টরী ফুকসকে এই শেষ সময়ে কে দেখবে, তুমি ছাড়া? তাছাড়া বব-এর কথাটাও ভাবা দরকার। কিয়েলে গিয়ে সংসার পেতে বস। আর একটা কথা। বিয়ে কর এবার। তাহলে বব-এর একটা হিচ্চ হয়ে যায়।

—আর আমি যদি বাবাকে লিখি ববকে এখানে পাঠিয়ে দিতে?

—তুমি মানুষ করতে পারবে? একা?

—কেন? তুমি তো আছ! ও তোমার কাছে থাকবে।

—দেবে আমাকে? —উৎসাহ উপচে পড়ে রোনাল্ডির মু-চোখে। তারপরেই হঠাৎ সে কেমন বললে যায়। বলে, কী স্বার্থপরের মত কথা বলছি। তা কেন? তুমিই বব! কিয়েলে চলে যাও। সংসারী হও।

—প্রফেসর কার্ল কী পরামর্শ দেন?—ক্রাউস জিজ্ঞাসা করে।

—আমার আদৌ এতে সম্মতি নেই—প্রফেসর কার্ল-এর সাফ জবাব।

—কেন?

—সেটা পরে তোমাকে বলব।

রোনাল্ডি চট করে উঠে দাঁড়ায়। বলে, পরে কেন? এখনই বল! আমি চলে যাচ্ছি।

—না না, তা বলিনি আমি। — প্রফেসর বিব্রত হয়ে ওঠেন।

রোনাল্ডিও হেসে হালকা করে পরিকেশটা। বলে, না, রাগ করে উঠে যাচ্ছি না। কক্ষি করে আনি।

প্রফেসর কার্ল তৎক্ষণাৎ বলেন, ক্রাউস, তুমি ডক্টর কাপিৎসার নাম শুনেছ? ফুকস্ হোসে বলে, স্যার, দুনিয়ার এমন কোন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট আছে যে, লর্ড রাদারফোর্ডের শ্রেষ্ঠ ছাত্রটির নাম শোনেনি।

—তিনি—কেন কোথায় জান?

—ঠিক জানি না। আন্দাজ করতে পারি। মস্তো অথবা লেনিনগ্রাডে—কিয়েভেও হতে পারেন। ডক্টর কাপিৎসা আজকের রাশিয়ার সবচেয়ে বড় নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট।

—তোমার দ্বিতীয় বক্তব্যটা ঠিক, প্রথমটা নয়। ডক্টর কাপিৎসা বর্তমানে আছেন সাইবেরিয়ার। বন্দীজীবন গাপন করছেন তিনি। তার অপরাধ, জার্মানের হুকুমে তিনি অ্যাটম-বোমা বানাতে বন্দীক্য করেছিলেন। বলেছিলেন এজন্য লর্ড রাদারফোর্ড প্রোটন আবিষ্কার করেননি।

বিশ্বাস হতবাক হয়ে যায় ক্রাউস। অশ্রুটি বসে, আমি বিশ্বাস করি না। কী করে জানলেন?

—কী করে জানলাম সেটা বলব না। তবে আমার কথা অজান্তে সত্য বলে মনে লাগে।

ডক্টর কাপিৎসা ছিলেন লর্ড রাদারফোর্ড-এর ডান হাত। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাদারফোর্ড-এর তখন তিনজন শিষ্য প্রতিভার স্বাক্ষরে ভাস্কর—কাপিৎসা, চ্যাডউইক আর অটো কার্ল। সে হিসাবে প্রফেসর কার্ল হচ্ছেন কাপিৎসার সতীর্থ। এর মধ্যে কাপিৎসার সম্ভাবনাই ছিল সবচেয়ে বেশী। যদিও বাস্তবে চ্যাডউইকই সবচেয়ে নাম করেছেন—নিউট্রন আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কারে হয়েছেন।

কাপিৎসা ছিলেন প্রাণবন্ত, উজ্জল। রাদারফোর্ড-এর সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র। রাদারফোর্ড ছাত্রকে একটি সুন্দর ল্যাবরেটরি বানিয়ে দিয়েছিলেন। কাপিৎসা সেই ল্যাবরেটরির প্রবেশ পথে বসিয়েছিলেন একটি ফর্দাশ্রুতি—বিখ্যাত ইরাক ভাস্কর এরিক গিলকে দিয়ে। একটি কুমীরের মূর্তি। কুমীর কেন? সাংবাদিকরা প্রশ্ন করল রাদারফোর্ডের বিন। কাপিৎসা গম্ভীর হয়ে বললেন—‘কুমীর কখনও ঘাড় তেবোতে পারে না। সে নিশে সামনের দিকে চলে। সেই হচ্ছে আমার বিজ্ঞান সাধনার প্রতীক।’

সাংবাদিকরা অবাক হয়। প্রফেসর রাদারফোর্ড তাদের জনান্তিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—আমার ছাত্রটির মাথায় দু-গায়েট্টে শুঁ আঁল্লা।

এবার সাংবাদিকরা হেসেছিল।

হেসেছিল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও। মুখ লুকিয়ে। তারা জানত, জনান্তিকে কাপিৎসা রাদারফোর্ড-এর নতুন নামকরণ করেছে—‘কুমীর-সাহেব’। রাদারফোর্ড তা জানতেন না, কিন্তু ল্যাবরেটরির বেয়ারটা পর্যন্ত জানত এ শুভবাহিনী। কাপিৎসা তাই তার বিজ্ঞানমন্দিরে বসি’য়ে কুমীরের মূর্তি—ভরদক্ষিণ্য।

নতুন ল্যাবরেটরির উদ্বোধন হল 1933-এ। ঠিক তার পরেই রাশিয়া থেকে একটি আর্মস্ত্রন পেয়ে কাপিৎসা খেল ভ্রমশে। মস্তো বিজ্ঞান-অধিবেশনে যোগ দিতে। সেটিই হ’ল ওর সর্বনাশের সূত্রপাত। ফিরে আসতে দেওয়া হলনা কাপিৎসাকে। জার্মান জানালেন, অতঃপর ওকে রাশিয়াতে থেকেই বিজ্ঞানচর্চা করতে হবে। কাপিৎসা নিজের জন্মভূমিতে অন্তর্গত হল। গোপনে সে খবর পাঠালো রাদারফোর্ডের কাছে—জানালো, সে কেমব্রিজে ফিরে আসতে চায়। তার নতুন ল্যাবরেটরিতে। লর্ড রাদারফোর্ড মস্তো কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখলেন। তার ছাত্রকে ফিরে আসতে দেবার অনুমতি দেওয়া হক। রাশিয়ান সরকার হস্তান্তরে লিখল—ইংলণ্ডের পক্ষে একথা লেখা খুবই খাবারিক। তারা খুশি হবে কাপিৎসা যদি কেমব্রিজে পবেষণা করেন। অনুরূপভাবে আমরাও খুশি হব, যদি লর্ড রাদারফোর্ড মস্তোতে এসে পবেষণা করেন।

রাদারফোর্ড এরপর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কন্টউইনের দ্বারস্থ হলেন। লর্ড রাদারফোর্ডের অনুরোধে কন্টউইন সরকারী পর্যায়ে এ অনুরোধ জানালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কাপিৎসার এক আত্মীয়া লণ্ডনে সেভিয়েট এম্বাসীতে গিয়ে স্বয়ং আত্মসম্ভারণকে নাকি বলেছিলেন, এভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাপিৎসাকে অপনোদ্য কিছুতেই অটিকে রাখতে পারেন না। ওর মাথা পাখের মত শক্ত। বুঝেছেন?

রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত নাকি জবাবে হেসে বলেছিলেন, ফর গোর ইনফরমেশন ম্যাজাম, জোসেফ জার্মানের মাথাটাও জেলির মতো নয়।

রাদারফোর্ডকে লেখা কাপিৎসার শেষ চিঠিটার (1933) ছিল একটা বিজ্ঞানোত্তর দার্শনিক তত্ত্ব : After all, we are only small particles of floating matter in a stream which we call Fate. All that we can manage is to deflect our tracks slightly and keep afloat:—the stream governs us.



এত বাই বলুন, আমরা প্রবহমান খরস্রোতে ভাসমান তুঃখঃ বইতো নই। এই স্রোতটাই অপর নাম নিয়ম। বড় জোর স্বভাবটোর মত একটি এপাশ-ওপাশ সরে-নড়ে বেড়াতে পারি, বোম্বাইয়ে ভেঁসে থাকতে পারি—আমাদের গতি নিয়ন্ত্রিত হলে এই স্রোতেরই নির্দেশেই।

এরপর রাবারফোর্ড যা করে বললেন তা তাঁর মত আন্তঃজালা বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই শুধু সম্ভব। তিনি কালিৎসার জন্য তৈরী সদস্যমাণ্ড ল্যাবরেটোরি সব যন্ত্রপাতি তৈরী ফেললেন। বড় বড় সেন্টে সমস্ত যন্ত্রপাতি ভরে পাঠিয়ে দিলেন মস্কোতে। রাশিয়ান সরকারকে লিখলেন—কালিৎসার সঙ্গে কেমব্রিজ ল্যাবরেটোরি অঙ্গারী সম্পর্ক। এটা রাজনীতির কথা নয়, বিজ্ঞানের হিসাব। ও আপনারা বুঝবেন না তাই কালিৎসা যখন আসতে পারল না, তখন কেমব্রিজই তাঁর কাছে যাক।

এসময় তিনি জাহাজে করে পাঠিয়ে দিলেন সেই পাথরের কুড়ীর মুক্তিচাকর।  
মস্কোর সেন্টার ষ্টাচার মনো 'রাধাকৃষ্ণ' পড়েছিল কিনা পশ্চিম দুনিয়া সেকথা জানতে পারেনি। এরপর লৌহ যবনিকার এপারে বহির্বিষে কালিৎসার কঠোর মাত্র একবার শোনা গিয়েছিল। 1946-এ। বিকিনি আটলে যখন আমেরিকা পার্মোনিউক্লিয়ার বোমার বিক্ষোভ ঘটালো তখন কালিৎসার একটা বাধী কেমন করে জানি লৌহ যবনিকা ভেদ করে এপারে আসে। কালিৎসা গিয়েছেন।

"To speak about atomic energy in terms of atomic bomb is comparable with speaking about electricity in terms of electric chair."

[পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ হিসাবে যাঁরা পারমাণবিক-বোমার কথাই শুধু চিন্তা করতে পারেন, তাঁরা যোমকরি বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োগ-হিসাবে ইলেকট্রিক চেয়ারের কথাই শুধু ভাবেন।]

অনেক পরে জানা গেছে কালিৎসা সোভিয়েট সরকারের নির্দেশে বেশ কিছুদিন তাঁর বিজ্ঞানমন্ডিরে কাজ করেন। সরকারের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিরোধ বাধল যখন নির্দেশ এল এবার পরমাণু-বোমা বানাতে হবে। বিরোধ ঘনীভূত হল; কারণ কালিৎসা অস্বীকৃত হলেন। তাঁর চাকরি যার। এই বিজ্ঞানমন্ডিরে প্রবেশের অধিকার খোয়ালেন কালিৎসা। এরপর গৃহবন্দীর জীবন। তবু জালিনের প্রভাবে স্বীকৃত হলেন না তিনি। তাঁর সাফ জবাব—এজন্য তাঁর গুরু রাবারফোর্ড অথবা গুরুভাই চ্যাডউইক পরমাণুর স্বয়ং বিদীর্ণ করেননি। বলেছিলেন, এই উদ্দেশ্যে পরমাণুর জ্বর বিদীর্ণ করার আগে আমি নিজের হৃৎপিণ্ডটা বিদীর্ণ করব।

জালিনের আসেশে কালিৎসাকে নির্বাসনে পাঠানো হল। টেস্টটিউব, বুয়েট আর সাইক্লোট্রোন নিয়ে গৃহ জীবন কেটেছে এবার তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল গাইতা আর হাতুড়ি। সম্রাট কারাগার।

কালিৎসার সমাধি কোথায় কেউ জানে না।

...বীথ কাহিনী শেষ করে প্রফেসর কার্ল বলেন, আই হেট দীজ্ কম্যুনিষ্টস্। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তুমি কয়েল-এ চলে যেও না। তার চেয়ে অনেক-অনেক ভাল হারওয়ার্ডের এই তিন নম্বর চাকরি। এখানে আমরা মানুষের কল্যাণের জন্য প্রাণপাত করছি। স্যার জন তো এ বছরেই অবসর নিচ্ছেন। আমি আর কদিন? হয়তো তিন-চার বছরের ভিতরেই তুমি এখানকার কর্তব্যর হয়ে বসবে। তা হ্যাঁ—বাধা দিয়ে ক্লাউস বলে, প্রফেসর, আপনি কালিৎসার সম্বন্ধে এত কথার শেলেন কোথায়? প্রফেসর কার্ল একটি বিব্রত হয়ে বলেন, সে যেখান থেকেই পাই।

—তবু বলুন না।

—না। বলার বাধা আছে। তবে যা বলছি তা নিছক সত্য।

—আপনি শুনেছেন একপক্ষের কথা। সোভিয়েট-বিরোধীদের প্রচার।

—না না। আই হ্যাভ হার্ড ইট প্রম দা হার্সে মাইথ। খাটি লোকের মুখ থেকে

—কিন্তু কে সেই খাটি লোক?

এই বক্তব্য সময় এর বেশি আমি জানতাম না। বর্তমান বছরখানেক সময় জানি, কালিৎসা বয়ল হনিয়াতে বর্তমান (1981)। তারিখ নতর লিখিয়া তিনি নতনভাবে সম্মানিত হন। 1978 সালে কালিৎসা পরাবৈজ্ঞানিক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

—এম

—কার্ল: জে—তা কলা চলে না তোমাকে।—প্রায় ধর্মবৈতনিক সূত্র: বলেন উনি।

ক্লাউস চুপ করে যান। প্রফেসরও একটি বিব্রত হয়ে পড়েন। একেবারে অন্য সুরে বলেন, ও চেয়ে তুমি তোমার কোনসো কণ-কে নিয়ে এস। সে আমাদের পরিবারেই থাকবে। বোনটির একটা অবদান হবে। আর তাহাড়া—

আবার চুপ করে যান। ইতস্তত করেন। শেষ পর্যন্ত মনের খিঁচি খেড়ে ফেলে বলেন, তুমি চলে গেলে ও একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়বে। ও তোমাকে খুব ভালবাসে।

ঠিক সেই মুহুর্তেই ককির ট্রি হাতে নিয়ে এ ঘরে আসছিল বোনটি। কথাটা কানে গেল তার। ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। আর এ ঘরে এল না। পর্দা সরিয়ে একটি পরে বোনটির মেড-সার্ভেণ্ট ডরোথি ককির ট্রি নিয়ে প্রবেশ করল। সেদিন আর বোনটি ওদের সামনে আসে। এসে দাঁড়াতে পারেনি।

কিন্তু দিন-দিনের পরে সে এসে দাঁড়ালো ফুকস্-এর মুখোমুখি। জনান্তিকে। বলল, ব্রীজ ক্লাউজ, তুমি ঐ চাকরি নিয়ে কিয়ল চলে যাও।

ক্লাউস অবাক হয়। বলে, কেন বলতো? তোমার পরজ কী?

বোনটির কঠোর একটিও কামল না। সে স্পষ্ট গলায় পরিবার ভাষায় বললে, তুমি বুঝতে পার না? আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তোমার ঘরে চলে যাওয়াই মঙ্গল। তোমাকে আমি ভুলতে চাই। তোমাকে—তোমাকে আর সহ্য করতে পারছি না আমি।

কী জবাব দেবে বুথে উঠতে পারে না ক্লাউস। চট করে সে উঠে দাঁড়ায়। হ্যাট-বাক থেকে টুপিটা নিয়ে বললে, চলি।

তারপর পরজের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে বললে, তুমি আজ উত্তেজিত। না হলে আমিও মন বুলে দু-একটা কথা বলতাম।

—সহ্য সমাহিত স্বরে বোনটি বললে, কেন? আমাকে কি উত্তেজিত মনে হচ্ছে?

—হাঁ। তুমি জোর করে তোমার উত্তেজনটা ঢেকে রেখেছো।

—ফোটেই নয়। তোমার কিছু বলার থাকলে ইচ্ছা করে বলতে পার। আমি প্রস্তুত।

ক্লাউস ফিরে এসে বসে তার চেয়ারে। বলে, সব কথা প্রফেসরকে ফুলে বললে কেমন হয়?

—সব কথা মানে?

—তুমি ঠাক ডিভোর্স করতে চাও। আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই। বিদ্যুৎশুটের মত উচ্চ দাঁড়ায় বোনটি। বুখার্না সাধা হয়ে যায় তার। ট্রেট দুটো নড়ে ওঠে। তারপর সে অসীম বাতাস আত্মসম্বরণ করে। স্পষ্টভাবে বলে, এ কথা আর কোনদিন উচ্চারণ কর না।

বীথ পরে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। ক্লাউস লিঙ্ক থেকে বলে, কারণটা বলে যাবে না?

ছাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে বোনটি। বলে, প্রয়োজন ছিল না। মশ বছর আগে কারণটা তুমিও বলনি। তবে প্রশ্ন যখন করলে তখন আমি কারণটা জানাব। আমি মনে-প্রাণে রোমান ক্যাথলিক। দিবার আমার কাছে ইব্রিখড ব্যক্তিচাকের একটা পাসপোর্ট নয়। তুমি যা ভাবছ তা নয়। প্রফেসরকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি—ঠিক যতটা আমার বাবাকে ভালবাসতাম।

ক্লাউস আরও কিছু কথা বলতে চায়। কিন্তু তাকে ধারিয়ে দেয় বোনটি। আমার মনে হয়, এর পর তোমার এ ব্যক্তিতে না আসাই মঙ্গল।



॥ চার ॥

বুনো পলিগার্ডোর চাকরি শেষ পর্যন্ত হল না, প্রফেসর কার্লের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সফলও। তবু একটা ব্যবস্থা হল, প্রফেসর কার্ল-এর সুপারিশেই। লিভারপুল ইনস্টিটিউট থেকে একটা ভালো চাকরির অফার মিল। পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে নয়, পদার্থবিজ্ঞানীর মানুসী কাজ। তবে মাহিনাটা ভাল। বুনো এক কথাই হাঙ্গী হল। কন্যাবান জানালো প্রফেসরকে। তৎক্ষণাৎ সে লিভারপুল কর্তৃপক্ষকে জানালো অনতিবিলম্বেই সে ঐ চাকরিতে বোঁল দেবে। তবে তার আগে সে একবার ইটালিতে যেতে চায়। মিলানে আছেন তার বৃদ্ধ পিতামহ। বুজাতে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। ঐ সঙ্গে সে এত পর

204



বুনো হঠাৎ খান্না দিয়ে উঠল, বকবক কর না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।

হার্ডন তখন মনে মনে ভাবছে ওর চমকটা কি লক্ষ্য করেছে বুনো? নিশ্চয় নয়। সে তো এক-সেফেওব দশভাগের একভাগ সময় মাত্র চমকে চোখ তুলে তাকিয়েছে ওর ওলেন্ড দিকে। বুনো নিজেও নিশ্চয় চমকে উঠেছিল। সে খেয়াল করবে না। তাছাড়া বুনো হার্ডনকে হারওয়েলে কোলমিন সেখেনি। তার উপর সে ছদ্মবেশে আছে। সর্বোপরি সে বর্তমানে ফরাসী চিত্রকর, ইটালিয়ান তারা প্যানে না। ফলে বুনো নিশ্চয়ই আতঙ্কিত হবে না।

হোসেনা তার স্বামীকে বললে, এয়ারপোর্ট থেকেই সোজা বাবার ওখানে চলে যাই না কেন? বুনো বললে, সেটা ভাল দেখায় না। আমি এখনো হোটেল কঠিনেতালে আগে থেকেই ঘর বুক করে রেখেছি। হোটেলের পৌছে তোমার বাবাকে ফোন করব।

হার্ডন পাকা গোয়েন্দা। কোনও ফাঁদে পা দিতে সে প্রস্তুত নয়। সে তৎক্ষণাৎ সরে যায় 'ওয়েটিং হল'-এর অপরদিকে। পাবলিক টেলিফোন বুথে ঢুকে পড়ে। তাঁতের ঘর। ওখান থেকে বুনো পরিবারকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নজর এড়াচ্ছে না। গাইড হাতড়ে বার করে হোটেল কঠিনেতাল-এর নম্বর। ডায়াল করে সেই নম্বরে। রিসেপশন দরতাই বললে, একটু বেধে বলুন তো ডক্টর বুনো পস্টিকার্ডের নামে ঘর বুক করা আছে কিনা।

ওখানে সুকস্টী মহিলাটি বললেন, আছে। আপনিই কি ডক্টর পস্টিকার্ডো?

—না না। আমি ওর একজন বন্ধু। তাঁর সঙ্গে ওখানে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। হ্যাঁ হোক রুম নম্বরটা কত?

—825 এবং 826।

—ধন্যবাদ।

এবার নিশ্চিত হয়ে ও বেরিয়ে আসে পথে। তখনও বুনোর মালপত্র স্ট্রেনের গর্ত থেকে ওখানে এসে পৌছায়নি। একটা ট্যাক্সি নিল হার্ডন। বললে, হোটেল কঠিনেতাল।

ওখানেই উঠল সে। অটিনলাতেই ঘর পেল। 811। এটা 826-এর ঠিক উল্টোদিকে এবং স্বাস্থ্যের দিকে। মালপত্র নিয়ে ঘরে চলে গেল হার্ডন। ঘরটা বন্ধ করে গিয়ে বসল জানলার ধারে। যেখানে বসে হোটেলের প্রবেশ পথটা দেখা যায়। সূটকেশ থেকে বাইনোকুলারটা বার করল। যতক্ষণ বুনো পরিবার হোটেলের এসে না পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ ও নিশ্চিত হতে পারছে না। অসম্ভব চিন্তা করার কিছু নেই। এবান্নেই ঘর বিজার্ত করা আছে তার। ঘটনাক্রমে অপেক্ষা করে কেমন যেন সন্ধি হয়ে পড়ে হার্ডন। ব্যাপার কী? ঘরে তালা মেয়ে সে নেমে এল রিসেপশনে। কাউন্টারে যে মেয়েটি ছিল তাকে প্রশ্ন করে, ডক্টর বুনো পস্টিকার্ডোর নামে কোন বিজার্ডেশন আছে?

মেয়েটি একটি রেজিস্টার দেখে বললে, আছে। দুখানা ঘর। নাথার 825 এবং 826। আঙুই তাঁর আসার কথা। এয়ারপোর্ট থেকে তিনি ফোনও করেছেন। এখনই আসছেন বললেন।

—ধন্যবাদ। আঙু কতক্ষণ আগে তিনি ফোন করেছেন বলুন তো?

—পকুন ঘটনাক্রমে আগে।

—ডক্টর বুনো কি নিজেই ফোন করেছিলেন? না তাঁর বন্ধু?

—বন্ধু আগে করেছিলেন। তার মিলিট পনের পরে ডক্টর নিজেই ফোন করেন।

হার্ডন নিশ্চিত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল।

কিন্তু একী। আরও ঘটনা দুই কেটে গেল। বুনো এসো না। এবার আর কাউন্টারে গিয়ে কোঁজ নিতে সাহস হল না। বেশী কৌতূহলী হলে চিহ্নিত হয়ে পড়বে। ফোন করল পরপর 825 এবং 826 নং ঘরে। দু ভায়রাতেই ফোন বেজে গেল। কেউ ধরল না। অর্থাৎ ওর নজর এড়িয়ে কোন অসতর্ক মুহুর্তে বুনো পরিবার আসেনি। এতক্ষণে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে হার্ডন। চাকরির বেকর্ডে তার দাগ পড়েনি ইতিপূর্বে। এমন হাতের মুঠো থেকে শিকার ফসকালে সে মুখ দেখাবে কী করে? কিন্তু কত মনে কোথায়? তবে নিশ্চয় মিসেস বুনোর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত মত বদলেছে বুনো। সোজা চলে গেছে স্বত্ববাহিনী। এমনও হতে পারে ওর স্বত্ব হওয়াতো এয়ারপোর্টে গিয়েছিলেন। দেখা হয়ে গেছে। মেয়ে-জামাইকে পাকড়াও করে নিয়ে গেছেন। এইটাই একমাত্র সমাধান। হার্ডন ঘড়ির সিলিং হাকায়।

এই সময়োক্ত। অর্থাৎ ইতিমধ্যে চারঘন্টা হয়ে গেছে। টেলিফোন ডাইরেক্টরি হাতড়ে বার করল এ 10 নম্বর। ডায়াল করল। মহিলাকণ্ঠে কেউ বললেন, হ্যালো।

ইংলিশম্যান ভাষায় হার্ডন বলে, মিস্টার নর্ডব্রম-এর বাড়ি?

—হ্যাঁ। মিসেস নর্ডব্রম বলছি। কাকে চান?

—দেখুন, আপনি আমাকে চিনতেন না। আমি ডক্টর বুনোর একজন বন্ধু। সে আমাকে লিখেছে আজ সে এখানে আসবে—

—আমরাও তো তাই জানি। বুনো একা নয়। তার সপরিবারে আসার কথা। কিন্তু তারা তো এখনও এসে পৌছায়নি।

—কিন্তু রোম-সার্ভিস তো ঠিক সময়েই এসেছে। সে তো ঘটনা চারেক হল।

—তবে বোঝায় কোনও হোটেলের উঠেছে। আপনার নামটা বলুন। ও এলে বলব।

—কিন্তু মনে করবেন না। তাকে একটা 'সারপ্রাইজ' দিতে চাই। সে এলে মর্য্য করে ওকে বলবেন না আমি ফোন করেছিলাম।

—ও আঙু, আঙু। তবু আপনার নামটা বলুন। ও এলে আপনাকে বিং করব।

—আমি একটা পাবলিক বুথ থেকে ফোন করছি। আমি কাল সকালে নিজেই ফোন করব বরং। কতরাহি—

কিন্তু হারিটা বোঝায় 'শুভ' নয়। ও তৎক্ষণাৎ বের হয়ে পড়ল হোটেল থেকে। ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল এয়ারপোর্টে। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন ধোঁয়াটে লাগছে। ওখানকার সিকিউরিটি অফিস একে আত্মপরিচয় নিল। তার সাহায্য চাইল। আন্তর্জাতিক সৌজন্যের খাতিরে সিকিউরিটি অফিসার ওকে সাহায্য করতে রাজী হলেন। রাত সাতটার পর যে সব যাত্রীবাহী স্ট্রেন বিমান বন্দর ভাণ্ড করেছিল তার তালিকাটি দেখাই হল প্রথম কাজ। বেশী খুঁজতে হল না। দেখা গেল রাত নটার একটা স্ট্রেনে ডক্টর বুনো বনামে টিকিট কেটে সপরিবারে হেলসিন্জি চলে গেছেন। ফিনল্যান্ড যাবার পাসপোর্ট ছিল তাঁর।

সর্বনাশ। পরবর্তী স্ট্রেনে হার্ডন চলে গেল হেলসিন্জি। বুধাই। সেখানে সংবাদ পাওয়া গেল, পূর্ববর্তী স্ট্রেনে ডক্টর বুনো সপরিবারে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তারপর কোথায় গেলেন কেউ জানে না।

অনেক পরে স্টল্যাণ্ড ইয়ার্ড অনুমান করেছে—হয়, এবান থেকে রাশিয়ান এজেন্সীর সহযোগিতায় ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টে বুনো ছদ্মবেশে রাশিয়ায় চলে যায়। অথবা মটরে করে তাদের সঙ্গে সীমান্ত পার হয়ে যায়। যেটা কথা বুনোর স্বপ্ন আর পাওয়া যায়নি।

অজ্ঞান নাম মে খরা পড়ল। আর বুনো পস্টিকার্ডো—এ কাহিনীর দু-নম্বর গুপ্তচর ডগলাস, হাওয়ার্ড মিলিয়ে গেল।

সাতসকল পরে প্রাচল্য প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বুনোর অন্তর্ধান-রহস্য শেষ ঘবনিকাপাট ঘটল। জানা গেল, বুনো বহাল তবিয়তে মস্কোতে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্যে নিযুক্ত আছেন। হোসেনার সঙ্গে তার বাপ-মাতের আর কোনদিন সাক্ষাৎ হয়নি।

নিঃসন্দেহে বুনো বুঝতে পেরেছিল তাকে সন্দেহ করছে এক, বি. আই, এবং স্টল্যাণ্ড ইয়ার্ড। সিভিলসপুলে চাকরি নেওয়া, শ্যামনীতে কনফারেন্সে যাবার প্রতিক্রিয়া, রোমে রিটার্ন টিকিট-কটা, স্টকহোমের হোটেলের দুখনি খর ভাড়া করা সবই তার ধীরেমাধীরে পল্লয়নপ্রকল্পের প্রস্তুতি। নিঃসন্দেহে সে মিলানের আমেরিকান টুরিস্ট এবং রোমের ফরাসী আর্টিস্টটিকে চিহ্নিত করেছিল। আর সেই জানোই সে স্টকহোম এয়ারপোর্টে ক্রীকে উল্লসকে জানিয়েছিল তার হোটেলের নাম। স্টল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের পাকা গোয়েন্দার নামে কান্না ঘসে নিয়ে যেভাবে সে পালালো সেটা গোয়েন্দা গ্যালেই সম্ভব—যদিও এটা আশ্চর্য ব্যতীত ইতিহাস।

বুনো বোধকরি আর একটা প্রমাণ রেখে গেল ফাইনম্যানের সেই সমীকরণটির:  $E=mc^2$  অপরাধ বিজ্ঞানী কোনদিনই বুঝবে না; কিন্তু যুগান্তর প্রতিযোগিতার নিউক্লিয়ার ফিজিক্সিস্টের কাছে পাকা-গোয়েন্দাও—কুস।

'অ্যাসেক' শেষ হয়েছে, 'ডগলাস' শেষ হল—এবার বাকি রইল পালের গোদা: ডেব্রটার। তার কথাই বলি।





ফাইনম্যানকে কিন্তু ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া গেল না। ম্যাককিনলিভি দীর্ঘদিন লেগে ছিল তার পিছনে, ছায়াবি মত। কোনও নতুন সূত্র আবিষ্কার করতে পারেনি। অবশেষে কর্নেল প্যাশ নিজেই একদিন এসে হাজির হল প্রফেসর ফাইনম্যানের ডেরায়। সমাপন করে ফাইনম্যান তাকে বসালো নিজেব বৈঠকখানায়। আবহাওয়া থেকে শুরু করে সিনেমা, বেসবল সব কিছু আলোচনা করল খোশমেজাজে, কফি খাওয়ালো। শেষ-মেশ লস অ্যালামসের প্রসঙ্গ তুলতে বাধ্য হল প্যাশ। ফাইনম্যান তৎক্ষণাৎ বললে, আপনার আইডেবিটি কাউটা দেখাবেন মদ্য করে।

কর্নেল প্যাশ তৈরী হয়েই গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ তার সনাক্তিকরণ কাগজপত্র দেখালো অধ্যাপককে—সে সিকিউরিটির লোক, লস অ্যালামস সনাক্ত আলোচনা করার অধিকার তার আছে এটা প্রমাণ করল। বললে, এবার আপনাকে আমি কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই, কিছু মনে করবেন না—

—করলেই বা ঠিক আছে কে? স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করে যান।  
—পীটার নামে আপনার কোন পুত্রসন্তান ছিল, বা আছে?  
—আছে না। আমার আদৌ কোন পুত্রসন্তান হয়নি। ছিল না, বা নেই।  
—মিসেস ওবমোতা নামে একটি গভর্নেসিকে আপনার পুত্রের জন্য কখনও নিয়োগ করেছিলেন একগাল হাসল ফাইনম্যান। বললে, আপনার প্রশ্নটাই অবৈধ হয়ে পড়ছে নাকি, অফিসার? আমার পুত্রই নেই, তার জন্য গভর্নেসি?  
—আই মীন ঐ নামে কাউকে আপনি চেনেন?  
—না, চিনি না।  
—অথচ লস অ্যালামসে থাকতে একটি চিঠিতে আপনি পীটার এবং মিসেস ওবমোতার উল্লেখ করেছিলেন?

—না।  
না? আমার কিন্তু একজন সাক্ষী আছে।  
—অন্যের কথা। সাক্ষীকে কাঠগড়ায় যখন তুলবেন তখন তাকে আমি ক্রস-এক্সামিন করব। জিজ্ঞাসা করব পীটার বানান কী। ঐ বানানে সে আমার লেখা কোনও চিঠিতে—  
—একজ্যাক্সিলি। ঐ বানানে লেখেননি। উল্টো করে লিখেছিলেন—  
—কর্নেল। আপনি গোয়েন্দা আমি বিজ্ঞানী—কিন্তু আমরা আলোচনা করছি ইয়োজীত্যটি নিয়ে। কোন ভাবাবিদ্যকে ডাকলে হয় না? আর—ই-টি-ই-পি বানানে পীটার উচ্চারণ শব্দসমত কিনা—  
এবারও বাধা দিয়ে প্যাশ বলে, দেখুন প্রফেসর, আপনি ক্রমাগত ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। এটা আদৌ কোন রসিকতার কথা নয়। আপনি কি নিজেই আমাদের সিকিউরিটি অফিসারকে বলেননি অক্ষরগুলো উল্টোপাল্টা করে লিখেছেন?

—বলেছিলাম। না হলে সে আমার চিঠি 'পাস' করছিল না।  
—অথচ অক্ষরগুলো মোটেই উল্টোপাল্টা করে সাজানো নয়, প্রত্যেক উল্টো করে সাজানো—কেমন?  
—তাই নাকি?  
—এবং পীটার একজন রাশিয়ান এজেন্ট।  
—বলেন কী।  
—অথচ আপনি ম্যাককিনলিভিকে বলেছিলেন, পীটার আপনার ছেলের নাম, মিসেস ওবমোতা আপনার গভর্নেসির নাম?  
—বলেছিলাম।  
—হেন।

—ঐ তো বললাম—না হলে সে আমার চিঠি 'পাস' করত না।

—তাহলে আসলে আপনি আপনার ষ্টীকে কী কথা জানিয়ে ছিলেন।

ফাইনম্যান সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, লুক হিয়ার অফিসার, আমার ষ্টীকে আমি চিঠিতে কী লিখেছি তা জানাতে আমি বাধ্য নই। আমি বলব না।

—আমার কাছে অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু কোনও এনকোয়্যারি কমিশনের কাছে—

ফাইনম্যান হেসে বলে, আপনি ভুল করছেন অফিসার। ওভাবে হবে না। এনকোয়্যারি কমিশন পর্যন্ত যেতেই পারবেন না আপনারা। ঐ চিঠিখানির অস্তিত্বই প্রমাণ করতে পারবেন না। তাছাড়া আমার অ্যাডভোকেট আপনারের ছো ছোড় কথা বলবে না। আমি তো অমন চিঠির কথা মনেই করতে পারব না। আপনারেরই বহা ভাবাবিধি করতে হবে, কেন অমন চিঠি আপনারা 'পাস' করলেন—আদৌ যদি চিঠির অস্তিত্বটা মেনে নেওয়া হয়।

কর্নেল প্যাশ এবার তার আক্রমণ-শক্তি পরিবর্তন করতে বাধ্য হল। সত্য কথা—ঐ চিঠিখানির অস্তিত্ব প্রমাণ করা শক্ত। সেটা স্বীকার করা মানে, প্রমাণ করা লস অ্যালামসে সিকিউরিটিয়ান অপদার্থ ছিল। প্যাশ এবার প্রশ্ন করে, এ কথা কি সত্য যে, আপনি কথিনেশান-চাবির সাহায্যে কারচুপি করে লস অ্যালামসের 'আয়রন-সেক' এরদিন খুলে ফেলেছিলেন?

ফাইনম্যান বলে, তা কেমন করে সম্ভব? সেখানে তো সর্বক্ষণ প্রহরা থাকত।

—আমি নিশ্চিতভাবে খবর পেয়েছি—প্রহরী মিনিট পনেরের জন্য অনুপস্থিত ছিল, আর তখন আপনি সেফটি খোলেন।

ফাইনম্যান অটোহাম করে ওঠে। বলে, কী বকছেন মশাই পাগলের মত? আপনি কি এই আঘাতে গল্লও এনকোয়্যারি-কমিশনারকে শোনাতে চান নাকি?

—আপনি সোজাসুজি আমার প্রশ্নের জবাব দিন। এ অভিযোগ আপনি অস্বীকার করছেন? 'ইয়া' না 'না'?

ফাইনম্যান গভীর হয়ে বললে, এক কথায় ওর জবাব হয় না। আমাকে কতকগুলি প্রতিপ্রশ্ন করতে দিতে হবে—

—কলুন?

—ঐ আয়রন-সেক-এ মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের গোপনতম তথ্য রাখা হত—এ কথা সত্য?

—ইয়েস।

—তাই ঐ সেফটি বসানোর আগে তার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এফ. বি. আই-কে দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়েছিল—আপনারা নিশ্চিতভাবে জানিয়েছেন সেটা কেউ খুলতে পারবে না। 'ইয়া' না 'না'?

কর্নেল প্যাশ ইতস্তত করে বলে: ইয়েস।

—অথচ এখন আপনি বলছেন, পনের মিনিটের মধ্যে একজন ফুস-মস্তুরে সেটা খুলে ফেলল। কেমন? তার অনুসিদ্ধান্ত কী? আপনারা অপদার্থ না গল্লটা আঘাতে?

কর্নেল প্যাশ চটে উঠে বললে, জেরা কে করছে? আপনি না আমি?

—আপনার অনুমত্যানুসারে আপাতত আমি।

না। আমি প্রশ্ন করব, আপনি জবাব দেবেন। বলুন—কোটে দাঁড়িয়ে হলপ নিয়ে আপনি এ অভিযোগ অস্বীকার করতে পারেন?

—আগে কোটে তুলুন মশাই। আদালতের কথা আদালতে হবে। আপাতত এটা আমার ডুইক্রেম।

কর্নেল প্যাশ উঠে দাঁড়ায়। ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

—জাস্ট এ মিনিট কর্নেল—পিছন থেকে ফাইনম্যান ডাকে।

—ইয়েস।

—আপনার সেই বাথমোটা বন্ধ ম্যাককিনলিভিকে বলবেন—আমার চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলে সে কুজিমানের মত কাজ করেনি। একটু তলস্ত করলে সে জানতে পারত চিঠিখানা আমার ব্যক্তিগত টাইপরাইটারে টাইপ করা—

—কোন চিঠিখানা?

—আপনি জানেন না। সে জানে। যেখানায় তাকে খানি চারটে ভরসী খবর জমিয়েছিল, রাখেন, সেখানাই আমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় এভিডেন্স হতে পারত। তাকে জিজ্ঞাসা করতেন। সাং কথা এবার সে স্বীকার করবে।

কবাবি জে ওপেনহাইমারও আমাদের কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছেন। আমরা ভুললেও এফ. বি. আই. তাকে ভোলেনি। ইতিমধ্যে গোয়েন্দা হাত বদলেছে। কর্নেল প্যালি তাঁর নথিপত্র বুঝিঃ দিয়েছেন তাঁর উত্তরসূরী এডগার হুভারকে। এফ. বি. আই ওপেনহাইমারের ব্যাপারে সর্বশেষের জন্য একটি স্পেশাল গোয়েন্দা লাগালেন। নবনিযুক্ত এই গোয়েন্দাটি ছাচার মত অনুসরণ করে চলেছে ওপিকে।

যুদ্ধজয়ের অব্যবহিত পরেই ওপেনহাইমার লস আলামোসের ডিরেক্টরের আসন থেকে পদত্যাগ করলেন। অনেকেই বিস্মিত হল এ সিদ্ধান্তে। ওপি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের বললেন—অতঃপর নৈজানিক গবেষণাই হবে তাঁর জীবনের ব্রত। মারণাস্ত্র নয়, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত হতে চান তিনি। প্রকৃত বিজ্ঞানভিকুর মত কথা।

ইতিমধ্যে কিন্তু আমূল পরিবর্তন হয়েছে তাঁর জীবনদর্শনে। ব্যাতির মোহ পেয়ে বসেছে তাকে। একের পর একটি সম্মান পেয়ে যাচ্ছেন তিনি। কাগজে কাগজে কল্যাণ করে বার হচ্ছে তাঁর নাম। প্রেসিডেন্ট টুয়ান যুদ্ধান্তে তাকে সে বছরই নিলেন—‘মেডেল অফ মেরিট’। ন্যাশনাল বেবি ইনস্টিটিউট তাকে সে বছর ‘ফাদার অফ দ্য ইয়ার’ বলে ঘোষণা করল। ‘পপুলার মেকানিস্ট’ নামে একটি পত্রিকা এক বিশেষ সংখ্যায় তাকে খেতাব দিল ‘বিশ্বশক্তির প্রথমার্ধের স্রোত মনীষী’। আইনস্টাইন, রবার্টনাথ, রোমা রোলা, ফ্রেডেড, বার্নার্ড শ-কে পিছনে ফেলে ওপি ‘সবিনয়ে’ গ্রহণ করলেন এ খেতাব। অনেক কাগজেই তাকে উল্লেখ করা হচ্ছে ‘আটম-বোমার জনক’ হিসাবে। সহস্রাবিক বৈজ্ঞানিকের প্রাণে সম্মানটাও নির্বিচারে গ্রহণ করলেন ওপি। তিনি তাঁর আইজ, খেতাব, এবং মানপত্রগুলি কোথায় নাচাচ্যাড়া করেন। সতীক ইউরোপ ভ্রমণে গেলেন। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কুড়িয়ে আনলেন ‘অনারারী ডক্টরেট’। সংবাদপত্রে তাঁর নামে যেখানে যা কিছু ছাপা হয় তা সাহিত্যে রাখেন কাহিনে। এ কাজের জন্য শেষ পর্যন্ত একটি সেক্রেটারি পর্যন্ত নিযুক্ত করলেন ওপি। সোভ থেকে মোহ—তা থেকে অহংকার। আমূল বদলে গেলেন ওপেনহাইমার। মিথ্যার বন্ধুতা নিয়ে বেড়ানোই হল তাঁর কাজ। অভ এখানে ধারোদখটম, কাল সেখানে সভাপতিত্ব, পরশু এখানে প্রধান-অতিথি। ক্রাস নেওয়াও হয়ে ওঠে না সদনময়ে। 1943 থেকে 53—এ দশ বছরের মধ্যে তিনি মাত্র পাঁচটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার সময় করে উঠতে পেরেছিলেন—এবং বিশেষজ্ঞদের মতে সেগুলিও নেহাৎ মামুলী। অথচ বন্ধুত্বপ্রসঙ্গে আইনস্টাইনের মত লোককেও তিনি কড়া সমালোচনা করতে কসুর করেননি। ওর একজন দীর্ঘদিনের বন্ধু এই সময়ে লিখেছেন, “যেদিন ওপি জেনারেল মার্শালকে শুধু ‘জর্জি’ বলে উল্লেখ করল সেদিনই বুঝলাম আমরা ভিন্ন পথে পথিক হয়ে গেছি। মনে হয় আকস্মিক ব্যাতিতে ওর ‘মার্স’ ঘুরে গিয়েছিল।—সে নিজেকে মনে করত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অবতার। যেন দুনিয়াটাকে তিক পথে চালিত করার দায়িত্ব শুধু ওর স্বাক্ষর উপর আরোপিত।”

ওপি নিজেকে যাই ভাবুক না কেন গোয়েন্দা হবার তাকে বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছু ভাবত না। নিউ ইয়র্কের হেরাল্ড ট্রিবিউনের বিশেষ সংবাদদাতা লিখেছেন, 1953 সালের নভেম্বর-তক ওপেনহাইমার-সংক্রান্ত নথিপত্র এত জমেছিল যে, আইলগুলি একের উপর এক সাজানো হলে তা সাড়ে চার ফুট উঁচু হয়ে যেত। অর্থাৎ মানুষটির বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রায় মানুষ-প্রমাণ। হুভার ঐ মাসেই সেই পর্বতাকৃতি নথিপত্র ঘেঁটে একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তৈরী করল। মানহাটান প্রকল্পের বিভিন্ন নথিপত্র থেকে ওপি যেমন সঙ্গোপনে একটি মাত্র বোমা তৈরী করতে বাসেছিলেন, তিক সেই ভঙ্গিতেই হুভার তৈরী করল আর একটি পরমাণু বোমা। ওপেনহাইমার তার বিন্দু-বিসর্গও জানেন না। যুদ্ধকালে হিরোসিমাধর জিয়ানো কইমাছগুলোও বোধকরি এত নিশ্চিত ছিল না। ইতিয়ানাশেলিস জাহাজে যেমন অতি সঙ্গোপনে পাচার করা হয়েছিল প্রথম বোমাটা—তিক তেমনি করেই হুভার তাঁর রিপোর্টখনা সত্তর্পণে পাঠিয়ে দিলেন সর্বোচ্চ দপ্তরে; এমনকি একটি কপি খাশ আইসেনহাওয়ারের কাছে। না।

জেনারেল আইসেনহাওয়ার নয়, প্রেসিডেন্ট আইক—এর দপ্তরে। এতদিনে টুয়ানর চেয়ারে এসে বসেছেন আইক।

ভাতে কাজ হল।

রিপোর্টে পুখানুপুখ তথ্য সাজিয়েছেন হুভার। যুক্তিনির্ভর তথ্য।

প্রথমতঃ ওপেনহাইমার দীর্ঘদিন ধরে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের অনেক রকমার কন্স্পিরেট্রি-এ উপস্থিত ছিলেন। অনেক কম্যুনিষ্ট ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল তাঁর। ওপির স্ত্রী, ডাই ও হ-কুম্ণু কম্যুনিষ্ট। ওপেনহাইমার ছদ্মনামে ওপের দুখপত্রে প্রবন্ধ লিখেছেন, পাণ্ডি ফাণ্ডে চাঁদা দিয়েছেন। তার অকস্মি প্রমাণ আছে।

দ্বিতীয়তঃ 1943-এর সেই বারই জুন ওপি যে মেয়েটির সঙ্গে রাত কটান সেই মিস্ ট্যাটলক একজন নামকরা কম্যুনিষ্ট এজেন্ট। ঐ সাক্ষাৎকারের পর মেয়েটি আত্মহত্যা করে। কারণটা অজ্ঞাত।

তৃতীয়তঃ ওপেনহাইমার সজ্ঞানে মিথ্যাবাদন করেছেন—হাফন শেভেলিয়ার আদৌ গুপ্তচরবৃত্তি নেননি। দীর্ঘদিন ঐ শেভেলিয়ারের পিছনে এফ. বি. আই গুপ্তচর নিযুক্ত করে নিঃসন্দেহে বুঝেছে তিনি ঐখানে কখনও রাশিয়ান গুপ্তচরদের সংস্পর্শে আসেননি। ওপেনহাইমার তাঁর মিথ্যাবাদ্যে একজন নিরীহ পত্নীকেও সর্বনাশ করেছেন।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সচরাচর এসব ব্যাপারে নাক খলানেন না। অধীনস্থ কর্মচারীদের যথাকর্তব্য করতে নিতেন। একেবারে কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল। তিনি তৎকাল্য কয়েকজন অতি উত্পাদন্য রাজকর্মচারীকে হোয়াইট হাউসে ডেকে পাঠালেন। সংকিণ্ড অধিবেশন। মিলিটারি-ম্যান আইসেনহাওয়ার তাঁর কোন কর্মচারীকে ‘মিস রিকোয়ার্স এ্যাকশান’ বলেছিলেন কিনা জানি না—কিন্তু কবছা হল অবিলম্বে।

ওপেনহাইমার তখন প্রিন্সটনে। আসন্ন বড়দিনের উৎসবে বাস। হঠাৎ একটা জরুরী টেলিগ্রাফ এল ওয়াশিংটন থেকে—আটমিক-এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান তাকে অবিলম্বে সেখা করতে বলেছেন। একুশে তিনেছর সব কাজ কেলে ওপি ছুটে এসেন ওয়াশিংটনে। সেখা করলেন চেয়ারম্যানের সঙ্গে। তখনই তাঁর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল চার্জ-শীট। দীর্ঘ অভিযোগের তালিকা। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত।

বজ্রাহত হয়ে গেলেন ‘বিশ্বশক্তির প্রথমার্ধের স্রোত প্রতিভা’।

যোজনাবিকৃত সূর্যে ফুলের ফোঁড় নয়, তিনি দেখলেন—‘প্রকান্ত একটা ধোয়ার বলর পাক খেতে খেতে উপরে উঠে যাচ্ছে—একটা আত্মনের কলহ, তার কিনারগুলো মিশুরে খাল—অনারিকৃত একটা নরসত, উলখাটিত হল চোখের সামনে—ঘনিয়ে এল মহামুদ্রা’।

অব্যভাবিক একটা নীরবতা। পুরো সেড মিনিট ওপেনহাইমার কথা বললেন।

শুভ হল ওপেনহাইমারের ঐতিহাসিক বিচার। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে।

সেটা কিন্তু 1954-এর এপ্রিল মাসে। বহুত বিশ্বাসঘাতক ‘ডেক্সটার’ ধরা পড়ার চার বছর পরে। আমাদের মূল কাহিনীর এক্টিয়ানের বাইরে।

আজ্ঞে না। ওপেনহাইমার ‘ডেক্সটার’ নন।



॥ ছবি ॥

ক্রাউস ফক্স আর সতীক প্রফেসর কার্ল বীখাবকাশ কাটাতে এলেন পারীতে।

হঠাৎ ঐ সিদ্ধান্ত। প্রস্তাবটা প্রথমে তুলেছিলেন প্রফেসর কার্ল অন্যভাবে। কী একটা প্রয়োজনে তাকে দিন তিন-চারের জন্য পারীতে যেতে হবে। কারণটা কী তা উনি বুলে বলেননি। তখন রোনটা হঠাৎ বলে বসে, তাহলে আমরাও কেন যাই না সঙ্গে? ক্রাউস-এর নতুন গাড়িটার একটি পরশ হয়ে যাবে। কী বল ক্রাউস?

ক্রাউস তার পুরানো গাড়িটা বেচে সম্প্রতি একটা ভাল সিডানবডি গাড়ি কিনেছে। সেটা নিয়ে পারী এমণে যেতে তত্ব আদৌ আপত্তি নেই, আগ্রহ আছে। সেসস কথা নয়, ও ভাবছিল হঠাৎ রোনটার এ



মত পরিবর্তনের কারণটা কী? ইতিপূর্বে সে তো একদিন অস্থির হয়েছিল জারী করে বসে আছে—  
ক্রাউস তাদের বাড়িতে একেবারে না এসেই ভাল হয়।

মেডিকল ব্যবস্থা হল। সব কিছু আয়োজন করলেন প্রফেসর কার্ল। পারীতে হোটেলের ঘর বুক  
করলেন তিনিই। তারপর একদিন ঠাণ্ডা বস্ত্র নিয়ে শড়লেন গাড়ি নিয়ে। লণ্ডন থেকে পালি।

ঠাণ্ডা এসে উঠলেন পিগেল অঞ্চলে হোটেল ইন্টারন্যাশনালে। প্রভাত হোটেল। ব্যবস্থাপনা ভাল।  
প্রফেসর আগেরভাগেই দু-খানি ঘর 'বুক' করেছেন। সাত তলার। কম নম্বর 728 এবং 729। দুটোই  
দৈত্যাকার। ক্রাউস এর পক্ষে এতবড় কামরার আয়োজন ছিল না কিন্তু পাশাপাশি থাকা হবে এই মনে  
করে প্রফেসর ঐ ব্যবস্থা করেছিলেন। 729-এ উঠলেন স্ত্রীকর্মা কার্ল এবং 728-এ একা ফুকস।

পারীতে পৌঁছেই কিন্তু অতি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন প্রফেসর কার্ল। বিন শক্তিকায় অ্যাপার্টমেন্ট তাঁর  
ঠান। বেড়ানোর সময় সেই আসে। রোনটা অভিযোগ করলে বলেন, আমি তো আগেই  
বলেছিলাম—আমি বেড়াতে আসছি না, কাজে আসছি। তা তোমার অসুবিধা কী আছে? ঘোর না যত  
খুশি। ক্রাউস তো আছে সব দিতে।

অগত্যা ক্রাউসকেই ঘুরতে হচ্ছে। ল্যাভর মিউজিয়াম, আর্ক-ন্যা-দ্রিফ, ইকেল-টাওয়ার, নতুন্যাম।  
ভালই লাগছিল ফুকসের। দু-জনের মধ্যে কোনও চুক্তি হয়নি, কিন্তু সেই প্রসঙ্গটা কেউই আর উত্থাপন  
করেনি। বন্ধুত্বের সম্পর্কেই আনন্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্ভাব্য নৌকাযোগে সেই-এ বেড়াচ্ছে।  
রাস্তার ধারে খোলা বেঞ্চটারে আহার্যাদি সেরে হোটেল ফিরছে রাত করে।

পুরানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায় ক্রাউস-এর। তার বৌবনের দিনগুলোর কথা। সেই যখন  
সে ছিল রোনটার বাবার আশ্রয়ে। তখনও এমনিভাবে গুণ্য পুজন বেড়াতে যেত। ও ছাড়া আর কারও  
সঙ্গে 'ডেটিং' করত না রোনটা। তাহলেও মেয়েটা ছিল অত্যন্ত সাবধানী, রক্ষণশীল। বেশী দূর অগ্রসর  
হতে দেয়নি কখনও তাকে। একসঙ্গে সিনেমা দেখেছে, থিয়েটার দেখেছে, নেচেছে, গল্প করেছে। বাস,  
তারপর অগ্রসর হতে চাইলেই সরে গেছে রোনটা। অথচ ক্রাউস-এর বেশ মনে আছে, রোনটা  
সে-যুগে তাকে গিরে মধুরের মত পেশম মেলে নাচত। জীববিজ্ঞানের নিরিখে তুলনাটা হয়তো ঠিক হল  
না, কিন্তু বাস্তবে ঘটনাটা ঐরকমই হত। সে-আমলে রোনটার প্রসবন, সাজসজ্জা, অঙ্গভঙ্গি, বাকচাতুর্য  
সবকিছুই ছিল ঐ তরুণ ছাত্রটির মনোহরতার উদ্দেশ্যে। একদিনের ঘটনা ওর বিশেষ করে মনে পড়ে।  
সেই একটি দিনই ও উদ্ভাস হয়ে উঠেছিল। তখনও রোনটার বাবা বেঁচে। সে রাতে লণ্ডনে বিবাহত  
'ওল্ড ডিক' ঘৃণের রোমিও-জুলিয়েট হচ্ছে। ক্রাউস দুখানা টিকিট কেটে এনেছিল। রোনটা একমাত্র  
তার সঙ্গে তখন 'ডেটিং' করছে—ওর বাবা জানেন সে কথা। অনুষ্ঠান দেখে যখন ফিরে এল তখন  
শহরতলীতে নিশ্চিহ্ন রাত। বাড়ির সবাই শুয়ে পড়েছে। বিতল বাড়ি। একতলার ক্রাউস-এর শোওয়ার  
ঘর—তাইবোনদের নিয়ে রোনটা থাকত ছিল। সদর দরজার ডুমিকেট চাবি খসে পড়বে কাছে।  
আহার্যাদি সেরে এসেছিল ওরা। ওকে শুভবাগি জানিয়ে রোনটা যখন খিতলে উঠে যাচ্ছে তখন হঠাৎ  
গ্যাস-সম্প্রদায় ওর হাতটা চেপে ধরেছিল ফুকস। রোনটা প্রথমটা বুঝতে পারেনি। বলেছিল, কী?

ফুকস-এর রক্তে তখন তুফান জেগেছে। কোন কথা বলেনি সে। জোর করে ওকে টেনে নিয়েছিল  
নিজের বুক। প্রথমটা বিস্ময়, তারপরেই শিঙিরে উঠেছিল রোনটা। দু-হাতে ওকে টেনে সরিয়ে দিতে  
চেষ্টা করত—বাধা দিয়েছিল। ফুকস সে বাধা মানেনি। জোর করে চেপে ধরেছিল ওর শরীরের মত নরম  
বুক নিজের পেশীবল কবচি বক্ষে। কী যেম বলতে চেষ্টা করত রোনটা—পারেনি। ফুকসের উদ্ভূত  
ওষ্ঠাধরে সে প্রতিবাদের ভাষাটা হারিয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত একটা অনুভূতি। আতঙ্ক ভালেমি সে কথা।  
কখন অজান্তে রোনটার প্রতিবাদ-উদ্ভূত বাধাজোড়া ওকে সবলে আলিসন করে ধরেছিল। সেই ওকে  
প্রথম চুম্বন করে। এবং সেই শেষ। এর চেয়ে আর একটি পদও তাকে অগ্রসর হতে দেয়নি মেয়েটি।  
পরে এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। ক্রাউস বলেছিল—ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই নয়, তাহলে তুমি  
আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে কেন? রোনটা দু-হাতে মুখ ঢেকে বলত—দাঁজ, ক্রাউস, ও-প্রসঙ্গ তুললে  
আমি তোমার সামনে আর আসব না। আশ্চর্য লাভুক মেয়েটি। না, লাভুক নয়—রক্ষণশীল। ও কিন্তু  
মধ্যযুগের মেয়ে নয়, চার্চের 'নান' নয়, কলেজ-পড়া আধুনিকা। তার সহপাঠিনীরা 'ডেটিং' করতে  
গিয়ে সন্তুপনীর কয় পা অগ্রসর হত, সে কথা নিশ্চয় জানা ছিল তার। কিন্তু হার্মের এক দৃষ্ট চেপে

বসেছিল রোনটার খাড়ে। কুমারী মেয়ের কৌমার্য সঙ্গমে সে ছিল অস্বাভাবিক রকমে সচেতন—আর  
সে কৌমার্য ওর ঠোটে, বুক, সর্বসঙ্গে। আশ্চর্য মেয়ে।

তবু তার একটা অর্থ হয়। প্রাকবিবাহযুগে কুমারী মেয়ের সহজাত সংজ্ঞার। কিন্তু এর অর্থ কী? আজ  
কেন সেই পরিণতবয়স্ক মেয়েটি হঠাৎ বলে বসল নিবাহের সংজ্ঞা ইঙ্গিতব্য ব্যভিচারের একটা  
পানপোর্ট নয়?

প্রফেসর কার্ল গোল্ড-স্তিনের কামেরা এনেছেন—কিন্তু ফটো তোলায় মত সময় অথবা মেজাজ  
নেই তাঁর। অগত্যা রোনটা আর ক্রাউস আনন্দি হাতে তার সম্ভাব্যতার করে। এখানে-ওখানে ফটো তুলে  
ভেড়ায়। সেদিন ওরা গেল শহরের বাইরে ভাসাই-প্রসঙ্গ দেখতে। লুই পরিবারের বিলাস-বাসনের  
স্বতি-বিভক্তিত ভাসাই প্রাসাদ। অনেক ফটো নিল। তারপর প্রাসাদের পিছনদিকের সুন্দর বাগানটিতে  
গিয়ে বসল ওরা। টুরিস্ট অনেক এসেছে, বাগানটিও অতি প্রকাণ্ড। ফলে বাগানের দূরতম প্রান্তে একটা  
কাবনেশান-মেড-এর ধারে ওরা যেখানে গিয়ে বাগানের বাগেট তুলল, সেখানটা প্রায় নির্জন। ফুকস  
তার দ্রাস্ত্য ব্যব করে দু-পাশ মল ঢালল। রোনটা বললে, আজ আমরা এই যে বাগানটায় নির্জনে বসে  
লাজ পাবি, এখানেই একদিন হয়েছিল 'টেনিস কোর্ট বিস্ফোরণ' তা জান?

—টেনিস কোর্ট বিস্ফোরণটা কী?

—তুমি কি নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ছাড়া আর কিছু পড়নি? ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস?

—না। অত সময় আমার নেই।

—তবে ও প্রসঙ্গ থাক। গোল্ড ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পোনাবার মত মেজাজ আমার নেই।

—তবে থাক।

দুজনে কিছুক্ষণ নীরবে পানাহার করতে থাকে। তারপর ফুকস বলে, আজ সত্যি করে বলত  
রোনটা—তুমি কী চাও? আমি ইন্ট-জার্মানিতে চাকরি নিয়ে চলে গেলে তুমি খুশি হও, না বন্ধু নিয়ে  
এসে এখানেই যদি রাবি?

রোনটা মিটি হাসে। বলে, কী মনে হয়?

—কী জানি, ঠিক বুঝতে পারি না। এক এক সময় মনে হয় আমি তোমার চোখের আড়ালে চলে  
গেলেই শান্তি পাবে তুমি।

—নিজের ক্ষতবহুতা বড় বেশি করে দেখছ না?

—তুমিই তো বললে সেদিন।

—সে তো বাগের মাথায়।

—তবে মনের কথাটা কী?

—এতদিনেও যদি না বুঝে থাক, তবে বুঝে আর কাজ নেই।

—কিন্তু স্পষ্ট করে না বললে কেমন করে আমি সিদ্ধান্ত নেব? ও চাকরি নেব কি না?

মান হাসল রোনটা। বললে, আমার ইচ্ছার সঙ্গে তোমার সিদ্ধান্ত নেবার কী সম্পর্ক? আমাকে খুশি  
করতেই কি সারাজীবন ধরে সিদ্ধান্ত নিয়েছ তুমি?

—না, তা নিইনি। তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম একদিন—

—সে কথা কিন্তু আমি 'মীন' করিনি। ও কথা বরং থাক।

—তবে কী কথা আলোচনা করব? আজকের আবহাওয়া?

—না, অন্য কিছু।

—তবে তোমার কথা বল।

—কী আমার কথা?

—তুমি আমার 'মা' হচ্ছ না কেন?

—আবার 'মা' মানে?

—আলিসের কোন ছোট ভাই অথবা বোন?

মান হাসল রোনটা। স্বভাবগোষ্ঠীর বক্তৃৎসূ পাণ্ডুর হাসি। প্রাপ্তিটা গলায় ঢেলে নিয়ে বললে, ফর  
এর ইন্কলমেশন জুলি, আলিস আমার মেয়ে নয়।



দ্বিতীয় পক্ষের মুখে তুলছিল ক্রাউস। ধীরে ধীরে এবার তার হাতটা নেমে আসে। অবাক হয়ে বলে মানে? আলিস তোমার মেয়ে নয়?

—না। আলিস প্রফেসর কার্ল-এর প্রথম পক্ষের কন্যা।

ক্রাউস-এর মনে পড়ে গেল আলিসের চেহারা। আলিস ছিল ব্রুনেট—মাথাভরা কালো মূল। অথচ কোনটা স্মৃতি। তাই মেয়ে মায়ের মত দেখতে হয়নি আদৌ। অশ্রুটে বললে, আশ্চর্য। এত বড় বকরটা এতদিন আমাকে বলনি তো?

—শুধু তাই নয় ভুলি। আলিস প্রফেসর অটো কার্লের মেয়েও নয়।

—তার মানে?

—আলিসের মাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন ঐ কন্যা সমেত।

হঠাৎ ক্রাউস ওর ক্রাউস-পরা হাতটা চেপে ধরে—যেভাবে একদিন তার হাত চেপে ধরেছিল প্রথম যৌবনে, সিঁড়ির মুখে। বলে, ডাক্তার দেখিয়েছিলে? অসুস্থ কে? তুমি, না প্রফেসর?

—অসুস্থ হতে হবে তার মানে কী?

রোনটা তার হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। বলে, পাগলামি কর না। এবারের আরও লোক আছে।

ক্রাউস হাতটা ছেড়ে দেয়। রোনটা খড়ি দেখে বলে—সময় হয়ে গেছে। চল, ওঠা যাক। বাসটা ছেড়ে দেবে না হলে।

ওরা একটা টুরিস্ট বাসে নিয়েছিল ভাসাই। প্রফেসর কার্ল ঠিক গাড়িটা স্থানান্তর করছেন।

পরের দিন সোন্ডিস একাই বেরিয়েছিল তার গাড়িটা নিয়ে। শহরতলীর এক বিশেষ অঞ্চলে। হিটলারের অধ্যাপকের দেশভাষণ-এর আগে সে কিছুদিন পার্কিতে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। ওকে বারো আশ্রয় দিয়েছিল তাদের কিছু অল্প-তাল্লাশ নেবার উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়। যুদ্ধের ডামাডোলে ও-অঞ্চলের বাসিন্দারা তো ছাড়, গোটা ফুগোলটাই পালিয়ে গেছে। সব অতেনা হনুস। হোটেল ফিরে এসে বিশেষপান কাউন্টারে নিজের ঘরের চাবিটা নিয়ে যাবে হঠাৎ নিজের নায়টা শুনে চমকে উঠল। ওর সামনেই কাউন্টারের মিকে মুখ করে, এবং ওর মিকে শিখন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন একজন বৃদ্ধ ভয়লোক। কাউন্টারের প্রিন্সিপালিট মেয়েটিকে তিনি বললেন দেখুন তো ডব্লিউ ক্রাউস ফুন্স-এর নামে কোন চিঠি আছে? কম নম্বর 728?

মেয়েটি কাউন্টারের পিছনে পায়চারি খোপের মত একটা বাক্স থেকে বার করে আনল একটা মোটা খাতা। তখনই হত্যাভয়িত করল না কিন্তু। বলল, আপনার চাবিটা মিস?

—ও সার্ভেন্ট। বৃদ্ধ তার পকেট থেকে হোটেলের চাবিটা বার করে টেবিলে রাখলেন।

মেয়েটি বললে, মাগ করবেন, এটা 729 নম্বর।

বৃদ্ধ যেন চমকে ওঠেন। তারপর হ্যাঁ-হ্যাঁ করে হেসে ওঠেন। বলেন, আমারই ভুল। প্রফেসর ৭৮-এর ঘরের চাবিটা ভুলে করে নিয়ে এসেছি। ঐ 728 আর 729 আমি একসাথে বৃদ্ধ করেছি।

মেয়েটি জবাব দেয় না। একটা রেজিস্টার খুলে কী যেন দেখে। তারপর সে নিশ্চিত হয়ে হাসে। ফরাসী ভাষায় বলে, আপনারা, মানে ইরোজ অধ্যাপকেরা সবাই একরকম। যান, আপনার বন্ধুর চাবিটা তাঁকে স্মরণ দিয়ে আসুন।

বৃদ্ধ অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে খান খান চাবিটা ভুলে নিয়ে সরে পড়লেন। ক্রাউস এতক্ষণে চিনতে পারল তাঁকে। নিসন্দেহে তিনি প্রফেসর অটো কার্ল—যদি না তাঁর সমস্তকাই হন। তফাৎ শুধু এই প্রফেসর কার্ল এর দাড়ি-গোফ পরিষ্কার করে ঠাছা, এই বৃদ্ধের বিরাট কাঁচপাড়া ফ্রেন্চম্যান্ট পড়ি।

বৃদ্ধের অলঙ্কার সে তাঁকে অনুসরণ করে সদর দরজা পর্যন্ত এল। বৃদ্ধ হস্তান্তর হয়ে বার হয়ে গেলেন। হোটেলের শোটিংকোর তলাতেই অপেক্ষা করছিল একটা কালো রঙের মাসেজিস। তার ড্রাইভার দরজা খুলে দিল। মুহূর্তমধ্যে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ঘটনাটা নিরতিশয় অদ্ভুত। কে ঐ বৃদ্ধ? কেন তিনি ক্রাউস ফুন্স-এর নামে মিথ্যা পরিচয় দিলেন মেয়েটির কাছে? গাড়িটাই বা কার? অনামন্যের মত সে ফিরে এল কাউন্টারে। মেয়েটিকে বললে নাম্বর 728 মীজ?

যাত্রিক অভ্যাসে ছক থেকে নামিয়ে মেয়েটি ব্যক্তিগত ধরে চাবিটা।

—দেখুন তো 729 নম্বর চাবিটা এখানে আছে কিনা?

হঠাৎ কী মনে পড়ে যায় মেয়েটির। বলে, ও হ্যাঁ। আপনার ঘর চাবি দুটো উন্টে পাওয়া হয়ে গেছে, আপনার শুধু আপনার চাবিটা নিয়ে চলে গেলেন। এইমাত্র...

—ঠিক আছে। একটা ঘরে ঢুকতে পারলেই হল।

নিজের ঘরে ফিরে এসে ক্রাউস আশোপাশ ব্যাপারটা তলিয়ে দেখে। কী হতে পারে? প্রফেসর কার্ল দুটি ঘর ভাড়া নিয়েছেন; 729 নিজের নামে, 728টা ফুন্স-এর নামে। অথচ কাউন্টারে তিনি আত্মপরিচয় দিলেন ডব্লিউ ফুন্স বলে। তার উপর ছদ্মবেশ। প্রফেসর কার্ল একদিন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁর পিছনে শুধু আততায়ী সেজে থাকায় তিনি বিস্মিত নন। কেন? তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে কার কী লাভ? আচ্ছা, রোনটা কি সব কিছু জানে? সব কথা রোনটাকে খুলে বললে কেমন হয়? কিন্তু সে যদি বিশ্বাস না করে? যদি ভাবে, তার স্বামীর বিকছে কতকগুলো মিথ্যা অভিযোগ অনায়ে সে। প্রমাণ করবে কেমন করে?

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। ক্রাউস সেটা ভুলে নিয়ে বললে, হ্যালো?

—তুমি ঘরে ফিরে এসেছ? কতক্ষণ?—রোনটা কথা বলছে পাশের ঘর থেকে।

—এইমাত্র। প্রফেসর আছেন?

—না। ও তো সেই সকালেই বেরিয়ে গেছে। এস না এ ঘরে? চল, এখনই কোথাও বের হই। চুপচাপ এমন ঘরে বসে থাকার জন্য পারীতে এসেছি নাকি?

—তুমি তৈরী হয়ে নাও তাহলে।

—ও ঘরে এসে দেখ আমি তৈরী কি না।

নিজের ঘরে তাল্য নিয়ে ও চলে আসে এ-ঘরে। রোনটা তৈরী হয়েই বসেছিল। নিখুঁত সেজে সে।

—বাস্ রে! এত সাফের খটা?

—বাস্। ভুলে গেছ? আজ সন্ধ্যার পর ফলি বার্ডার-এ যাওয়ার কথা আছে না।

—ও হ্যাঁ, তাই তো। না, না, আমি ভুলিনি। কিন্তু তার তো অনেক দেরী। তুমি বল দেখি ওখানে। রোনাকে কয়েকটা জরুরী কথা বলতে চাই—

—বল।—রোনটা তার খাট সামনে আলতো করে বসে সামনের চেয়ারটায়।

—ভুল বুঝো না আমাকে। আমি একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছি না— আই মিন, প্রফেসর কার্লের বিষয়ে। আচ্ছা, তুমি কি সম্ভ্রতি তাঁর ব্যবহারে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য নৱছ?

রোনটা শ্যইই নরক হয়। গম্ভীর হয়ে বলে, বলাছি। কী একটা দুশ্চিন্তায় উনি এবেবারে বুঝতে পড়ছেন। আমাকে কিছু বলতে চান না, কিন্তু বেশ বুঝতে পারি, সেই চিন্তাটা ওকে কুণ্ণ, খাচ্ছে। হাতে ধুমাং না। সারসারাত প্যচচারি করে—

—তুমি কি মনে কর প্রফেসরের কোন শত্রু আছে? কেউ তাঁকে ব্র্যাকমেল করছে?

—আমার তো তা মনে হয়নি এতদিন। এমন দেবতুল্য মানুষের শত্রু থাকবে কেন?

ফুন্স কিছুকণ চুপ করে ভাবে। তারপর কনস্থির করে বলে, আমি যদি বলি প্রফেসর কার্লকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে একজন আততায়ী সর্বদা তাঁর পিছনে ঘুরছে—বিশ্বাস করতে পার?

অবাক বিষয়ে তাকিয়ে থাকে রোনটা। তারপর নীরবে মাথা নেড়ে জানায়—না।

ক্রাউস আর খিগ করে না। ওদের সেই দুইটার আনুসংগিক একটা বর্ণনা দেয়। উপসহোরে বলে, প্রফেসর কার্ল আমাকে বারণ করেছিলেন একথা কাউকে জানাতে। আমি কাউকেই বলিনি, অথচ কেমন করে আমি আর্নল্ড সেটা ভেটন ফেলেছে। রোনাকেও এতদিন বলিনি। আজ আর একটা ঘটনা ঘটায় মনে হল তোমার জানা উচিত। তাই বললাম। বিশ্বাস করতে পারলে?

—একটা সীম্বলস ফেনে রোনটা বললে, তুমি মিথিলাই আমাকে মিথ্যা কথাই বা বলবে কেন? তাহাজা আজ বুঝতে পারছি, আর্নল্ড কেন সেদিন আমাকে অত জেরা করছিল।

—কবে? কী জাতীয় জেরা?

কতকগুলো ঘটনা মেথিয়ে জানতে চাইল, তাদের আমি চিনি কিনা। লস অ্যালামসে তাদের আমি এখনও দেখছি কিনা। আমি সবচেয়ে অবাক ইলাম যখন আর্নল্ড বললো, আপনাকে যে এসং প্রকৃ পেরি তা কাউকে বলবেন না। আপনার স্বামীকেও নয়।

—কেন, তা জানতে চাওনি তুমি?

—চেয়েছিলাম। আর্নল্ড বলেছিল, এটা কার্ভের ভালর জন্যই। কিন্তু তুমি তখন কী বললে? আজ আর একটা ঘটনা কী, ঘটতে দেখেছি বলছিলে—

ফুকস্ সত্যসরি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করে, তুমি ডব্লিউ অ্যালেন নান কে-র নাম শুনেছ?

—শুনেছি। একটা খুশি বিশ্বাসঘাতক। কাগজে দেখছি তার জেল হয়েছে। ইন্দি হওয়া উচিত ছিল যদিও।

হাসল ফুকস্ ওর উত্তেজনা দেখে। বললে, তুমি 'ডেক্সটার'-এর নাম শুনেছ?

—কে ডেক্সটার? অনেক ডেক্সটারকেই আমি চিনি। ওটা একটা সাধারণ নাম। কার কথা বলছ তুমি?

ফুকস্ সংক্ষেপে লস অ্যালামসের তথাকথিত প্রত্যেক ডেক্সটার-এর কথা বলে। ইতিপূর্বে আর্নল্ড এবং তারও আগে লস অ্যালামসে ম্যাককিলিভি তাকে যেটুকু বলেছিল সেটুকুই জানত। শুনতে শুনতে কেমন যেন বিচলিত হয়ে ওঠে রোনটা। হঠাৎ চেয়ার থেকে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, এনাক। এনাক অফ ইউ। তুমি আজ কী দেখেছি বল?

ফুকস্ তারপর মাত্র আশ্বস্তি আগে যা দেখেছে তার একটা আনুশুংকিক বর্ণনা দেয়।

রোনটা বলে, তুমি নিশ্চয় ভুল দেখেছ, ভুল শুনেছ। এ কখনও সত্য হতে পারে। প্রফেসর কার্ল একজন সেবচরিত্রের মানুষ। তুমি ঠাণ্ডা না, না, হি হি।

ফুকস্ নিজেকে গুটিয়ে নেয়। বলে, তাই হবে—হয়তো ভুলই দেখেছি। ভুলই শুনেছি।

—নিশ্চয়ই। উনি তো সেই সকালে বেরিয়ে গেছেন। তাছাড়া দাড়ি-গোঁফ এটে—তোমার মাথা হারাণ।

ফুকস্ উঠে দাঁড়ায়। বলে, কই বের হয়ে বলেছিলে যে?

—না। মেজাজটা খিচড়ে গেছে। বস তুমি। আজ, ইন্ডের নামে শপথ নিয়ে বলতো ছুটি, তুমি নিজে এটা বিশ্বাস করতে পারছ? আমার স্বামী এতবড় বিশ্বাসঘাতক?

ফুকস্ একটুকুশ চুপ করে কী-যেন ভাবে। তারপর প্রতিটি শব্দ শব্দ উচ্চারণ করে বলে, ইন্ডের নামে শপথ আমি নিই না রোনটা। আমি ইন্ডের অস্তিত্ব বিশ্বাস করি না। আমি নাস্তিক।

এবার স্তম্ভিত হবার পালা রোনটার। অনেককাল নির্নিমেহ নয়নে সে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। তারপর অদ্ভুত স্বরে বললে, এ সব কী বলছ ছুটি। তুমি নাস্তিক?

—হ্যাঁ তাই।

—আজ বিশ বছর মেলামেশার পর তুমি আমাকে একথা বিশ্বাস করতে বল?

—বলি। এতদিন তোমাকে সাহস করে জানাইনি।

—আজই বা তাহলে জানালে কেন?

—আমার মনে হচ্ছে, তোমার-আমার শেষ বোঝাপড়ার দিন এসে গেছে। তোমার-আমার শেষ সিদ্ধান্তের আগে সবকিছু তোমার জেনে নেওয়া মরকাব।

—শেষ সিদ্ধান্তটা কিসের?

—প্রফেসর কার্লকে যদি ডিভোর্স করতে বাধ্য হও তারপর—

রোনটা একখানা হাত বাড়িয়ে দেয়। ধামতে বলছে ওকে। ফুকস্ কিন্তু ধামে না। বলে, ধামবার উপায় নেই রোনটা। এই হচ্ছে বাস্তব জগত। আমি ও ঘরে চলে যাচ্ছি। যদি মনটা খির হয়, বের হবার ইচ্ছে হয়, আমাকে ফোন কর বরং—

নিজের ঘরে ফিরে এসে কাবার্ড থেকে বের করে ছইক্সির বোতলটা। মনটা আজ অনেক হালকা বোধ হচ্ছে। এতদিনে সে মন খুলে সত্যি কথাটা বলে ফেলেছে। সে নাস্তিক। এটাই ছিল রোনটার সঙ্গে তার বিলনের পথে অন্যতম প্রধান বাধা। রোনটা ধর্মভীরু, তার বাপের মত। ক্রাউস মনে করে ঈশ্বর একটা ডাঁওতা। কতকগুলো ফন্দিবাজ লোকের একটা ঈকিবাজি। সাহস করে এতদিন রোনটাকে কথাটা বলতে পারেনি। আজ মনের তার নেমে গেছে। হঠাৎ ওর মাথায় একটা ফন্দি জাগে। প্রফেসর কার্লকে এতটু বাড়িয়ে দেখতে দোষ কী? হঠাৎপী লোকটা আসলে কে, সে কথা

তাহলেই সহজে বোকা যাবে। চট করে টেবিল থেকে একটা সাদা কাগজ তুলে নেয়। বা-হাতে কলমটা ধরে ক্যাপিটালস্ অফার করে বড় বড় করে লেখে, 'হুম্বেশ এবং হুম্বেশ সন্তোও তোমাকে কিছু ডি-তে পেরেছি।'

কাগজটা ভাঁজ করে একটা খামে বন্ধ করে। উপরে লেখে 'ডব্লিউ ক্রাউস ফুকস্, কম নং 728'। তারপর ঘরে ঢাখি নিয়ে নেমে যায় নিচে। রিসেপশন-কন্ডাক্টরে এসে দেখে মেয়েটি চলে গেছে। তার বললে অন্য একটা মেলে বসে আছে। তার হাতে খামটা দেয়। যন্ত্রচালিতের মত মেয়েটি পিছনের নখরি খোপে পিঠিখনা তেবে দেয়।

ফুকস্ আবার ফিরে আসে ওর ঘরে। বোতলটা টেনে নেয়। রেডিওটা খোলে। উৎকট জ্যাক বজছে কোথাও। বন্ধ করে দেয়। পাঠটা হাতে উঠে নিয়ে দাঁড়ায় জানালার পাশে। নিচে প্রবহমান নদীর সজ্জা। গাড়ির ক্যাডভেন 'দ্যর' নিগুন আলোয় জলকানি। বারে, পাবে, ট্রিপটাইজ নাদের আসতে নিচের তলার পর্দা এতক্ষণে জমজমাট। আর ও একা ঘরে বসে মধ্যাপন করছে। পাশের ঘরেও নিশ্চয় বসে আছে কাই হয়ে অধ্যাপকের শুভিবাযুগ্ম বর্ণপটী—খামীর সঙ্গে যার বাইশ বছর বয়সের ফারাক। 'বুজোর' বলে উঠে পড়ে ক্রাউস। চকচক করে পাঠের বাকি মনটুকু ঢেলে দেয় গলায়। হাতেল টিপটাইপেরে মুখটা মুছে নেয়। তারপর ঘর বন্ধ করে চলে যায় আবার পাশের ঘরে।

কিছু দ্বারের সামনে গিয়ে ধমকে দাঁড়িয়ে-পড়তে হল। ঘরের ভিতর বচসা হচ্ছে। দা-পতাকলা: নিশ্চয়, অর্থাৎ অধ্যাপক মশাই ফিরে এসেছেন এতক্ষণে। কী কথা হচ্ছে বোকা যাচ্ছে না—কিঃ দুজনেই উত্তেজিত। প্যায়ে প্যায়ে আবার ফিরে আসে নিজের ঘরে।

আবার ছইক্সির বোতলটা টেনে নেয়।

ঘটা-ডিনেক কেটে গেছে তারপর। বোতলটা কখন জানি শেষ হয়ে গেছে। তখনও ওর তৃষ্ণা মেটেনি। ছইক্সিতে এ তৃষ্ণা মিটেবে না বোধহয়। নৈশাহার হয়নি। ফলি বার্জার-এ ঘরে নৈশাহারের জন্য টেবিল বুক করা ছিল। ঘরনি। এখন কিন্তু যেতে যাবার মত শারীরিক অবস্থাও আর নেই। ইতিমত পা উলছে। জামা কাপড় ছেড়ে নৈশসজ্জা পরে নেয়। তারপর নীল বাতিটা ছেলে গ্রাহে। নিবিয়ে গুয়ে পড়ে। ঘুম আসে না কিছুতেই।

অনেক পরে মনে হল কে যেন ঘরে সন্তর্পণে ঢোকা দিচ্ছে। ফুকস্ বিরক্ত বোধ করে। ঘরের বাইরে সে বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছে 'বিরক্ত করবেন না'—তবু কে এল ছালাতে? টলতে টলতে এসে দরজা খুলে দিয়েই চমকে ওঠে একেবারে।

করিভারে খিচিট আসোয় দাঁড়িয়ে আছে রোনটা।

সন্ধ্যার সেই শাঙ্কনজ্জা নেই তার অঙ্গে। পরেয়ে একটা নাইটি। অদ্ভুত বিচিত্র বর্ণের সেই 'চলে-চালা পোশাকটা। হুসর রঙের সঙ্গে এসে মিশেছে কিছুটা সিঁদুরে লাল, কিছুটা বা হলুদ, কনলা অথবা নীল এমন বর্ণসম্মত সে কোথায় যেন দেখেছে। রামধনুর রঙে? প্রজাপতির পাবার? সূর্যাস্তের বর্ণসম্মত? ত্রিক মনে পড়ছে না। ছইক্সির একটা তরল পর্দা ওর স্মৃতিশেষে ঘবনিকার সৃষ্টি করেছে।

—তুমি।

নিমেষে রোনটা চুকে পড়ে ওর ঘরে। দরজাটা ঠেলে দেয়। ইয়েল-লক। তৎক্ষণাৎ তালাবদ্ধ হয়ে ফেল নিশ্চয়। খসটা ছিল অলো-ঈগারী। নীলাভ আলোর একটা মোহময় আকরণে ঢাকা। রোনটা দাঁড় বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা ছেলে দেয়। হঠাৎ আলোর বন্যায় চোখ ধাঁড়িয়ে গেল ক্রাউস-এর। ওর মনে হল রোনটা নাইটির নিচে অস্বাভাবিক পরেনি। ওর অঙ্গেরে মুখকামনা উদ্ভূত হয়ে উঠেছে। রোনটা কিছু লস লেক্সাস বিষয়ে সচেতন নয়। এসে বলল সে চেয়ারটা টেনে নিয়ে। একখানা কাগজ বাড়িয়ে ধরে বললে, পড়ে দেখ।

—কী ওখানা?—কাগজটা হাত বাড়িয়ে নেয়।

—এতটু আগে হোটেলের একজন বড় নিয়ে গেল।

প্রফেসর অটো কার্ল-এর সংক্ষিপ্ত পত্র। ক্রীকে লেখা। সন্ধ্যাখনবিটীন। লিখেছেন, বিশেষ লক্ষ্যে রিসেপশন তিনি কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছেন। রোনটা যেন ক্রাউসের সঙ্গে পরে সুবিধামত ফিরে আসে। ব্যাস। আর কিছু নয়।

—কী হতে পারে বল তো?

ফুকস্ প্রমাণটা এভাবে বলে, ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি তোমার?

—হয়েছিল। ঘন্টারানেক আগে এসে খামকা আমার সঙ্গে কণ্ডা করে গেছেন। বললেন, আমি নাকি ঠেকে চিঠি লিখে ভয় দেখাচ্ছি।

—কী চিঠি?

—কী জানি। কিছুই বলে বললেন না।

—কী করবে এখন?

—তাই তো পরামর্শ করতে এলাম তোমার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে? আমার পরামর্শ তুমি শুনবে?

—কেন শুনব না?

—আমি যে নাস্তিক। আমি যে বিশ্বাসঘাতক।

—গীজ, অমন করে বল না। তোমাকে আমি কোনদিনই বিশ্বাসঘাতক বলিনি।

—কিন্তু আমিও তো বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠতে পারি।

—না, পার না।

—পারি না? প্রফেসর কার্ল বিশ্বাস করে ঠার সুন্দরী যুবতী কীকে এভাবে ফেলে পালাতে পারেন, তুমি এমন নাহিটি পরে অসম্বোধে ব্যাডিলারের ঘরে আসতে পার, আর আমিই শুধু বর্ষের হয়ে উঠতে পারি না?

—না পার না, জুলি। কারণ তুমি জান তাহলে আমি আত্মহত্যা করব। আমি ক্রীতদাস, আমি বাহিন্য। আমি ব্যক্তিগতরূপে হতে পারিনা।

কন্ডাস নিরঙ্কর আকোশে বিছানার উপর একটা ঘুমি মারে।

রোনটা হেসে বলে, পুয়ের চাইন্স।

—থাক। রসিকতা কর না।—আবার উঠে যায় কাবার্ভের কাছে। আর একটা বোতল পেড়ে আনে। রোনটা বলে, আর খেও না। তোমার পা টলছে।

—তুমি পাশাপাশি।

—আর তুমি নাস্তিক। কিন্তু নাস্তিকদেরও একটা জিনিস থাকে জুলি, 'কোড অব এথিক্স'।

—কিন্তু আমি তো মানুষ।

—তাই তো সেদিন বলছিলাম—তুমি বিয়ে কর। সংসার কর।

—আর তুমি? তোমার কী হবে?

—আমার আবার কী হবে?

—তুমি এমন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন? নিজের চিকিৎসা করো না কেন?

জান হাসল রোনটা। ফুকস্ দু-পাত্র তরল পানীয় ঢালল। তারপর বললে, কই, জবাব দিলে না?

—কী জবাব দেব? এ রোগের চিকিৎসা নেই, আমি জানি।

—কী রোগ?

—এখন আর তা তোমাকে জানানো যাবে না।

—কেন?

—নাস্তিক ক'টা বলা যায় না।

পানীয় কন্ডালীতে ঢেলে দিয়ে আবার এক পাত্র ঢালে। বলে, বলতে তোমাকে হবে না। আমি জানি, তুমি তোমার রোগ। কী তার চিকিৎসা।

চৌকুর উপচে পড়ল রোনটার গলায়। বললে, তাই নাকি? শুনি একটু।

—তোমার 'ম' হওয়া দরকার। তুমি একজন গাইনোকোলজিস্টকে বিয়ে নিজেকে দেখাও।

রোনটা জবাব দেয় না। একতরফে পানপাত্রটা তুলে নেয় হাতে। এক সিপ মুখে দিয়ে বলে, তা প্রায়জন নেই। আমার কোনও আঙ্গিক ক্রটি নেই।

—তবে কি প্রফেসর?

এবারও ইতস্ততঃ করে রোনটা জবাব দিতে। তার হাতটা কাঁপছে। সেই সঙ্গে কাঁপছে তার হাতে তরল পানীয়টা। অনেকটা খেয়ে ফেলে একসঙ্গে। মুখটা মুছে নিয়ে বলে, এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কি তোমার উচিত হলে?

ফুকস্ খাটের প্রান্তে এগিয়ে আসে। রোনটার কাঁধে একবার হাত রাখে। বলে, হচ্ছে রোনটা। আমার সে অধিকার আছে। তবে কি প্রফেসরই দায়ী?

—হাঁজ। আমাকে জিজ্ঞাসা কর না, আমি বলতে পারব না।

দু-হাতে মুখ ঢেকে রোনটা। ফুকস্ দু-হাতে ওর অনাবৃত বাহুল শক্ত মুঠিতে ধরে একটা ঝাঁকানি দেয়, বলে—বলতে তোমাকে হবেই রোনটা। প্রফেসর কি নিতা হবার উপযুক্ত নন?

তবু মুখ থেকে হাত সরায় না রোনটা। তার সোনালী চুলে ভরা মাথাটায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বলে, আমি জানি না। বিশ্বাস কর, আমি জানি না।

—তবে কোন ডাক্তারের কাছে ঠাকে নিয়ে যাবনি কেন?

হঠাৎ হাত সরে গেল রোনটার। অক্ষরার্থ দুটি চোখের দুটি মেলে ধরে বলে,

—বিশ্বাস করবে জুলি? আলিসের মা এটাকে মেনে নিতে পারেনি। সে— অন্য সাধুনা খুঁজত।

—আর মানে? সব কথা আমাকে বল দেখি।

কিন্তু সব কথা বলে বলা যায়? ওর কাছেও? হঠাৎ একেবারে ভেঙে পড়ে রোনটা। উপড় হয়ে পড়ে ওর বালিসের উপর। ফুকস্ ওর ম্যাটিনাম-ব্রড চুলের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দেয়। সে স্পর্শে একবার শিউরে উঠে রোনটা। তার শিউরা ধরধর করে কাঁপতে থাকে। তারপর ঐভাবে মুখ পুকিয়েই বলে, বিবাহের আগেই প্রফেসর আমাকে প্রতিজ্ঞা দিয়েছিলেন—ঐর সন্তানের মা হতে হবে না আমাকে।

হঠাৎ জোর করে একে টেনে তোলে। দু-হাতে ওর বাহুল শক্ত করে ধরে মুখোমুখি বসিয়ে দেয়। বলে, প্রতিজ্ঞা। কিসের জন্য প্রতিজ্ঞা? তুমি চেয়েছিলে? কেন?

—তাও কি বলে নিতে হবে তোমাকে?

চোখ দুটো ছলে ওঠে মাতালটার। বলে, তুমি কি পাগল। আমার জন্যে।

হঠাৎ করকরিয়ে কেঁদে ফেলে রোনটা। ধরধরিয়ে কেঁপে ওঠে ওর ঠোঁট দুটো। অশ্রুটো বলে ফেলে, উড হু বিলিভ মি, জুলি, আর্ট মিস এজ, অফটার এইট ইয়ার্স অব ম্যারেড লাইফ— আমা... ইয়েট, ইয়েট—এ ভার্জিন।

—"ফোর— থ্রি— টু— ওয়ান— নাই।

"প্রকাণ্ড একটা ঘোড়ার বলয় পাক খেতে খেতে উপরে উঠে যাচ্ছে। ঘোড়ার কুণ্ডলীর উপর আর একটা আগুনের বলয়—তার কিনারাগুলো সিঁদুরে লাল। উপরে উপরে, আরও উপরে উঠে গেল। অনাবিকৃত একটা নরমতা অবিকৃত হল ওর চোখের সামনে। পারমাণবিক বন্ধনমুক্ত মহামুহুর্য নেমে এল এবার পৃথিবীর বুকের উপর।

"তারপর অব্যাহত একটা নিস্তব্ধতা। পুরো সেড মিনিট কেউ কেন কথা বলেনি।"



॥ সার ॥

পরদিন অনেক বেলায় ফুকস্-এর যখন ঘুম ভাঙল তখনও ওর মাথাটা ভার। কাল রাতের কথা আবার মনে পড়ছে। কী যেন ঘটেছিল? কে যেন এসেছিল ওর ঘরে? একে একে সব কথা মনে পড়তে লাগল। কখন পাশের ঘরে উঠে চলে গিয়েছিল রোনটা? মনে পড়ছে না। মুখ হাত ধুয়ে নিল প্রথমই। শরপপ জামাকাপড় বদলে যখন করল পাশের ঘরে। ফোন বেজেই গেল। ধরল না কেউ। কী ব্যাপার? কিন্তু রোনটা খুশাচ্ছে এখনও। তা তো হতেই পারে, ত্রিশ বছরের জীবনে এমন একটা রাত তার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।

আরও ঘন্টারানেক পরে আবার ফোন করল। এবারও নিস্তব্ধ।

গীজ-বুকের নিচে গিয়ে যা জানা গেল তা প্রায় অবিশ্বাস্য। মিসেস রোনটা কার্ল কোর-বল উঠে হোটেল থেকে চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন। ঠিকানা রেখে যাননি।



একটা দিন অপেক্ষা করল। যদি অন্য কোনও হোটেল থেকে রোনটা ফোন করে। তারপর  
চলিয়ে দেবে ফিরে গেল সে দ্বিতীয় দিন।

স্থানে তার জন্য প্রতীক্ষা করছিল সবাই।

অবশ্যই বন্ধ। দুদিন আগে মিসেস অটো কার্ল ফিরে এসেছিলেন। পাড়ার লোক  
মনেছে—সামগ্রীতে প্রচণ্ড কণ্ডা হয়েছিল রাসে। সকালবেলা ভানা গেছে অধ্যাপকদ্বারা আত্মহত্যা  
করেছেন। ফুকস যখন ফিরে এল তখনও বুতনেছের সংস্কার হয়নি।

ফ্রাউস ফুকস-এর মানসিক অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। কন্ডারকে একা বসে বইল সে সারাদিন।  
প্রফেসর কার্ল-এর চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারত না। কতটা জানেন তিনি? কতটা বলে  
ফেলছে রোনটা? এমনটা যে হবে, তা কে ভেবেছিল? সে বসে বসে সে-রাতের কথাটা ভাবে—না।  
সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে রোনটাকে বাধা করেনি। অত বড় জানোয়ার সে নয়। মনে পড়ে যায় অনেক  
অনেকদিন আগেকার সেই কথা। সেদিনও ওর চুখন-উদাত আনত দুখটা তৈলে দিতে চেয়েছিল।  
প্রথমে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছিল ওকে। ঠিক সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি কি  
আবার হয়নি এবার? তাহলে এমন কাণ্ডটা কেন করল রোনটা? তবে কি হেতুটা ফ্রাউস নিজে  
নয়—প্রফেসর কার্ল? রোনটা কি বুঝতে পেরেছে, প্রফেসর কার্ল এ কতকালের সবচেয়ে বড়  
বিশ্বাসঘাতক? শেষের প্রতি, মৃত্ত পৃথিবীর প্রতি জঘন্যতম অপরাধ করেছে যে-মানুষটা তাই সহধর্মিণী  
হয়ে বেঁচে থাকতে চায় না রোনটা।

হঠাৎ কনকন করে বেজে উঠল টেলিফোনটা।

মুন্ডের পার্শ্বটা নামিয়ে রেখে ফ্রাউস ফুকস টেলিফোনটা খুলে নেয়। সিকিউরিটি অফিসার জেমস  
আর্নল্ড একবার দেখা করতে চান। অবিলম্বে। ফুকস রীতিমত বিবর্তিত প্রকাশ করে বললে, মাপ করবেন,  
আমি অত্যন্ত ব্যস্ত। আজ আমি কোন কথা বলতে পারব না।

—আপনিই বরং মাপ করবেন আমাকে। আপনার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছি ডক্টর, কিন্তু  
আমি নিরপার। ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। আমি একবার আসছি।

ফুকসের লোক। না বললে শোনে না। ওরা মানুষের সুখ-দুঃখ, অনুভূতির দার দারে না।

একটু পরেই এসে উপস্থিত হল জেমস আর্নল্ড। বললে, আমি জানি মিসেস কার্ল ছিলেন আপনার  
গলাবন্ধনী। তার এমন পরিণামে আপনি যে কতটা মর্মান্বিত তা অনুমান করতে পারি। কিন্তু ইতিমধ্যে  
এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটেছে যাতে আপনাকে বিচলিত করতে বাধ্য হচ্ছি।

ফুকস পানীয়টুকু গলাধাক্কণ করে বললে, কলুন। আমি প্রস্তুত।

—পারীতে অথবা পথে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে দেখেছেন আপনি?

অগ্নানবদনে ফুকস বললে, না, তেমন কিছু তো আমার নজরে পড়েনি।

—মিসেস কার্ল কেন আত্মহত্যা করলেন কিছু অনুমান করতে পারেন?

—না।

—ফর রোর ইনফরমেশন ডক্টর, ঘটনার পূর্বদিন রাতে কলহের সময় ঠোরা বার বার যে শব্দটা  
উচ্চারণ করেছিলেন, কন্ডার কন্ডার বাইরে থেকে তা মনে হয়েছে—ট্রেইটার, বিশ্বাসঘাতক।

ফুকস নির্লিপ্তের মত বললে, দাম্পত্য-কলহে ও শব্দটা এমন কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। যে কোন শব্দ  
যখন মনে করে অপবপক্ষ তার প্রেমের মর্যাদা দিচ্ছে না তখন ঐ শব্দটা ব্যবহার করে।

আর্নল্ড ঘরোয়া হতে চায়। হোসে বলে, আপনি ব্যাচিলার হয়েও তো অনেক ধর রান্ধেন।

ফুকস কিন্তু হাসে না। মীর্ষবে আর এক পাত্র মদ ঢালতে থাকে।

—কিন্তু ব্যাপারটার ওখানেই শেষ হয়নি ডক্টর ফুকস। পনের দিন ঠোদের মেডসবার্টেই ভরোবি যখন  
প্রসূ করে গৃহকত্রী এমনভাবে আত্মহত্যা করলেন কেন, তখন অসম্ভব বুদ্ধিতে প্রফেসর  
বলেছিলেন—'রোনটা বিশ্বাসঘাতক, সত্য ঘর করতে চায় না বলে।'

ফুকস চমকে ওঠে। বলে, বলেন কী। তারপর? প্রফেসর এ কথার কী ভাবাবিধি করছেন?

—বরং না। তিনি কোনও জবাববন্দি দেননি এবং সেবেন না বলেছেন।

—আই সী।

আর্নল্ড একতরফে মোতল থেকে নিজের পাত্রে মদটা ঢালে। আরও ঘনিষ্ঠ বসতে চায়। প্র

করে, আপনি অমনভাবে চমকে উঠলেন কেন ডক্টর?

—চমকে উঠলাম? কই না তো? চমকে উঠব কেন?

—আমার মনে হল যেন আপনি বলতে চাইছেন মিসেস কার্ল শুধু দাম্পত্য জীবনের  
বিশ্বাসঘাতকতার প্রসঙ্গে একথা বলেননি।

ফুকস জবাব দেয় না। সে আরও সতর্ক হয়ে ওঠে।

—আর একটা কথা। পারীর হোটলে কি আপনি এমন একজন ব্যক্তিকে দেখেছিলেন, যাকে দেখতে  
অবিকল প্রফেসর কার্লের মতো, অথচ তার ফ্রেঞ্চকাটি মাড়ি আছে?

অগ্নানবদনে ফুকস বললে, কই না তো।

—রোনটা মাথা ঘাবার পর প্রফেসরের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে?

—হয়েছে। মানুষী সাহসনার কথা ছাড়া আর কিছুই আলোচনা হয়নি।

—হ্যাঁ কেন উনি পারী থেকে হারওয়ার্ডে ফিরে এলেন তা জানাননি?

—না। প্রস্তুতি করার অবকাশ পাইনি। উনি আর একটু মানসিক স্থৈর্য ফিরে পেলে জিজ্ঞাসা করব।

—করবেন। তিনি কী বলেন জানাবেন আমাকে।

—জানাব।

ওকে প্রসূ করতে হয়নি। প্রফেসর নিজেই বলেছিলেন। রোনটাকে সমাধিস্থ করার পরে একদিন  
প্রফেসর কার্ল এসে দেখা করলেন ফুকসের সঙ্গে। বললেন, তুমিই এবার হারওয়ার্ডে নাথার গ্যারন  
হলে। স্যার জন কর্ণকট অবসর নিচ্ছেন শুনছি নিশ্চয়, আর আমিও শব্দত্যাগ করছি।

—দাম্পত্য করছেন? আপনি। কেন?

—আমি চিরদিনের জন্য হারওয়ার্ডে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, ফ্রাউস।

—কেন স্যার?

—তোমাকে তো আগেই বলেছি তুলি—প্রত্যেক খ্রিস্টিয়ানের জীবনে এমন একটা 'কস' থাকে যার  
ভার তাকে নিজেই বহিতে হয়।

—আমাকে সব কথা খুলে বলবেন?

—কলহেই তো এসেছি। তবে সব কথা নয়। কারণ সবটা আমার নিজের কথা নয়—

—তবে কার? রোনটার?

—না, আমার সমস্ত-ভাইয়ের। রোনটার সব কথা তোমাকে খুলে বলতে আমার আশঙ্কা নেই। সে  
কথা শোনবার অধিকার তোমার আছে। কী জানতে চাও বল?

ফুকস কোন ইতস্তত করল না। সরাসরি চরম প্রশ্নটা একেবারে প্রথমই পেশ করে বসে, রোনটা  
আপনার সন্তানের জননী হয়নি কেন? অসুস্থ ছিল কে? আপনি না রোনটা?

বৃদ্ধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিদ্ধ করেন প্রশ্নকারীকে। প্রতিপ্রসূ করেন, রোনটা বলেনি তোমাকে।

—না। সে শুধু বলেছিল—বিবাহের আগেই আপনি নাকি কথা দিয়েছিলেন, আপনার সন্তানের  
জননী হতে হবে না তাকে।

—হ্যাঁ, ঠিক কথা। ঐরকম একটা প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম।

—কিন্তু কেন? কেন?

—কারণ কোন সন্তানের পিতা হবার মত শারীরিক ক্ষমতা আমার নেই। আলিসের মাঝে বিবাহ  
করে সেটা বুঝতে পেরেছিলাম আমি।

ফুকস অসহিষ্ণুর মত মাথা ঝাঁকিয়ে চাপা আত্ননাদ করে ওঠে, তবে সব জেনেও কেন ঐ ঐচ্ছিক  
বন্ধনের মোহেরি এতবড় সর্বনাশ আপনি করলেন? এজন্য পরলোকে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে  
না?

জান হাসলেন কার্ল। বললেন, পরলোক। তুমি মানো?

—না, মানি না, আমি মানি না, কিন্তু আপনি তো মানেন। এজন্য নিজেকে দায়ী মনে করেন না?

শান্ত সমাহিত করে অধ্যাপক বললেন, না। এজন্য আমি দায়ী করি তোমাকে।

—আমাকে?

—হ্যা, তোমাকে। এবার তুমি জবাবদিহি কর কেন এই পঁচিশ বছরের মেয়েটার এতবড় সর্বনাশ করবে; তুমি? কেন তাকে বিবাহ করনি? কেন তাকে বাধ্য করলে আমার সঙ্গে এমন অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে?

ক্রাউস দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। জবাব জোপালো না তার মুখে।

বৃদ্ধ তখন একে একে বলতে থাকেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। অদৃষ্টোচ্চৈঃ। যেন চার্চে এসে 'শনকেন্স' কবছেন। যেন ক্রাউস ওখানে উপস্থিত নেই। তিনি তাঁর বিচারকের সামনে সব কিছু মনের তার উজাড় করে বিবেচন:

যৌননের উদ্যোগে একটি কলেজে-পড়া গ্রাণ্ডঞ্চল মেয়ে ভালবেসেছিল একটি যুবককে। একই বাড়িতে থাকে ওরা, একই বয়সী প্রায়। ওদের মন জানাজানি হল। তারপর ছেলেটি হঠাৎ একদিন বাপন ছিড়ে সরে পড়তে চাইল। মেয়েটি গ্রাণ্ডঞ্চল বলে তাকে আকড়ে ধরতে চেয়েছিল—নির্লজ্জের মত বলেছিল, আমায় বিবাহ কর। ছেলেটি শোনেনি। প্রত্যাখ্যান করার একটা মনগড়া কৈফিয়ৎও দেখায়নি। পাখরের দেওয়ালে মাথা ঝুড়ে ফিরে এসেছিল মেয়েটি। তারপর অনেক পুরুষ এসেছে তার জীবনে, কিন্তু সে তার প্রথম প্রেমকে ভুলতে পারেনি। বাবা মারা গেলেন—চাইবোনেরা প্রতিহত হল জীবনে, বিয়ে করল। ও ছিন্ন করল—আজীবন বিবাহ কববে না। সম্মাসিনী হয়ে যাবে। 'নার্ন' হয়ে যাবে। কিন্তু সেই সংকল্পটাও তার হারিয়ে গেল, যখন অ্যালিসের মা ছয়মাসের শিশুকন্যাটিকে রেখে মারা গেলেন। পিতৃবধূ আত্মভোলা অধ্যাপক অটো কার্লকে দেখে মারা হল মেয়েটির। মা-হারা মেয়েটিকে সে বুকে তুলে নিল। সে নিজেই হতে চাইল অ্যালিসের মা। প্রফেসর কার্লই বরাং আপত্তি করেছিলেন। ব্যাসের পার্থক্যের জন্য নয়, যৌনজীবনে তিনি যে অশক্ত তা বুঝতে পেরেছিলেন অ্যালিসের মাকে বিবাহ করে। সত্যাপ্রবী প্রফেসর নির্দিষ্টায় সব কথা বুজে বলেছিলেন রোনটারকে। পরিবর্তে রোনটাও খুলে বলেছিল তার জীবনের গোপনতম লজ্জার কথাটা। সে প্রত্যাখ্যাত। বলেছিল, প্রফেসর, সম্মাসিনী হতে চেয়েছিলাম আমি, তা এও তো একরকম সম্মাসিনীর জীবন। অস্বস্ত—যুগ্মনেই নিষেধতার হাত থেকে তো মুক্তি পাব। আপনাব বিধবা মেয়ে থাকলেও তো তাকে বাড়িতে থাকতে দিতেন।

বৃদ্ধ চুপ করলেন। ফুকস্ তখনও বসে আছে স্থানুর মত। কিন্তু রেহাই দিলেন না তাকে অধ্যাপক কার্ল। বললেন, সত্যি করে বল তো জুলি, কেন প্রত্যাখ্যান করেছিলে তাকে?

ফুকস্ উঠে দাঁড়ায়। নীরবে পায়েচাচি করে কয়েকবার। তারপর বলে, প্রফেসর। প্রত্যেকের জীবনেই এমন একটা 'ক্রস' থাকে যার ভার তাকে একাই বহিতে হয়—

টীকাকর করে ওঠেন বৃদ্ধ। না। ওকথা বলার অধিকার তোমার নেই। ওটা ক্রিস্টিয়ানের কথা। তুমি ট্রাট্টিন নও। তুমি নাস্তিক। 'ক্রস' বইবার অধিকার তোমার নেই।

—আমি নাস্তিক। কে বলেছে আপনাকে?

প্রফেসর কার্ল নীরবে একটি খোলা চিঠি বার করে ওর হাতে দিলেন। রোনটার পত্র। শেষ পত্র। লিখে গেছে তার স্বামীকে। সম্বোধন করেছে, 'মাই ডিয়ার ওল্ড ড্যাডি' বলে। অকপটে সে বীকার করছে তার পবিত্র শেষ রজনীর অভিজ্ঞতা। সবিজ্ঞারে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। লিখেছে, আমার ইচ্ছা বিরুদ্ধে যদি এ দুখটনা ঘটত তাহলে নিজেকে ক্ষমা করতাম। তাহলে মিসেস অটো কার্লের পরিচয় বহন করতই জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তা তো হয়নি। আই ওয়ান্ট জেপেড। আই কোয়ামবেটেড। অ্যাণ্ড আই এঙ্কয়েড দ্য অর্গাজম। দ্যাটস্ হোয়াই আই হ্যাভ সিন্ড।

বৃদ্ধের ভিতর মুচড়ে উঠল ফুকস্-এর। রোনটা আত্মহত্যা করেনি—ক্রাউস তাকে হত্যা করেছে। মাগটা সে আর তুলতে পারে না।

—ইউ নিড্‌ট ড্রাপ, মাই বয়। আমি অস্বাভাবিক—কিন্তু তোমরা দুজনে যা করছে তাই তো স্বাভাবিক। টেক ইট ইজি।

তাই কি নেওয়া যায়। দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে ফুকস্।

প্রফেসর অন্যান্যনকৈঃ মত বলেন, রোনটাকে আমি ভালবাসতাম। প্রয়োজনে প্রটেক্টেইট হয়েও তার মুখ চেয়েই তাকে ডিভোর্স করবার সঙ্কল্প করেছিলাম। কথাটা তাকে বলা হয়নি। তোমাদের মন

জান-জানিও একটা সুযোগ করে দেবার জন্যই এভাবে একা পালিয়ে এসেছিলাম পারী থেকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না—

এবার মুখ থেকে হাতটা সরান। আঁঠুকাঠে বলে, দ্রোজ প্রফেসর। আমি একটু একা থাকতে চাই। তবৎকালে উঠে পড়েন অধ্যাপক। পকেট থেকে একটি মেশলাই বার করে ছালেন। এক মিনিটে, ভিতরেই রোনটার শেষ পত্রখানি অঙ্গারে পরিণত হল।

এর পরের অব্যয়টি কল্পন।

ক্রাউস ফুকস্-এর পরিবারে একাধিক লোক যে পাগল হয়ে গিয়েছিল, এতদিন পরে সে কথা মনে পড়ল তার। ওকি পাগল হয়ে যাচ্ছে? কারা যেন ওর চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। তারা কথা বলে। কী বলে তা ও বুঝতে পারে না। ও তাদের সঙ্গে তর্ক করে। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় না। কারও সঙ্গে মন খুঁটো কথা বলে না। আনন্দ আরো মাঝে আসে। বিরক্ত করে। একদিন এসে বললে, আমি নিশ্চিতভাবে জানি, প্রফেসর কার্ল আপনাকে রোনটার শেষ পত্রখানা দেখিয়েছিলেন। অস্বীকার করতে পারেন?

টীকাকর করে ওঠে ফুকস্, হ্যা, দেখিয়েছিলেন। কী হয়েছে তাতে?

—হয়নি কিছু। কী ছিল সেই চিঠিতে? বিশ্বাসঘাতক কে? কিসের? কেন?

—বলব না।

প্রফেসর কার্ল ইল্যাপ্ত ছেড়ে যাবার পাসপোর্ট শেলেন না। সব কথা বুজে না বলা পর্যন্ত তাঁনে নজরবন্দি করে রাখা হল সমুদ্র মেঝা যেট-ট্রিটনের মুক্ত কাবাগারে। ছাবার মত শুশুচর ঘুরছে তাঁর পিছনে বিদ্যারত্ন। আর একটি প্রমথ, একটি ইকিত শেলেই তাঁকে হেণ্ডার করা হবে। ডেজটারগাপে তাঁকে সনাক্ত করা যাবে। তার আর মেরী নেই। ইলেকট্রিক-ফেরার আর প্রফেসর কার্ল-এর মধ্যে বৈদ্যুতিক তারের সামান্য একটু ঝাঁক। তবু উনি অনমিত। কোনও জবাববন্দি সেবেন না, কোনও স্বীকৃতি স্বাক্ষরেন না। না, ডেজটার কে তা উনি জানেন না। অ্যাটমিক-এনার্জির গুণ্ডচরনলের কোনও সংবাদই তিনি জাখেন না। তাঁর পদচ্যাপপত্র গুহীত হল অবশ্য। এখন ব্যাঙ্কের জমানে অর্থই বাকি জীবনের পাঁচখয়। এ অবস্থায় কে তাঁকে নতুন চাকরি দেবে?

ফুকস্ আবার অনুভব করে তার চতুর্দিকে অবশ্য চক্ষুর মিছিল এসে জুটেছে। দিবারাত্রি কারা যেন তাকে পাহারা দিচ্ছে। দিক। সে ভ্রূক্ষেপ করে না। সে কোনও কথা স্বীকার করবে না। কারও কাছে নয়। কিন্তু রোনটা? তার কাছে যে একটি কৈফিয়ৎ আত্মও সেওয়া হয়নি।

ট্রিপিং পিল আর মসের মাত্রা বাড়ল। তবু ঘুম আসে না। জীবনের উদ্দেশ্যটাই বুকি হারিয়ে গেছে। কী হবে বৈঠে থেকে? এভাবে বৈঠে থেকে? স্বপ্নের তার বিশ্বাস নেই। রোনটার ছিল, ওর বাবার ছিল। তাঁরা সুখী। রোনটা বলেছিল যীশাস একদিন ওকে মেঘনারকের মত বুকে টেনে নেবেন। মত সব বুজুকি। যীশাস্ কে? দু-হাজার বছর আগেকার একটা বড় পাগল। পাগলামির ফলও পেয়েছে। কুলতে হয়েছে ক্রস থেকে। তার চেয়ে অনেক কাজের লোক প্রমিথিউস্, জিঘূসের কন্ড। থেকে সে আশুনটিকে চুরি করে এনেছিল। অবশ্য শেষরক্ষা হয়নি। ধরা পড়েছিল সেই। ইংগলে টেনে ছিড়ে ফেলেছিল তার নড়িভুড়ি। বুর। এসব স্বী আবোলতাবোল ভাবছে সে পাগলের মত? পাগলের মত। সে কি তবে পাগল হতে বলেছে?

—আমি নিশ্চিতভাবে জানি, প্রফেসর কার্ল আপনাকে রোনটার শেষ পত্রখানা দেখিয়েছেন। কী ছিল তাতে? বিশ্বাসঘাতক কে? কিসের? কেন?

—বলব না। বলব না। বলব না। এবং বেশ করব বলব না।

কেন বলবে? সে যে নিসাক্ষ লজ্জার কথা। তার, রোনটার আর প্রফেসর কার্ল-এর। কী নির্লজ্জ অশ্লীলভাষার খোলাগুলি লিখেছিল রোনটা এই চিঠিখানা। যেন ঝটতলার উপন্যাস লিখেছে। বের হলেই হ হ করে বিজি। কিন্তু রোনটাকে যে সেই কৈফিয়ৎটা দেওয়া হয়নি। কেন সে তার প্রথম-পেমকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। রোনটা কি একবার সামনে এসে দাঁড়াতে পারে না? মন উজাড় কবে ওকে সব কথা বলে ফেলার একটা সুযোগ দিতে পারে না? আত্মা, এমনও তো হতে পারে—বাস্তবের পরগোক আছে। আত্মা অবিনশ্বর। হততো রোনটা শুনতে পাবে তার কথা।



—আমি নিশ্চিতভাবে জানি, আপনি প্রফেসর কার্ল-এর গুপ্তহস্তাঙ্গী জেনে ফেলেছেন।  
 —হ্যাঁ ফেলছি।  
 —তবে স্বীকার করুন—তিনিই ডেক্সটার।  
 —আঃ! কী বিড়ম্বনা। তা কেন হবে? হতে পারে তাঁর যমজ ভাই রাশিয়ান গুপ্তচর। তাই তাঁর পিছনে গুপ্ত-আততায়ী খুঁজছে। তার মানে এ নয় যে, তিনিই সেই ডেক্সটার।  
 —তবে কে? তুমি জান। বল খুলে সব কথা।  
 —হ্যাঁ জানি। কিন্তু আমি বলছি না।  
 —জান? তুমি জান—ডেক্সটার কে?  
 —বলছি তো, জানি। তবে বলব না আমি, এবং বেশ করব বলব না।  
 —বলবে। বলতে তোমাকে হবেই। আমাদের না বল রোনটাকে বলে নাও। বী এ টু ক্রিস্টিয়ান।  
 নিজের ক্রস নিজেকেই বইতে হবে যে তোমাকে।

মধ্যরাত্রে একদিন উদ্দেশ্যের মত এসে হাজির হল ফুক্স জেমস্‌ আর্নল্ডের আপার্টমেন্টে। তার খুলে গেল সেখান থেকে পেয়ে কিশোরী বিন্ধ্যিত হল না আর্নল্ড। বললে, আসুন, আপনার জন্যই জেগে বসেছিলাম। আমি জানতাম, আপনি আসবেন।  
 —আপনি জানতেন? জানতেন, আমি আজ রাতে আসব?  
 —আজ রাতেই আসবেন তা জানতাম না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে আসবেন তা জানতাম। এতদিনে মনস্থির করেছেন? বলবেন সব কথা খুলে?  
 —বলব। এখনই—  
 —বলুন তবে।—কাজজ কজম টেনে নেয় আর্নল্ড।  
 —না, আপনারা বলব না। বলব রোনটাকে।  
 —রোনটাকে!—বিহ্বল হয়ে পড়ে আর্নল্ড।  
 —হ্যাঁ। একটা টেপ-রেকর্ডার বসিয়ে দিন ঐ টেবিলটায়। অনেকগুলো রীল রেখে যান। আর হ্যাঁ—এক বোতল ছইস্ট্রি। ফর হেভেনস্‌ সেক, আমাকে কোনভাবে ডিসটার্ভ করবেন না। বাড়ি ছেড়ে চলে যান। ঘন্টা দু-তিন পরে ফিরে এসে টেপটা ব্যক্তিগত শুনবেন।  
 —আজ যু রীজ, সার।  
 আর্নল্ড তৎক্ষণাৎ যন্ত্রটা বসিয়ে দেয় গর সামনে। ছইস্ট্রির বোতল আর ব্রান্ডটা বাসে ব্যতের কাছে। এনবচরিত্র সে ভালবাকমই বেছে। আপ্যায় করে, এখন এই অর্ধেকঘণ্টা অবস্থার ফুক্স যদি স্বেচ্ছায় সব কথা স্বীকার করে তবেই বহুসীতা পরিষ্কার হবে। রাত শেষেই হয়তো তার মতটাও পালটে যাবে। তখন আর কিছুতেই নাগাল পাওয়া যাবে না তার।  
 নির্জন ঘরে তার প্রথম-প্রেমের মুখোমুখি বসল জর্জের ড্রাইস ফুক্স। মইকটাকে চুপন করল। তারপর ফিসফিস করে ডাকল, রোনটা। রোনটা।



॥ আট ॥

—আমাদের বংশে কিছু পাগল আছে, জানলে রোনটা? আমার বাবা হচ্ছেন এক নরক পাগল। তাঁকে তো তুমি ভাল বকমই চেন। তাঁর ধারণা তিনি হচ্ছেন অ্যাটলান্স—জগৎকল এক পৃথিবীর ভাব বহন করতেই তিনি এসেছেন এ পৃথিবীতে। জিহ্বাল বুরি ছকুম দিয়েছে—ওটা ঘাড়ে করে চুপচাপ বসে থাক। বাস। বাবা ডাইনে তাকায় না, বাঁয়ে তাকায় না—জগৎকল পৃথিবী ঘাড়ে করে বসে আছে সারগীতী জীবন। আর এক পাগল ছিল প্রমিথিডাস। তাকে তুমি চেন না। তার কথা থাক। এছাড়া আমার ছোট বোন এবং মা-ও পাগল হয়েছিল। আমি কিন্তু তা-বলে পাগল নই। এ আমার আদৌ পাগলামি নয়। বীর হির মস্তিষ্কে সব কথা তোমাকে জানাতে এসেছি। আমি একটা বুরি—বুরি একা নয়, গুহাও এটা জানবে। তা জানুক। আজ গোটা পৃথিবীটাকে ডেকে এ কথা শোনাতে চাই—আমার কথা তোমার কথা। ভেবে দেখা, এ ছাড়া পথ নেই। তোমার 'ড্যাড'-কে না হলে ওরা মুক্তি দেবে না। এখনই তো প্রায়

অন্তর্গত হয়ে আছেন, দুদিন পরে তাঁকে ছেলে গুরবে। ওদের যে ধারণা হয়েছে—তিনিই সেই বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে খুবিত বিশ্বাসঘাতক ডেক্সটার। কথাটা সত্য নয়। বিশ্বাস কর রোনটা—কথাটা সত্য নয়। ওরা ভুল বোঝে বুকুক—কিন্তু তুমি তেমন করে বিশ্বাস করলে—তোমার ড্যাডি এতবড় পাগলজ্ঞতা করবেন।

—কী বললে? তা হলে কে সেই ডেক্সটার? আমি চিনি কি না? হ্যাঁ, আমি চিনি। না—রিচার্ড কইনহান নয়, তবুও ওশেনহাইমার নয়, প্রফেসর অটো কার্লও নয়। ডেক্সটার হচ্ছে সেই হতভাগ্য যার বাহকসনে তুমি বরা নিয়েছিলে। জর্জের ছবি ড্রাইস ফুক্স।

—জর্জ রোনটা। ও-ভাবে বৃথায় মুখ ঘুরিয়ে নিও না। আমার কথাটা শেষ পর্যন্ত শোন। একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করি, কেমন?

—তুমি জান, আমার জন্ম ফ্রান্সফোর্ট-এর কাছাকাছি একটা গ্রাম—বাসেলশীম-এ ১৯১১-তে। না, পঁচিশে ডিসেম্বর নয়, তার চারদিন পরে। প্রায় শীতের রাতে। আমরা দুই ভাই, দুই বোন। দাদা বের্ডার্ড, মিলি ক্রিস্টি, আমি, আর আমার ছোট বোন লিজা। বাবা ছিলেন পাদরী—প্যাস্টার এমিল ফুক্স। জীহান ধর্মযাজক হয়েছিলেন অনেক পরে—উনিশ শ' পঁচিশে; আমার বয়স তখন বছর চৌদ্দ। তার আগে তিনি ছিলেন একটি কারখানার মেশিনওয়ান। সেল আর ওয়েল্ডিং-এর দক্ষ কারিগর। সে-মুহুরে কথা তুমি জান না। তুমি যখন তাঁকে দেখেছ তখন তিনি কোয়েকাল সম্প্রদায়ভুক্ত। বিশ্বহত্যার পূজারী—সোসাইটি অব ফ্রেন্ডস্-এর একজন কর্ণধার। আমি তাঁকে মিস্ট্রী হিসাবেও দেখেছি।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। তখন আমার বয়স কত হবে? এই ধর হয়ে-সাত। আমরা থাকতাম ফ্রান্সফোর্টের কাছাকাছি একটা কারখানার বাড়িতে। দু-কামরার একটা ছোট বাড়িতে। সৎ ও দক্ষ কর্মী হিসাবে কারখানায় বাবার খুব সুনাম ছিল। সবাই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। এই সময় আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রলোকের কুকুরের বাচ্চা হল। ভারী সুন্দর বাচ্চাগুলো। লোমের তর্জি। আমি আর লিজা রোজ ঐ কুকুরছানাগুলোকে দেখতে যেতাম। ভদ্রলোকের নামটা আজ আর মনে নেই, তবে তাঁর চেহারাটা মনে আছে। আমাদের পাড়ায় মনিহারি দোকানের মালিক। মধ্যবয়সী, মোটা, একমাথা টাক। রোজ আমাদের তাইবোনকে কুকুরের লোতে আসতে দেখে উনি একদিন নিজে থেকেই বললেন, কী বোকা? একটা কুকুরছানা নেবে?

আমি তো লাকিয়ে উঠি। বলি, দেবেন?

—সেব। তবে কিনা-পরসায় নয়। দাম দিতে হবে। এক মার্ক।

এক মার্ক কতটা তখনও বুঝি না। তবে বাবা-মা দুজনেই আমাকে খুব ভালবাসেন। একটা মার্ক কি আর দেবেন না? আমি নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে আসি। মাকে বলি, মা একটা মার্ক সেবে? ঐ দোকানদার ভদ্রলোক তারলে আমাকে একটা কুকুরছানা সেবেন বলেছেন।

মা জানতেন, কুকুরছানাটা আমার ছাপ। তৎক্ষণাৎ এক ডরেশমার্ক আমার হাতে দিলেন। আমার নাচতে নাচতে আমি ভদ্রলোকের কাছে ফিরে গেলাম। উনি বোধহয় আপা করেননি আমি বাড়ি থেকে একটা ডরেশমার্ক নিয়ে আসতে পারব। আসলে কুকুরছানাটা হস্তান্তরের কোনও বাসনাই ছিল না তাঁর। শুধু শুধু বাচ্চা পেয়ে আমাকে নাচাচ্ছিলেন। এখন কায়দা করে বললেন, এরকম মার্ক-এ তো হবে না বোকা। দেখে না, আমার কুকুরের লেজ নেই। ডরেশমার্কও 'টেইল' থাকলে চলবে না। এমন মার্ক আনতে হবে যার দু-টিকেই হেড অর্থাৎ দুটিকেই কইলারের মুখ ছাপা।

আমি অভিমান করে বলি, সে কথা আগে বললেই হত।

আবার ফিরে এলাম বাড়িতে। মাকে বলি, এ মার্ক হবে না মা, কুকুরের যে লেজ নেই। দু-মুখে রাজার ছাপ-ওয়ালা মার্ক একটা নাও।

মা তো আমার হাত পাগল নয়। বললেন, এমন মার্ক হয় না বাচ্চা। ও-লোকটা তোমাকে কুকুরছানা সেবে না, তাই এমন অব্যবহৃত দাবী করছে।

আমি কিছুতেই শুনব না। ক্রমাগত চ্যানথ্যান করতে থাকি। শেষেমেম মা আর মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে এক যা মেয়েই বসেন আমাকে। অভিমানে আমি সারাদিন জলপল্লি করি না। মা অনেক



সাধারণতঃ করালেন, চাক্ষুশ্যে কী-ভাবে মুক্তা হাঙ্গা হয় বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমিও অধুনা।  
সাতটা দিন প্রায়পূর্ণশেনেই গেল।

সন্ধ্যার পর বাবা ফিরলেন। প্যাণ্টের কুকুস নন, লেদম্যান ফুকুস। আমার বিরুদ্ধে আমার এবং আমার  
বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ মন দিয়ে শুনলেন। তারপর মাকেই ধমক দিলেন, তা তুমিও তো আচ্ছা বাপু।  
শুনল কুকুসটার লোক নেই। বাবা বুঝে দু-দিকে বাজার ঘুর-ওয়ালা একটা মার্ক গুণে দিলেই পাবতে।

মা রাগ করে বললেন, তুমিও ওকে সেপিয়ে তুলছ। এমনিতে পাগল ছেলেটা সাধারণ আরমি—  
বাবা বাধা দিয়ে বললেন, তুমি খাম সেমি।

তারপর আমাকে বললেন, ঠিক আছে বোকা। ভাল তোমাকে আমি অফিস থেকে অমন একটা মার্ক  
এনে দেব। চল, এবার আমরা খেয়ে নিই।

আমি সোৎসাহে বলি, তোমার অফিসে অমন দু-মুখো মার্ক আছে?

—কত।

মা বাবাকে ধমক দেন, কেন নাচাচ্ছ ওকে? কাল আমার এই কাণ্ড হবে।

বাবা বললেন, সে তোমাকে ভাবতে হবে না। যাও, আমাদের বুজনের খাবার নিয়ে এস।  
পরদিন সাতটা দিনমান আমি বাবার ফেরার পথ চেয়ে বসে থাকি। সন্ধ্যার পর তিনি ফিরতেই আমি  
লাফিয়ে উঠি, আমার সেই দু-মুখো মার্ক?

বাবা অন্যমনস্কের মত পকেট থেকে একটা মার্ক নিয়ে আমার নিকে ছুঁতে দিলেন। কুড়িয়ে নিয়ে  
আমি একেবারে লাফিয়ে উঠি। বুদিকেই 'হেড', 'টেইল' নেই।

তখনই ছুটে বেগিয়ে গেলাম এবং মিনিট পনের পর কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলাম বাড়িতে।

সেমি, ইতিমধ্যে মা বাবার জন্য খাবার বেতে দিয়েছেন। বাবা কিন্তু খেতে বসেননি। আলমারি থেকে  
তার মোনলা বন্ধুটো নিয়ে পরিষ্কার করছেন। আমি ফিরতেই বললেন—কী হল জুলি? কাঁদছিল কেন?  
কুকুরছানা কই?

আমি চোখ মুছতে মুছতে বলি, দিল না। বললে, এটা অচল মার্ক।

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। বন্ধুটোও তুলে নিলেন হাতে। বললেন, আর সেমি আমার সঙ্গে।

মা শিঙন থেকে ডাকেন, কোথায় বাজ? খেয়ে যাও। ও লোকটা কুকুরছানা সেবে না, বুঝতে পারছ  
না?

—বাবারটা তুলে রাখ। ফিরে এসে বাব।

আমার বয়স, আগেই বলেছি, তখন ছিল মাত্র ছয় কি সাত। তবু দুশটা স্পষ্ট দেখতে পাই আঙও।  
বাবা ছিলেন অত্যন্ত শান্ত নম স্বভাবের মানুষ। কোনদিন তাঁকে রাগতে দেখিনি। অথচ সেদিন তাঁকে  
ছলন্ত আগেরগিরির মত ছলে উঠতে দেখেছিলাম। বাবার সেই কহমূর্তির সামনে মোকানবার ভয়লোক  
একেবারে কেঁচে। বাবা বললেন, আপনি মানুষ না জানোয়ার মশাই? আমার ছেলেকে কেন এভাবে  
মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়েছেন? জবাব দিন?

লোকটা আমতা আমতা করে বলে, কিন্তু এটা যে অচল মার্ক সার।

—আমিও তো তাই বলছি। এমন মার্ক হয় না জেনেও তা কেন দাবী করেছিলেন আপনি? আপনি  
কী চান? জার্মানির সব শিশু বড় হয়ে আপনার মত জোক্তোর হক?

—আমার মতো জোক্তোর?

—জ্যাচুর নয়। প্রথমত অসঙ্গত দাবী, দ্বিতীয়ত ও তা পূরণ করার পরেও আপনি আপনার  
প্রতিশ্রুতি রাখেননি। আপনি কুকুরছানাটি একে না দিলে আমি আপনাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতো।  
'পাবলিক' নুইসেশ হিসাবে মাজার দড়ি পরাবো আপনার।

ভয়লোক হাত দুটি জোর করে বলল, সার, নিয়ে যান আপনার কুকুরছানা। ঐ অচল মার্ক আর  
আমার প্রয়োজন নেই। আমিই বরা উঠে আপনাকে পাঁচ মার্ক দিচ্ছি—শুধু বলে যান, অমন একটা  
দু-মুখো মার্ক কোথা থেকে পয়সা করলেন আপনি।

কুকুরছানা নিয়ে আমরা ফিরে এলাম।

তুমি হয়তো ভাবছ এসব অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী কেন শোনছি তোমাকে। অসংলগ্ন-গল্প নয়,

বোনাম—এ কাহিনীও প্রাসঙ্গিক। আমি যা করেছি তা কেন করেছি বুঝতে হলে তোমাকে জানতে  
হবে কী ভাবে আমি গড়ে উঠেছি।

সেমি বুঝি, যাক বুঝতে পারি কী পরিশ্রম করে সেই দল কারিগরটি দুটি মার্কের মাকানতি  
মেসিনে চিরে আবার ভোড়া দিয়েছিলেন। কেন? তার উদ্দেশ্য ছিল—তার সন্ধান ঘেন ভাগ্যেই না  
শেষে। ছয় বছরের ছেলের কথার বেলোপ হতে সেবেন না বলে এতটা পরিশ্রম করেছেন। এইভাবেই  
তিনি চরিত্রটা গঠন করতে চেয়েছিলেন।

আমার বয়স তখন চৌদ্দ, তখন বাবা কোয়েকাস হলেন। বিশ্বভারতের পুজারী। চাটো  
শনুটান-ভিত্তিক ধর্মের ভাঙা নয়, তিনি বাসাস-এর ঐ একটি বাটীকেই মূলমন্ত্র করলেন—'লাভ দাই  
নেবার'। বিশ্বপ্রেম। মানবপ্রেম ময় হল তার—বাতিপাত সুখসুবিধা বিসর্জন দিয়ে। আমাদের বাড়ির  
আর সবাই হাতারহাতি ধার্মিক হয়ে উঠল—কেউ আন্তরিক, কেউ বাবাকে খুশি করতে। একমাত্র  
ব্যতিক্রম চৌদ্দ বছরের একটি শিশুর—প্রহ্লাদকুলে দৈত্য—এই জুলিয়ান ব্রাউস ফুকুস। মনে মনে  
আমি নিরীশ্বরবাদী ছিলাম। মনে করতাম যে একটা ভড়া। বিজ্ঞানচর্চা শুরু করেছি তখন। যাব প্রমাণ  
নেই তা মানি না। বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ পাও ইশ্বর আছে, তাইই মানবো, নচেৎ নয়। অবশ্য আমার এ  
মনোভাব কাউকে কখনও বলিনি। বাবা সেটা ঠিক শেলেন আরও দু বছর পরে, আমার সপ্তদশ  
জন্মদিনে।

জন্মদিনে বাবা আমাকে উপহার দিলেন বাসাস-এর একটা ছবি। ফ্রেমে ঝালালো। আমার পড়বার  
টেবিলে সেটা রেখে দিলেন আর নিজে হাতে লিখে দিলেন সুইস বিদ্রোহী-কবি উইলিয়াম টেল এর  
একটি চার-আইনের কবিতা:

চিরউন্নত বিদ্রোহী শির লোটিবে না কারও পায়ে

তোমারেই শুধু করিব প্রণাম, অন্তরতম প্রভু।

জীবনের শেষ শোণিতবিন্দু দিয়ে যাব বেশ-তাইয়ে

রহিব বিবেক। সে শুধু আমার। বিদ্রোহী না তারে কড়ু।

বললেন, জুলি, এটাই আমার জীবনের রত। এই রতে তুমিও দীক্ষা নিও। আমি জবাব দিইনি।  
পরদিন বাবা খুম ভেঙে উঠে দেখলেন বাসাসের ছবিখানি তাঁর টেবিলের উপর রাখা। কাগপটা  
জানতে আমার ঘরে উঠে এলেন—দেখলেন ঐ কবিতার দ্বিতীয় লাইনটা আমি মুখে নিয়েছি।  
বাবা বিস্মিত হয়ে হস্ট করলেন এর হেতু কী।

আমি কবিতার শেষ পংক্তিটা আবৃত্তি করলাম মাত্র।

বাবা কিন্তু রাগ করেননি। দীর্ঘসময় আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন—কিন্তু আমার মত  
পরিবর্তন করতে পারেননি। বিজ্ঞান যা জানতে পারেনি আমি তা কিছুতেই মানতে পারলাম না।

আমি নিরীশ্বরবাদী হওয়ার বাবা নিশ্চয় প্রস্তুত হয়েছেন, আহত হয়েছেন—কিন্তু জোর জবাবদি  
করেননি। মেনে নিয়েছেন আমার যুক্তি। তিনি বলতেন, সময় হলেই প্রভু যীশু মেয়দানকের মত  
তোমাকে কোলে টেনে নেবেন।

লাইপজিগ কলেজে ভর্তি হলাম। ঐ সময়েই কার্ল মার্কস পড়তে শুরু করি। দাস কাপিটাল এবং  
একোলস-এর ভাব। এতদিনে পথের সন্ধান পেলাম। হাতে পেলাম আমার বাইবেল। আমি কমুনিষ্ট  
হলাম। মনে প্রাণে। কলেজে পাটি-পসিটিঙ্গে যোগ দিয়েছি। সক্রিয় অংশ নিয়েছি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য  
হেরে গেলাম আমরা। ন্যাশনাল সোসালিস্টরা ক্ষমতা দখল করল। অর্থাৎ হিটলারের নাৎসী পার্টি।  
1933-এ একদিন কিয়েল থেকে ট্রেনে করে বার্লিন যাচ্ছি হঠাৎ দরবার কাগজে সেক্স্যাম ওরা  
রাইখস্ট্যাগে আগুন দিয়েছে। কমুনিষ্ট ছাত্রদের ঘরে গুলে হত্যা করছে। তৎক্ষণাৎ কোটের হাতা থেকে  
আমি পার্টি-বাজটা খুলে ফেঁসলাম। কলেজে আর গেলাম না। শুরু হল আমার আশ্রয়-প্রার্থী জীবন।  
প্রথমে মাস দুয়েক জার্মানিতেই ছিলাম। পালিয়ে পালিয়ে। শুনলাম, আমাদের বাড়িতে নাৎসী ছাত্ররা  
চড়াও হয়েছিল। হামলা করেছে বাবার উপর। কলেজের ইস্টেলেও আমাদের তল-তল করে খুঁজছে।  
করা পড়লে ওরা নিশ্চয় আমাকে হত্যা করত। কিন্তু ওরা আমাকে ধরতে পারেনি। সীমান্ত পেরিয়ে চলে  
গেলাম ফ্রান্সে। পাবীতে ছিলাম প্রথমে, তারপর উদ্বাস্ত হিসাবে চলে গেলাম ইংলণ্ডে।

এর পরের অধ্যায়টা তুমি জান। আশ্রয় পেলাম একটি কোয়েন্সার পরিবারের। ঐ পরিবারে একটি মেয়েকে ভালবেসে ফেললাম। মেয়েটিও আমাকে তীব্রভাবে ভালবেসে ফেলে। কিন্তু আমি যে তার আগেই আমার জীবনের ব্রত ছিন্ন করে ফেলেছি। বাবা ছিলেন বিশ্বাসভঙ্গের পূজারী, আমি বিশ্ব-সাম্যবাদের। আমার জীবনের লক্ষ্য হল হিটলারকে তাড়িয়ে আমরা, কমুনিষ্টরা, বার্লিন দখল করব। আমার সে স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে, বোনটি। 1945-এর রিশে এপ্রিল সেই রাইখস্ট্যাগের উপর কান্টে-হাউজি-আঁকা লাল পতাকাটা আমরা উড়িয়েছি।

কিন্তু এ কী জার্মানী ফেরৎ পেলাম আমরা? বার্লিনের মার্কামার্কি উঠল পাঁচিল। এপারের জার্মানী ওপারের জার্মানী অর্থাৎ দু'দিকের মানুষ আজ স্বদেশবাসী নয়। তাদের মাঝখানে আজ দু'স্তর ব্যবধান।

ময়গুপ্তি জিনিসটা আছে আমার কাছে। আমি যে সাম্যবাদের পূজারী তা ঘৃণাকরে জানতে পারিনি কেউ, আমি ইলেক্ট্রো আসার পর। এখানে আমি ছিলাম ভাল ছেলে। ছাত্রানাম অধারনং তপা। নিজে আঠারো ঘণ্টা বিজ্ঞান-চর্চা করেছি। সে তুমি দেখেছ। কিন্তু তুমিও জানতে পারিনি আমি হাত জোড়ে যাকুনীতিয় বই পড়তাম। মার্কস-এংগেলস-লেনিনের বাণী আমার কর্ণস্থ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও ছিল অনেক কমুনিষ্ট। তাদের সঙ্গে আমি কিন্তু কোন যোগাযোগ রাখিনি। কারণ আমি লুকিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম। স্টল্যাভ-ইয়ার্ড তাই সিনিকিউরিটি ক্রিয়ারেশ নেওয়ার সময় আমার বিরুদ্ধে কিছুই খুঁজে পায়নি। ছিল একটি মাত্র রিপোর্ট। হিটলারের গেস্টাফো-বাহিনী আমাকে ফেরত পাঠাতে বলেছিল প্রাকযুদ্ধ-যুগে। বলেছিল, আমি নাকি কমুনিষ্ট। স্টল্যাভ-ইয়ার্ড সে রিপোর্টের উপর কোনও গুরুত্ব আরোপ করেননি কারণ নাৎসীরা তাদের বিরুদ্ধবাহিনীদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই মিথ্যা কথা বলতো।

উদ্বাস্ত জীবনের প্রথমের দ্বিতীয় করেছিলাম, একলা চলার পথে চল। তাই চলেছি সান্ত্বনাকর। এমন কি সে মেয়েটিকে ভালবেসেছিলাম তাকেও মন খুলে বলতে পারিনি আমার প্রাণদান কথা। আমার জীবন উৎসাহীকৃত। যে কোনদিন আমি ধরা পড়ে যেতে পারি। তৎক্ষণাৎ অবগতির নৃত্য। তাই মেয়েটিকে গ্রহণ করতে পারিনি। তা-ছাড়া আরও একটি বাধা ছিল। সেটাকে অনতিক্রম্য। আমরা ছিলাম নিপীড়িত মেকর বাসিন্দা। মেয়েটি শরম ঈশ্বরবিশ্বাসী, আমি চরম নাস্তিক। মেয়েটির কাছে ধর্মই ছিল জীবনের নিউক্লিয়াস আমার জীবনে নিউক্লিয়াস ফিজিক্স ছিল ধর্ম। তৎকালবিত্ত ধর্ম আমার কাছে আকির্ষের বোনা। কেমন করে মেলাবো বল এমন বিশ্রীত মেকর বাসিন্দাকে।

অতঃপর আশ্রয় দেখ। কী অকৃত ঘটনাচক্র। সেই মেয়েটির জীবন জড়িয়ে গেল আমার সঙ্গে নির্বিড়ভাবে। আমার জন্যই জীবন দিল সে। আমিও আজ জীবন দিতে বাসেছি তার জন্য।

বিশ্বাস কর বোনটি—তোমার ড্যাভি, প্রফেসর কার্ল এর সাথে-পাঠে নেই। তাঁর যমজভাই আজ রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসতে চায়। কেন চায়, তা জানি না। তিনিও প্রফেসর কলিংবার সহকর্মী। নিঃসন্দেহে তাঁর কাছ থেকেই প্রফেসর কার্ল কলিংবার শেষ সংবাদটা পেয়েছিলেন, আমার কাছে প্রীকার করেননি। প্রফেসর কার্ল-এর ধারণা এবং আনন্দের পূর্ণ বিশ্বাস—সেলিন তাঁকেই গুলি করে মারতে চেয়েছিল সেই আততায়ী। হয়তো তাঁকে হ্যাঙ্গ বলে ভুল করেছিল হত্যাকাণ্ডী। আবার তা নাও হতে পারে। হয়তো আমাকেই মারতে চেয়েছিল সে।

1942-এ আমি প্রথম রাশিয়ান গুপ্তচরদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। নিজে থেকে। কেমন করে জান। আমি সোজা চলে গিয়েছিলাম লণ্ডনের রাশিয়ান এম্বাসীতে। ছদ্মবেশে। তখন আমি ব্রিটিশ আটমিক রিসার্চে নিযুক্ত। ওরা আমার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন গুপ্তচর ওরা কখনও দেখেনি—যে ছেলেমানুষ স্বর দিয়ে আসে। বিনিময়ে যে অর্থ দাবী করে না। ওরা বললে, এর পর যেন কোন কারণেই ওদের এম্বাসীতে না আসি। যোগাযোগ বন্ধা করত একটি ছেলে। তার আসল নামটা জানি না। ছদ্মনাম ছিল আলেকজান্ডার\*। নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে সে হাজির হত। আমি তার হাতে তুলে দিতাম আমার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল। শুধু আমার নিজে হাতে করা এক্সপেরিমেন্টের কথাই তখন জানাতাম আমি। কারণ আমার বিবেক বলত, যৎকিঞ্চিৎ ফলাফল আমার নিজস্ব সম্পত্তি। আমার মস্তিষ্ক থেকে

যা বার ওয়ে উৎসাহিতানা আমার নিজেই। ছোটটি অবশ্য তথ্য জানতে চাইত। আমি জানাতাম না। বলতাম, ওপারের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল আমার বালিকানা নেই। জানলেও তা আমি শুনতাম না।

‘তবিরে বিবেক। সে শুধু আমার। বিকাবো না তারে কতু।’

এর পরেই একটা আঘাত পেলাম। রাশিয়ান ছোকরার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করলাম। আঘাতটা কী জান। বার্লিন হিটলারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন। অন্যতমশাস্ত্র চুক্তি। আমি মরমে মরে গেলাম। জার্মানিকে কোন দিন মহান নেতা বলে মনে হয়নি আমার। আমি বয়ঃ ছিলাম চুটকির তরু। কিন্তু বার্লিন বন্ধ রাশিয়ার একমাত্র হয়ে পড়লেন তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে মেনে নিলাম। বিশ্বসাম্যের বাস্তবে। হিটলারের সঙ্গে যেদিন বার্লিন চুক্তিবদ্ধ হলেন সেইদিনই ঐ গুপ্তচর-বৃত্তিতে ক্ষান্ত নিলাম। ঐ বিবেকের নির্দেশেই।

কিন্তু ওখানেই তো শেষ নয়। কালের বহুচক্র আবার এক পাক ঘুরল। হিটলার আক্রমণ করে রুসল সম্রাজ্যের রাজ্য। যে পথ দিয়ে নেপোলিয়ন সূত্রের মুখে এগিয়েছিল ঠিক সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলল হিটলারের ত্রিশসূত্রীণ বাহিনী। মধ্যে তাদের লক্ষ্য। কমুনিজম-এর নাস্তিক্য উঠেছে তখন। আমার বিবেক আমার পরিচর হতে গেল। আমি স্বেচ্ছায় যোগাযোগ করলাম। সাম্যবাদের এতবড় সর্বনাশ দেখে আমি অবাক চেয়েও এক পা এগিয়ে গেলাম। যেসব অবিকার আমার নয় তাও জানাতে শুরু করলাম ওদের।

এর পরের পর্যায় মার্কিন দুশুকে। স্যার জন কবরকট, চ্যাডউইক, প্রফেসর কার্ল প্রভৃতির সঙ্গে আমারও যোগাযোগ কথা উঠল। আবার সিনিকিউরিটি ক্রিয়ারেশ প্রয়োজন হল। আবার তদন্ত হল। কিছুই পাওয়া গেল না—একমাত্র সেই নাৎসীদের ‘মিথ্যা’ সোভারোপখানা ছাড়া। জাফো ওদের মিথ্যা/বোকা বলে বননাম ছিল। চলে গেলাম আমেরিকায়। প্রথমে শিকাগো, পরে লস অ্যাংলসে। এ ছাড়াও দু-একটি কেন্দ্রে যেতে হয়েছে আমাকে। লস অ্যাংলসে এসে তোমার সাক্ষাৎ পেলাম। তুমি তো অবাক আমাকে দেখে। তার চেয়েও আমি অবাক মিনেস কার্লকে দেখে। তখনও আমি জানতাম না প্রফেসর অটো কার্ল তোমার ‘ড্যাভি’, অ্যালিসের তুমি ছাড়াও নও আসলে।

এর পরের ইতিহাস তোমার জানা। যেটুকু জান না তা এই:

আমার দুই বোন ছিল মনে আছে। ছোট বোন লিজা আত্মহত্যা করে। সে ছিল আর্টিস্ট। তাঁর স্মরণ ছবি ঈকান্ত সে—ওয়টার কলার, অয়েল এবং প্যাস্টেলে। বিয়ে করেছিল একজন রাশিয়ানকে—প্রাণচঞ্চল কৃষ্টিবাক ক্রিটোজিক। ইষ্টাং নাৎসীদের হাতে সে ধরা পড়ে। লিজার সহায়তায় কবী শিবির থেকে শেষ পর্বত ক্রিটোজিক পালিয়ে যায়। সীমান্ত পার হয়ে চলে যায়—চেকোস্ত্রাকিয়ায়। এবার নাৎসীরা অত্যাচার শুরু করল লিজার উপর। লিজা তখন সদ্য জননী। ওর কোলে তার প্রথম সন্তান কন্যা—অর্থীং ববু। মাত্র একমাসের শিশু। তার শরীর খুব দুর্বল। উপায়ান্তরবিহীন হয়ে সন্ধ্যোজাত শিশুকে নিয়ে সে বাবার ওখানে পালিয়ে আসতে চাইল। এই সময় আর একজন কমরেড এসে লিজাকে গোপনে জানিয়ে গেল প্রাণে ক্রিটোজিক ধরা পড়েছে। তাকে নাকি নাৎসীরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। প্রথমে তাঁর উপড়ে নিয়েছিল, তারপর এক একটি করে তার সব দাঁত তুলে ফেলে—পোষে গায়ে পেট্রোল ঢেলে দিয়ে আগুন ছেলে দেয়। লিজা পাগল হয়ে গেল শুনে। আমাদের বংশে সেই প্রথম পাগল হল। আমি তার আগে দেশ ছেড়েছি। দাদাও নিজস্বেশ। দিদি বিয়ে করে আমেরিকায় চলে গেছে। বাবা জেল থেকে সদ্য ছাড়া পেয়েছেন। অগত্যা বাবাকেই যেতে হল—পাগল মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে। উদ্বাস মেয়েকে হাত ধরে নিয়ে আসছিলেন শ্রাবক। কী-একটা স্টেশনে সে ইষ্টাং বাবার হাত ছাড়িয়ে একটা চলন্ত এঞ্জিনের তলায় ঝপিয়ে পড়ে। বাবার কোলে ছিল ববু—এক মাসের শিশু। বাবা কিছুই করতে পারলেন না। তাঁর চোখের সামনেই লিজার দেহটা হ্রাসপিশে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

তুমি হয়তো বলবে: ঈশ্বর কল্যাময়।

বাবাও তাই বলতেন।

সেইসময়ে আমার কথা লিজাকে তুলে শব্দ দেওয়া হয়েছিল। ক্রিটোজিক আদৌ ধরা পড়েনি। সে আজও

\* আসল নামটা ক্লাউস ফুকস কোনদিনই জানতে পারেননি। তার নাম ছিল পতিনোভিচ ক্রোমার। রাশিয়ান। যুদ্ধান্তে সে রাশিয়ার ফিরে যায়।



বহাল ভবিষ্যতে জীবিত। রাশিয়ায়। বিয়ো-থা করেছে, ঘর সংস্কার করেছে। শুনে এবারও কাণ্ড করলেন। ঈর্ষা করণাময়।

মা কিন্তু তা বললেন না। উল্টে এবার তিনি পাগল হয়ে গেলেন। তবে ঈর্ষা করণাময় বলেই বোধকরি তাকে বেশদিন কষ্ট পেতে হয়নি। এবার তিনিও আত্মহত্যা করে বসলেন। ল্যাঠা চুকে গেল।

দাদা নিরুদ্দেশ, আমি পল্যাতক, ক্রিস্টি আমেরিকায়—তা হোক। গোটা পৃথিবীর লোক যখন এইতে পারছেন তখন আর এ শাকের আঁটিটাকে কি আর কাশে নিতে পারবেন না? বৃদ্ধ অ্যাটলাস মানুষ করতে থাকেন মা-হারা বৃক্ষে। আমার কৌতূহল হয় জানতে বল-এর পড়ার টেবিলের উপরও কি বিশ্বজ্ঞানের পুজারী উইলিয়াম টেল-এর সেই চার-লাইনের কবিতাটি উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন? বন্ধ কি মুছে দিয়েছিল। খিটখিট লাইনটা?

কী কথা যেন বলেছিলেন? হ্যাঁ, লস অ্যালামসের কথা। সেখানে মাস ছয়েক কাজ করার পর কদিনের ছুটি নিয়ে আমি চলে গেলাম ম্যাসাচুসেটসে। সেখানে কেমব্রিজে থাকত ক্রিস্টি আর তার স্বামী হেইলমান। ক্রিস্টিকে আমি আগেই স্বপ্ন দিয়েছিলাম। এরপরপোটে ওরা অনায়ে নিতে এসেছিল। এক মার্কিন বন্ধুর বাড়ি নিয়ে। আলাপ হল মার্কিন ভ্রমলোকটির সঙ্গে। বেশ অমৃদে লোক। নাম হ্যারি গোল্ড। দিনসাতক ছিলাম ক্রিস্টির বাড়িতে। ওর মধ্যেই একদিন সুযোগ করে হ্যারি নিরবিদিলে আমাকে বললে, ডক্টর ফুকস্, দীর্ঘদিন তোমার সঙ্গে নিরবিদিলে দুটো কথা বলব বলে সুযোগ ঝুজছি।

আমি অবাক হয়ে বলি, বল কি হে। তোমার সঙ্গে আলাপই তো হয়েছে আজ পাঁচদিন। হ্যারি গোল্ড ঝুঁকে আসে আমার কাছে। প্রায় কানে কানে বলে, আই কাম ফ্রম জুলিয়াস।

—আমি জুলিয়াসের কাছ থেকে এসছি।  
আমার বক্তার মধ্যে একটি শিহরণ খেলে গেল। এটাই ছিল আমাদের সম্বন্ধে। ঐ কোড-ব্র্যাসেজ নিয়েই দীর্ঘদিন পূর্বে অনেককালের আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু সাবধনের মত নেই। হ্যারি গোল্ড আমেরিকান। সে এক, বি. আই. নিযুক্ত কাউন্টার-এসপারভমেন্টের এজেন্ট হতে পারে। আমি ন্যাকা সেজে বলি, তার মানে?

—তার মানে আমার বাড়িতে ওঠ।  
নির্ভয়ে এসে সে অত্যাতি প্রমাণ দাখিল করল। সে দীর্ঘদিন ধরে আমার পিছন পিছন ঘুরছে। রাশিয়ান শুশ্রূষার সহ্য্য কে, জি, বি-র নির্দেশে। আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি। ওরা আমাকে ভোলেগনি। ইতিমধ্যে আমি মানহাটান এজেন্টের অন্যতম মূল খুঁটি হয়েছি। পারমাণবিক বোমার আকার ও আয়তন আমিই কবে বার করেছি। সেটাও বোধহয় কে, জি, বি জানে; কিন্তু লস অ্যালামসের সতর্ক প্রহারা ভিতর কিছুতেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিল না। শুধু আমার জন্যই হ্যারি গোল্ড ক্রিস্টির সঙ্গে বন্ধুত্ব করে অপেক্ষা করে বসে আছে—কবে আমি ওদের ওখানে আসব।

এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। জির হল, চার মাস পরে সাত্তা ফে-তে কাস্টিলো ব্রীজের কাছে আমি গোপন তথ্যটি হস্তান্তরিত করব। হ্যারি নিজে আসবে না। আসবে তার এজেন্ট। তারিখটা স্থির হল এগারই আগস্ট, সময়—সাত্তা ছটা মণ। কোড মেসেজ ঐ একই: আই কাম ফ্রম জুলিয়াস।

তবু সাবধান হইলাম আমি। আমেরা দুজনে বসে কথা বলছিলাম একটি নির্জন পাব-হাউসের একাঙ্গে। মদের বিলটা আমি সু-টুকরো করে একটা টুকরো পাকেটে রাখলাম। হ্যারিকে বললাম—তোমার এজেন্ট যেন এই ব্যক্তি আবখানা কাগজ আমাকে দেখায়। তাহলে নিশ্চিত বুঝতে পারব সে তোমার কাছ থেকেই আসছে। যে রিপোর্টখানা আমি তাকে দেব তার দাম বিলিয়ন ডলারে। আমি একেবারে নিশ্চিত হতে চাই।

—কত বড় হবে তোমার রিপোর্ট।

—অত্যন্ত ছোট। একটি মাইক্রো-ফিল্ম। থাকবে একটি পলমল সিগারেটের প্যাকেটে। মন নিতে শোন: তোমার এজেন্ট যেন অতি অবশ্যই একটা পলমলের ভর্তি সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বাবে তার ডান পাকেটে। আমি আমার প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরে বলব—দেখলাই আছে? সে আমার হাত থেকে প্যাকেটটা নেবে, নিজের পাকেটে ফোকাবে এবং পলমলুতেই তার প্যাকেট আর লাইটার রত

করবে। আমেরা দুজনে দুটি সিগারেট ধরান আর তারপর পরিবর্তিত প্যাকেট নিয়ে আমি নিতে আসব।  
—চমৎকার পরিকল্পনা। সর্বসমক্ষেই ইচ্ছে করলে লেনসেনটা তাহলে হতে পারবে।

—তাই হওয়া ভাল। যত গোপন করতে যাবে ততই ধরা পড়ার ভয়।  
—ঠিক কথা। কিন্তু আর একটা কথা। বিনিময়ে আমরা তোমাকে কী দেব?  
—বিনিময়ে? না কিছু নিতে হবে না।  
—তা কি হয়? জুলিয়াস সেটাও জানতে চেয়েছে।  
—জুলিয়াসকে বল—তারা আমাকে ঝুঁকে বার করেনি, আমি তাদের ধাবস্থ হয়েছিলাম। গরজটা তাদের নয়, আমার। যুব আমি চাই না। নেব না।  
—ঠিক আছে। জুলিয়াসকে বলব।

চার মাস পরে নির্দিষ্ট স্থানে ভিনিফটা পৌছে গিলাম আমি। কী অদ্ভুত ঘটনাচক্র দেখ। ঐ এগারই আগস্টেই বৃদ্ধ শেষ হল। মন কিনবার অফিসায় আমি চলে এলাম লস অ্যালামস থেকে সাত্তা ফে-তে। মনের আসরে যারা উপস্থিত ছিল, তাদের 'আলোবাই' নাকি পাকা, এফ-বি-আই-য়ের ব্যরণা। মূর্খগুলো ভেবে নেবেনি, ঐ মন কিনতে যে সাত্তা ফেতে গিয়েছিল তার দশটা দুয়েকের মত অনুপস্থিতিকালে কেন সাক্ষী নেই।

তুমি বিশ্বাসঘাতককে ধৃণা কর। তাই না রোনটা? আগে আমার কথা সবটা শোন। তার পর আমিও আমাকে ধৃণা কর কি না।

আমি স্বজ্ঞানে খেঁজায় এ-কাজ করেছি। অর্ধের গোতে নয়, ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য নয়। তবে কেন? কেন?

আমেরিকা আজ বিশ্বাসী মনোভাবের একচেটিয়া মালিক। মনোপলি বিনদেশ। পূর্বে তার মাটিতে শা পার না। যতাকে সে নগ্না জ্ঞান করেছে। কিন্তু কে তার হাতে তুলে দিল এই সম্পদ? কারা? তাদের কয়জন আমেরিকান? যে ছয়জন প্রাকযুদ্ধ-যুগে ঐ সত্তাবনার প্রথম পাঁচটি দুর্ভাগ্য সোপান অতিক্রান্ত করেছিলেন তাদের একজনও মার্কিন নন—রাগারফোর্ড, চ্যাডউইক, কুরি-মশ্শতি, ফের্মি আর অটো হান! ইংলন্ড; জার্মানী; ফ্রান্স; ইতালি; আরার জার্মানী। আমেরিকা কই? তারপর দেখ—ঐ পাঁচজনের প্রাথমিক নির্দেশ সঞ্চল করে যে বৈজ্ঞানিক দল হাতে-কলমে পরমাণু বোমাকে বাস্তবায়িত করলেন তাঁরাও অতলান্তিকের এ পারের মানুষ। নীলস বোর, হাল বোথ, জেমস ফ্রান্স, এনরিকো ফের্মি, উরে, এডুইনার্ড, টেইলার, উইগনার, ফন নরমান, কিস্টিন্যাকোভি, রবিনভিচ, ওয়াইসকফ, চ্যাডউইক, ফ্রাউস ফুকস—কই? মার্কিন নাম কৈ? লরেন্স, কম্পটন ইত্যাদি মুষ্টিমেয় কজন সাত্তা বিজ্ঞানী ছাড়া আছেন একমাত্র 'আইম-বোমার জনক' ঐ ওপেনহাইমার। তাঁর অবদানের কথা সৌজন্যবোধে আর নাই বললাম। তাহলে? এ অস্ত্রের উপর আমেরিকার একচ্ছত্র মালিকানা হল কোন যুক্তিতে? যুক্তি একটাই—ক্যাপিটালিস্টের যুক্তি। আমেরিকা টাকা চলেছে। ক্যাপিটাল জুগিয়েছে। ঐসব বিশেষ বৈজ্ঞানিকেরা কারখানা মজদুর বৈ তো নয়? যুক্তিটা তো এই? আমি এই যুক্তি মানতে পারিনি। তুমি পারছো?

খিটখিট। বিশ্বাসঘাতক কে, বা কারা? আমাদের বলা হয়েছিল—জার্মান জুজুর ভয়েই এই বোমা বানানো হচ্ছে। আসলে আমাদের প্রতিযোগী ছিল চারজন জার্মান বৈজ্ঞানিক—অটো হান, ওয়াইৎসেকার, ফন সে আর হাইজেনবের্গ। আমরা, যুরোপবাসীর বিশেষী বিজ্ঞানীরা, কর্তৃপক্ষের মুখের কথায় বিশ্বাস করে প্রাণপাত খেটেছি পুরো ছটি বছর। কারখানা থেকে লভ্যাংশ যখন ঘোষিত হল তখন মিলমালিক মজদুরদের মুখে লাগি মেয়ে গোটা লভ্যাংশটিই পকেটজাত করলেন। এটাম বোমা ফেলা হবে কি হবে না সে বিষয়ে আমাদের আর কথা বলার কোন অধিকার রইল না। এডুইনার্ড মোরে মোরে মাঝে মধ্যে মরে বৃথাই, ফ্রান্স-রিপোর্ট এর স্থান হল টেডা-কাগজের বুড়িতে, প্রফেসর নীলস বোরের মত বিশ্বব্যপ্য বৈজ্ঞানিককে চাটিল মুখের উপর বললে—লোকটা কী বন্ধু? রাজনীতি না পদার্থবিদ্যার কথা?

চুটখুট। আমার দুর্ভাগ্য জাপান যদি এশিয়াবাসী না হত, পীতবর্ণের পণ্ডক জাতি না হত, তাহলে টুয়ান-প্রোভস্-ওপি এভাবে শৈশবিক-উদ্রাসে উদ্বাস হত না। আর বাবা বিশ্বাসঘাতক?



পূজারী—আমি বিশ্বাসমাবাসের। আমি ওদের কথা করতে পারি না।

চতুর্থত। ক্রাইস ফুকস যে অপরাধে বিশ্বাসঘাতক, সে অপরাধে গোজেন্দা কেন বিশ্বাসঘাতক নয়, তা আমাকে বোঝাতে পার? সেও কি গোপন তথ্য শব্দপদ্ধতি কীসে করে দেখনি? অথচ তার তো বিচার হল না? কেন? সে ক্যাপিটালিজম-এর দালাল বলে? এই বোধহয় ওদের আইনের নির্দেশ। হিটলার পরাজিত না হলে—ঐ ন্যূনতমপক্ষে হয়তো বিচার হত গোতস অব টুমানের। আইকম্যানের সঙ্গে ওদের তফাৎ কোথায়?

সবচেয়ে দুঃখ কী জান, রোনটা। এত করেও কিছু হল না। আমার সামের জার্মানী আজ দু টুকরো। বার্লিনের মাথাবান দিয়ে উঠেছে কাঁটা তারের বেড়া। যে জাতিদের রাশিয়ার জন্য কাঁটটা করলাম সেও আজ হিটলার হতে বসেছে। পূর্ব জার্মানী, চোকোত্রোভাকিয়ার দেখেছি তার স্বরূপ। কপিথসা আজ সাইনোবিয়ায় বসে।

"এ আমরা কী করলাম। কমরেড। এ তুমি কী করলে।"

ওরা বলে—বিশ্ব শতাব্দীর 'জুডাস'। বিশ্বাস কর রোনটা—

আমি জুডাস নই, আমি প্রমিথিউস। প্রমিথিউস কে জান? আটলান্স জগৎকে বোকা বইছে মিথিভাবে—কিন্তু প্রমিথিউস হচ্ছে আদিম বিদ্রোহী। স্বর্ণাংশিত 'জিউস'-এর গোপন গুহ থেকে সে চুরি করে এনেছিল অগ্নিশিখা। যে আধুন আসো দেখ, যে আগুন উজ্জ্বল দেখ। মানুষকে কল্যাণে, পৃথিবীকে প্রথম আসোক্তিত করেছিল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়ে যায়। জিউস তাকে পর্বতশৃঙ্গের সঙ্গে শৃঙ্খলিত করে—ইগল পাখি নিয়ে তার যকৃৎ ছিড়ে ছিড়ে ছাড়ায়। আমাকে ভরা অবস্থা ধরতে পারেনি, আমি নিজেই ধরতে পারছি না।

শিখা পাগল হয়ে গিয়েছিল। মাও পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বাস কর রোনটা, আমি কিছু পাগল হইনি। জানি, এ স্বীকারোক্তির পরিণাম কী। প্রমিথিউসের শেষ পরিণাম। না। কৃতকার্যের জন্য আমি নিম্নমাত্র অন্ততঃ নই। যা করেছি সজ্ঞানে, সেস্বায় করেছি—সুযোগ পেলে আবার এ কাজ করবো। বীকার করছি সম্পূর্ণ অন্য কারণে—অনুশোচনায় নয়।

আমার সামনে এখন খোলা আছে দুটি হার পথ। পটাসিয়াম সায়ানাইডের ক্যাপসুল রয়েছে আমার পকেটে। এই স্বাক্ষরাম টেবিলের উপর। ব্যাটা বিচারের প্রহসন করে আমার যকৃৎ ইগল নিয়ে পাওজাবার আদেশ সেবে তারা শুনে বাবুক—অনাগাসে এই মুহুর্তে তাদের হাত এড়িয়ে যেতে পারি আমি। কেন যাচ্ছি না জান? তার দুটি কারণ:

আমি পদার্থ বিজ্ঞানী, কেমিস্ট নই। তাই কে, সি এন-এর চেয়ে কিলো ভোল্টকে আমি বেশি চিনি। ক্যাপসুলের চেয়ে ইলেকট্রিক চেয়ার। সেটাও আসল কথা নয়—আসল কথা এবার চুপি চুপি বলি: শুধু তোমাকেই বলছি।

ইতিমধ্যে আমার অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হয়েছে, জানলে? ডায়ালেকটিকাল মেটেরিয়ালিজম-এ এর ব্যাখ্যা ইচ্ছে পাচ্ছি না। সেটা যে কী, তা এসেব বলতে যাওয়া বুঝা। এরা বুঝবে না। তোমার কাছে তো যাচ্ছি—তোমাকে বলব, বুঝবে তুমি। আর একজন বুঝবেন—তিনি আমার বাবা। সে জন্যই ক্যাপসুলটা আমি মুখে পুরতে পারছি না। আমি নিজের ক্রস নিজের ঠায়ে বইতে চাই যে। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পেয়ে আমি একটি অনুরোধ জানাব। আমার বাবাকে শুধু একবার দেখতে চাই। তাঁকে একটা অনুরোধ করে যাব: আমার সমাধির উপর কবি উইলিয়াম টেল-এর ঐ চারটি লাইন কবিতা কেন তিনি উৎকর্ষ করিয়ে দেন। হ্যা, চারটি লাইনই। প্রথম দুটি সমেত:

চিরউন্নত বিদ্রোহী শির পোড়াবে না কারও পায়ের

তোমারেই শুধু করিব প্রশ্নাম, অন্তরতম প্র।

জীবনের শেষ শোণিতবিন্দু দিয়ে যাব সেশ-ভাইয়ে

বহিবে বিবেক। সে শুধু আমার! বিকাবো না তবে কভু।

তোমার কাছে যাওয়ার সময় হয়ে এল। লর্ড বীসাস। এবার তুমি মেধশিশুর মত আমাকে তোমার বুকে তুলে নাও।

আমেন।

পরিচিতি ক

শেষ কথা

কাহিনীর সমাপ্তি আছে, ইতিহাস খামতে জানে না। আমি এ কাহিনীর যবনিকা টেনেছি 1950-এর গ্রিশে অনুজারি, যেদিন তৎকালিক "বিশ্বাসঘাতক" ডেক্সটার গ্রনামবন্দি দেন। তারপর চলিশবার এই পৃথিবী সূর্যকলঙ্কিত করছে। তাই কথাসাহিত্যের শাতিরে যেখানে গেল, এই তার পত্রের কথা এবার বলি। যা সেদিন ছিল, এখনও গোপন, তার তথ্য জেনে ফেলেছে অদ্ভুত আশ ডজন দেশ। কে কবে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সে তথ্যটা এই সঙ্গে লিখে রাখি।

আমেরিকা—16 জুলাই 1945

ব্রিটেন—15 মার্চ 1957

চীন—16 অক্টোবর 1964

রাশিয়া—23 সেপ্টেম্বর 1949

জাপান 13 ফেব্রুয়ারী 1960

ভারত 18 মে 1974

ভট্টর ফুকস-এর আলম্বা কতদূর বাস্তব তার ইতিহাস সকলেই জানা।

ভট্টর জে ওপেনহাইমারের বিচারের দায় প্রকাশিত হয়েছিল 1958 সালে। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, কিন্তু এ কথাও প্রমাণিত হয় যে তিনি পদমর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করেননি। কৃতঘ্নত্ব, মিথ্যাভাষণ ইত্যাদি অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সরকারী গোপন তথ্যে তাঁর প্রবেশাধিকার প্রত্যাহত হয়। এর পর দীর্ঘ নয় বছর ভট্টর ওপেনহাইমার অস্ত্রবাসীর জীবন যাপন করেন। প্রমাণিত হয়েছিল, মিস ট্যাটলক তাঁর প্রাকবিবাহ জীবনে প্রায়শীতী মাত্র—ট্যাটলকের আত্মহত্যার সঙ্গে ভট্টরর বৃত্তির কোন সম্পর্ক নেই। মৃত্যুর পূর্বে ওপেনহাইমারকে 'এনরিকো ফের্মি অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কার দেওয়া হয়, যার আর্থিক মূল্য পঞ্চাশ হাজার ডলার। তাঁর মৃত্যুর পর প্রফেসর হাফলান শেডেলিয়ার একটি আত্মবীকনী লেখেন, যার উদ্দেশ্য গ্রহণযোগ্যতা করা হয়েছে।

পদমর্যাদা বোমার অপেক্ষা শক্তিশালী মারণাস্ত্র আমেরিকা ও রাশিয়া পর পর আবিষ্কার করে—যার নাম হাইড্রোজেন বোমা অথবা থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা। ডেক্সটারের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য অদ্ভুত সেড় থেকে দু'বছর এগিয়ে আসে। একথা অস্বীকার করা উপায় নেই যে, ঐ তৎকালিক বিশ্বাসঘাতকের জন্য পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম-শক্তির ক্ষমতার সমতা ঘটিত হয়েছিল।

বাস্তব তথ্য থেকে বোঝার কতদূর বিচ্যুত হয়েছি এবার তা স্বীকার করি:

ভট্টর ক্রাইস ফুকস ইংল্যান্ডে এসে যে পরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই পরিবারে যে মেয়েটি ছিল তার নাম 'রোনটা' নাম। সৌজন্যের স্বাক্ষরে নামটা আমি পরিবর্তন করেছি। অনুরূপভাবে হাতওয়েল তিননক্ষর ত্রয়োরে অধিষ্ঠিত ভট্টর ফুকসের উপরওয়েলার নাম প্রফেসর অটো কার্ল নয়। সেই উপরওয়েলার নাম প্রফেসর কলভ সেলস। তাঁর ঠিকার সঙ্গে ফুকসের কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। প্রফেসর অটো কার্ল-এর নামটি কলভিত। ফুকস-এর উপরওয়েলার একজন বৈজ্ঞানিক তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এবং ফুকসকে নিয়ে শারি ও সুইজারল্যান্ডে বেড়াতে এসেছিলেন এ কথা সত্য; কিন্তু পারি হোটেলের অফিসের সেন্সর বসিয়ার কথা বলা হয়েছে তা কল্পনা। বলা বাহুল্য, ঐ প্রফেসরের তরুণী ভায়েক নামও 'রোনটা' ছিল না। এ-ছাড়া মানসিক বিপর্যয়ে মূল অপরাধী একদিন হঠাৎ পানায় উপস্থিত হয়ে স্বতঃপ্রসূতভাবে-জ্ঞানবন্দি নিতে চান এ কথা সত্য; কিন্তু তিনি একটি টেল বেকর্ডার যন্ত্রের সাহায্যে বসে টিউনে স্বর্ণবস্ত্র বাদ্যটিকে উদ্দেশ্য করে তাঁর বক্তব্য রাখেন—এমন কোন নথির নেই।

অপরাধীর প্রত্যাপ ছিল তাঁর মৃত্যুদণ্ড অব্যাহত। সে কথা জেনেই তিনি জ্ঞানবন্দি মিথোছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়নি। বিচারকালে আদালত-কর্তৃক নিবৃত্ত অভিযুক্তের কৌদুলী যুক্তি সেখানে—বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে মৃত্যু সেখানেই প্রযোজ্য সেখানে শব্দপদ্ধতি গোপন সংবাদ নবব্রহ্ম করা হয়। এক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ইস-আর্জিন দলের মিত্রপক্ষ। এই আইনের ঠাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়নি। বিচারক আইনে-নির্দেশিত সর্বোচ্চ শাস্তি দিয়েছিলেন—টোন্স বছর সশ্রম কারাবন্দ। বাস্তবে নয় বছর পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়—বিজ্ঞানজগতে তাঁর দানের কথা শ্রদ্ধা করে।

তৎক্ষণাৎ সদ্যকারামুক্ত অপরোধী পূর্ব জার্মানিতে চলে যান। সেখানে ঊরু অতিকৃষ্ণ ইন্দ্রবিহারী পিতৃদেব তখনও জীবিত ছিলেন। পিতাপুত্রের মিলন হয়েছিল। ঊরু পিতৃদেব সাংবাদিকদের বলেন :

Neither he nor I have ever blamed the British people for his sentence. He endured his fate bravely, with determination and a clear conscience. He said to himself, 'If I don't take this step, the imminent danger to humanity will never cease.' I can only have greatest respect for the decision he took.

পূর্ব-জার্মানীর ড্রেসডেনে ফুক্স নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইনস্টিটিউটের কর্ণওয়াল হন। ১৯৬০ সালে একজন অর্কিন সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তিনি বলেন : আমি যা করেছি তা বিবেকের নির্দেশেই করেছি। অনুগ্রহ অবস্থায় পড়লে আবার আমি তাই করব।



পরিষিষ্ট ৮  
গ্রন্থপঞ্জী

ক্রমিক  
সংখ্যা

1. Alsop, J & S
2. Armine. M
3. Armine. A
4. Bertin. L
5. Boskin. J & Kristy. F
6. Bardley. D
7. Chevalier. H
8. D'abro. A
9. Einstein. A
10. Fermi. E
11. Fuchs. E Pastor
12. Gamow. G
13. Goudsmit. S
14. Grouff. S
15. Harrison. J A
16. Hoover. E J
17. Irvine. Y
18. Jungk. R
19. Moorehead. A
20. Robinovitch. I
21. Rouze. M
22. Do
23. Rozenta. S
24. Smythe. H D
25. U. S. Govt. Publen.
26. Do

গ্রন্থ

- ... We Accuse
- ... The Great Decisions : The Secret History of the Atomic Bombs
- ... Secret
- ... Atom Harvest
- ... The Oppenheimer Affair
- ... No Place to Hide
- ... L' Homme que roulait etre Dieu [The Man Who wanted To Be God]
- ... The Rise of New Physics
- ... The Evolution of Physics
- ... Atoms in the Family
- ... Christ in Catastrophe
- ... Atomic Energy in Cosmic & Human Life
- ... Alsos
- ... Manhattan Project
- ... The Story of Atom
- ... The Crime of the Century (Reader's Digest, June '51)
- ... The German Atom Bomb
- ... Brighter Than A Thousand Suns
- ... The Traitors
- ... Minutes to Midnight
- ... Robert Oppenheimer, the Man
- ... F. Joliot-Curie
- ... Niels Bohr, His Life & Works
- ... Atomic Energy
- ... On the Matter of J. Oppenheimer; transcript of hearing.



13.1.74 যে 'কৈফিয়ত' লিখেছিলাম তা সংশোধনের জন্য পুনরায় কৈফিয়ত লিখতে হচ্ছে বলে আমি আশঙ্কিত। সেদিন যে প্রথম তুলেছিলাম তার জবাব দিয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এ গ্রন্থ ছাপানো থেকে বের হয়ে আসার পূর্বেই।

গত আঠারই মে 1974 সকালে রাজস্থান মকুমুর ভূগর্ভে, একশ মিটার গভীরে ভারত পরীক্ষামূলক ভাবে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ না হ'ক, আপাতত বঠ আসেন অধিকার করেছে। বিস্ফোরণের ক্ষমতা দশ থেকে পনের হাজার টন টি. এন. টি-র সমান। এই বিস্ফোরণের বৈশিষ্ট্য হল—এতে ইমপ্রেশন ডিভাইজ, বা সাদা বাতলার 'অভবিস্ফোরণ শক্তি' কাজে লাগানো হয়েছে। এই সাফল্যের প্রত্যক্ষ নায়ক হচ্ছেন ডঃ সেখনা, ডঃ বামরা এবং ডঃ অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। বলাবাহুল্য, অসংখ্য বিজ্ঞানীর দীর্ঘদিনের অতঃসাহসের ফলশ্রুতি হিসাবেই এ শেষ তিনজন এ কাজে নায়কের ভূমিকায় নেমেছিলেন। সেই তালিকায় সবার আগে যে নামটি স্বর্তব্য তিনি হচ্ছেন ভারতীয় পরমাণু কর্মপ্রচেষ্টার জনক স্বর্গত ডক্টর হোমি জাহাঙ্গির ভাবা। সত্য মোরাবজী টাটা ট্রাস্টের কাছে তিনি বারই মার্চ 1944 তারিখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "যুব বেশি হলেও আজ থেকে দুই দশক পরে ভারতকে আর পরমাণু বিশারদ ঘোজার জন্য বাইরে তাকাতেও হবে না—এদেশের ছেলেরাই তা পারবে।"

আজ শুনে মনে হচ্ছে কথাটা কোন বিশ্বস্ত্রুত বিজ্ঞানীর নয়—বুঝি কোন জ্যোতিষ মহাত্মার। একমাত্র দুঃখ—তিনি এ সাফল্য দেখে যেতে পারলেন না। চকিরশে জানুয়ারি 1966-তে তিনি অমরলোকে চলে গেছেন। বিমান দুর্ঘটনায়।

ডঃ বিক্রম সারাভাইও দুর্ঘটনায় মারা গেলেন তার পাঁচ বছর পরে। কিন্তু কাজ এগিয়ে চলল এসব দুর্ঘটনা সত্ত্বেও। যার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি—আপাতত যা দেখতে পাচ্ছি, এ আঠারই মে 1974 তারিখের ঘটনাটা।

এই সঙ্গে স্মরণ করবো অধ্যাপক ডি. এম. বসু-কেও। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে—পরমাণু বোমার জন্মেরও এক দশক আগে তিনি ঐ শক্তির ব্যবহার নিয়ে মাথা ঘামান। প্রঃ রেখনাম সাহা তাঁর সঙ্গে কথা বলে এর প্রয়োজনীয়তাটা বোঝেন এবং এ দেশে পারমাণবিক গবেষণার আবুনিকীকরণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পদক্ষেপের সূচনা করেন।

এটা প্রমাণ হয়েছে যে, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম। নিঃসন্দেহে এটা বড় রকমের উত্তরণ। এখন আশা করতে ভরসা পাচ্ছি, আমার 'প্রবাসি' নিশ্চয় মোমবাতির আলোয় এ গ্রন্থ পড়বে না।

13. 6. 74



[ বিদেশী স্থান ও ব্যক্তির নাম বাঙলা বদানে আমি যেভাবে লিখেছি, স্বদেশে তা হয়তো সর্বক্ষেত্রে সত্যভাবে উচ্চারণিত হয় না। এজন্য এই তালিকায় রোমান হরফে ঐ বিশেষ্য পদগুলিকে সন্ধান করা গেল। তারকা-চিহ্নিত বিজ্ঞানী নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত। ]

- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| (1) Alamogordo আলামোগোর্ডো            | (31) * Feynman, R ফাইনম্যান        |
| (2) Alms অ্যালমস                      | (32) * Franck, J জেমস ফ্রাঙ্ক      |
| (3) Arnold, Henry হেনরি আর্নল্ড       | (33) Frisch, O ফ্রিশ               |
| (4) * Becquerel বেকারেল               | (34) Fuchs, K ক্লাউস ফুক্স         |
| (5) * Bethe, Hans হান্স বেথে          | (35) Fulton ফাল্টন                 |
| (6) * Bohr, Niels নীলস্ বোহর          | (36) Gamow, G জর্জ গ্যামো          |
| (7) Boltzmann বোল্ৎস্ম্যান            | (37) Gauss, K কার্ল গাউস্          |
| (8) * Born Max ম্যাক্স বর্ন           | (38) Geiger, H হান্স গাইগার        |
| (9) Bush, Vaniver ভ্যানিভার বুষ       | (39) Goettingen, Univ              |
| (10) Bruhat ব্রুহাট                   | গোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়            |
| (11) Cario, G কারিও                   | (40) Goudsmit, S গাউডস্মিট         |
| (12) * Chadwick, James জেমস্ চ্যাডউইক | (41) Gouzenko, J গোজেঙ্কো          |
| (13) Chevalier, H হাবন শেভেলিয়ার     | (42) Groves, L লেনলি গ্রোভস্       |
| (14) Cherwell চেরওয়েল                | (43) * Hahn, O অটো হান             |
| (15) * Cockcroft, Sir J ককক্রফট       | (44) Halban হালবান                 |
| (16) * Compton, Arthar আর্থার কম্পটন  | (45) Hallweck হলওয়েক              |
| (17) Conant, J জেমস্ কনান্ট           | (46) Harwell হারওয়েল              |
| (18) Conel, A J কনেল                  | (47) * Heisenberg হেইসেনবের্গ      |
| (19) * Curie, Irine আইরিন কুরি        | (48) Helmholtz হেল্মহোল্টজ         |
| (20) * Curie, Joliot জোলিও কুরি       | (49) Hilbert, D ডেভিড হিলবার্ট     |
| (21) * Curie, Pierre পিয়ের কুরি      | (50) Hooper, Admiral আডমিরাল হুপার |
| (22) * Curie, Marie মেরি কুরি         | (51) Houtermann হোটেম্যান          |
| (23) Dalber ডালবার                    | (52) Kapitza, Pytr পীতর কাপিৎজা    |
| (24) Dahlem ডাল্হেম                   | (53) Kistiakovosky কিস্তিআকৌস্কি   |
| (25) Democritus ডেমোক্রিটাস           | (54) Klein, F ক্লীন                |
| (26) * Dirac, Paul ডিরাক              | (55) Lansdale, Col ল্যান্ডডেল      |
| (27) * Einstein, A আইনস্টাইন          | (56) * Laue Max V ম্যাক্স লে       |
| (28) Eltenton এলটেন্টন                | (57) * Lawrence, E লরেন্স          |
| (29) Enolay Gay এনোলা গে              | (58) Lomanitz লোমানিটজ্            |
| (30) * Fermi, E ফের্মি                | (59) Manhattan মানহাটান            |
|                                       | (60) Maxwell ম্যাক্সওয়েল          |



(61) Mckilvi ম্যাককিলভি	(78) Sachs. A সাক্স
(62) Meitner মাইটনার	(79) Skardon, W স্কার্ডন
(63) * Nerst, W ওয়ান্টার নেস্ট	(80) Sommerfeld সমারফেল্ড
(64) Neumann, J V ফন নরম্যান	(81) Stimson, H হেনরি স্টিমসন
(65) Nichols, Col নিকলস্	(82) Strassmann স্ট্রাসম্যান
(66) Nishina, Y নিশিনা	(83) Szilard, L লিও শ্জিলার্ড
(67) Noddack, J & W নোডাক	(84) Tatlock, J মিস্ ট্যাটলক
(68) Nordblom নর্ডব্লম	(85) Teller, E টেলার
(69) Nun May, A আনলেন মে	(86) * Thomson, J J টমসন
(70) Oppenheimer, J ওপেনহাইমার	(87) Trinity ট্রিনিটি
(71) Pash, Col কর্শেল প্যাশ	(88) * Urey, H ইউরে
(71) * Planck, M V ম্যাক্স প্লাঙ্ক	(89) Watson, Pa পা ওয়াটসন
(72) Pontecorvo, Bruno ব্রুনো পন্টিকোর্ভো	(90) Weesberg উইস্‌বের্গ
(73) Quakers কোয়েকার্স	(91) Weisskopf ওয়াইস্‌কফ
(74) Rabinowitch, E রোবিনোভিচ্	(92) Wetzaker ওয়াইৎসেকার
(75) * Roentgen, W রনৎজেন	(93) * Wigner, E উইগনার
(76) * Rutherford, Earnor রাদারফোর্ড	(94) Yalta ইয়ালটা
(77) Santa Fe সান্তা ফে	

### কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী ও নির্দেশিকা

[কাহিনীর আকর্ষণে আমাকে কখনো আগের কথা পরে ও পরের কথা আগে বলতে হয়েছে। পাঠক-পাঠিকার যাতে কালস্মৃতি না হয় তাই এই তালিকাটি সাজিয়ে দিলাম। না. সা।]

তারিখ	ঘটনা
1896	রনৎজেন কর্তৃক 'এক্স-রে' আবিষ্কার
1897	বেকারেল কর্তৃক ইউরেনিয়ামে রেডিয়েশন আবিষ্কার
1898	টমসন কর্তৃক ইলেকট্রন আবিষ্কার
1901	প্লাঙ্ক কর্তৃক 'কোয়ান্টাম থিয়োরি'র প্রথম উল্লেখ
1905	আইনস্টাইনের 'স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি'
1910	প্লাঙ্ক ও বোর কর্তৃক এই থিয়োরির ব্যাখ্যা
1918	রাদারফোর্ড কর্তৃক 'প্রোটন' আবিষ্কার
1932	চ্যাডউইক 'নিউট্রনের' অস্তিত্ব প্রমাণ করেন
এ	রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন
এ	হিটলার জার্মানির সর্বময় কর্তা

তারিখ	ঘটনা
1933	মাদাম ক্যুরি ও মাইটনারের মতামত
1934	এনরিকো ফের্মি কর্তৃক ইউরেনিয়াম-পরমাণু বিদ্যুৎ
1934	নোডাক-সম্পত্তি এই পরীক্ষার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন
1934	নীতির কাপিতজা রশিয়ার এসে গৃহবন্দী
1935	জিলার্ড বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাসী বোমার বিরুদ্ধে সাবধান করার চেষ্টা করেন
1935	হান্স বেথে আমেরিকায় চলে আসেন
1938	বার্লিনে পরমাণু-শক্তির সম্মানে সম্মেলন
1938	ফের্মি নোবেল পুরস্কার নিয়ে সোজা আমেরিকায়
22. 12. 1938	অটো হান পরমাণু-বিভাজনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন
2. 8. 1939	আইনস্টাইন রুজভেল্টকে ঐতিহাসিক পত্র লেখেন
2. 9. 1939	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু
11. 9. 1939	বার্লিনে 'ইউরেনিয়াম-প্রকল্প' জন্মলাভ করে
27. 9. 1939	রুজভেল্টের ঐতিহাসিক আদেশ : 'পা দিস্ রিকোয়ার্স অ্যাকশন'
22. 6. 1941	সোভিয়েট জার্মান চুক্তি ভঙ্গ করে জার্মানির রাশিয়া আক্রমণ
7. 12. 1941	জাপান কর্তৃক পার্স হারবার আক্রমণ
8. 12. 1941	অন্ধশক্তির বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা
13. 8. 1942	'মানহাটন-প্রকল্পের' জন্ম
17. 9. 1942	গ্রোভস্ এই প্রকল্পের সর্বময় কর্তা নিযুক্ত
12. 6. 1943	ওপেনহাইমার সানফ্রান্সিস্কোয় মিস্ ট্যাটলকের সঙ্গে সম্মেলনকভাবে সাফাৎ করেন
20. 7. 1943	গ্রোভস্ ওপেনহাইমারকে পাকা নিয়োগপত্র দেন
26. 8. 1944	বোহর রুজভেল্টকে অ্যাটম-বোমার ব্যবহার বিষয়ে সতর্ক করেন
15. 11. 1944	জেনারেল প্যাটন জার্মানির স্টালবের্গ দখল করেন
11. 4. 1945	রুজভেল্টের মৃত্যু
12. 4. 1945	ইউহ্যান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট
25. 4. 1945	ইউহ্যান অ্যাটম-বোমা প্রকল্পের কথা প্রথম শোনে
এ	অ্যাটমিক ইন্টারিম কমিটি গঠন
30. 4. 1945	বার্লিনের পতন ও হিটলারের আত্মহত্যা
জুন, 1945	অ্যাটম-বোমা নিক্ষেপের বিরুদ্ধে 'ফ্রাঙ্ক-রিপোর্ট' দাখিল করা হয়
16. 7. 1945	ট্রিনিটি টেস্টে প্রথম অ্যাটম-বোমার পরীক্ষা
এ	গ্রোভস্ বোমার ইউহ্যানকে এই সংবাদ জানান

## তারিখ

## ঘটনা

17. 7. 1945	পটস্‌ড্যামে চার্লিলকে গোপনে এই সংবাদ জানানো হল
19. 7. 1945	পটস্‌ড্যামে ট্রুম্যান হোস্ট-হিসাবে প্রত্যজ্ঞ দিলেন
21. 7. 1945	এ স্তালিন এ এ এ
23. 7. 1945	এ চার্লিল এ এ এ
24. 7. 1945	ট্রুম্যান স্তালিনকে দ্ব্যর্থ-বোধক ভাষায় অ্যাটম-বোমার ইঙ্গিত দেন
এ	ট্রুম্যান অ্যাটম-বোমা নিক্ষেপের চূড়ান্ত আদেশ দিলেন
26. 7. 1945	মিত্রপক্ষ থেকে জাপানকে শেষ চরমপত্র ঘোষণা
এ	চার্লিল নির্বাচনে পরাজিত, চার্লিলের পদত্যাগ
6. 8. 1945	হিরোসিমায় প্রথম অ্যাটম-বোমার বিস্ফোরণ
9. 8. 1945	নাগাসাকিতে দ্বিতীয় বোমার বিস্ফোরণ
11. 8. 1945	জাপানের আত্মসমর্পণ ঘোষিত
11. 8. 1945	'ডেক্সটার' গোপন নথী 'বেমণ্ড'কে হস্তান্তর করে
6. 9. 1945	গোয়েন্দা কান্ডার কাছে আত্মসমর্পণ করে
15. 9. 1945	ম্যাকলি কিং-এর পরে 'বিশ্বাসবাতকতা'র কথা ট্রুম্যান জানিয়ে পারেন
3. 3. 1946	'অ্যালেক' বরা গড়ে
জুন, 1946	ফুকু হারওয়ার্ডে আসেন
23. 9. 1949	রাশিয়া কর্তৃক পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ
27. 1. 1950	'ডেক্সটার' আত্মসমর্পণ করে ও অবনবদ্বি দেয়
2. 9. 1950	পন্ডিচের্তে হেলসিগি থেকে নিরুদ্দেশ হন
1. 11. 1952	আমেরিকা হাইড্রোজেন বোমা (৩০ লক্ষ টন টি. এন. টি.) বিস্ফোরণ ঘটায়
12. 4. 1954	ওপেনহাইমারের ঐতিহাসিক বিচার শুরু হয়
15. 3. 1957	ব্রিটেন কর্তৃক পরমাণু-বোমার পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত
13. 2. 1960	ফ্রান্স কর্তৃক পরমাণু-বোমার পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত
16. 10. 1964	কম্যুনিষ্ট-চীন কর্তৃক পরমাণু-বোমার পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত
18. 5. 1974	ভারত কর্তৃক পরমাণু-বোমার পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত
13. 5. 1988	দীর্ঘ চক্ৰিশ বছর পর প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী পরপর পাঁচটি
15. 5. 1998	অ্যাটম বোমার পোখরানের ভূগর্ভে বিস্ফোরণ করান। অ্যাটম বোমা ব্যবহারের ক্ষমতাপালী হিসাবে ভারত পঞ্চম রাজ্য বলে স্বীকৃতি পেল



Extracts from an U. N. Radio interview, June 16, 1950; recorded in the study of Prof. Einstein's Princeton, New Jersey, home.

Q. Is it an exaggeration to say that the fate of the world is hanging in the balance?

A. No exaggeration. The fate of humanity is always in the balance...but more truly now than at any known time.

Q. Is it possible to prepare for war and at a world community at the same time?

A. Striving for peace and preparing for war are incompatible with each other, and in our time more so than ever.

Q. Can we prevent war?

A. There is a very simple answer. If we have the courage to decide ourselves for peace, we will have peace.

Q. What is your estimate of the future effects of atomic energy on our civilization in the next ten or twenty years?

A. Not relevant now. The technical possibilities we now have already are satisfactory enough...if the right use would be made of them.

Q. What is your opinion of the profound changes in our living predicted by some scientists...for example, the possibility of our need to work only two hours a day?

A. We are always the same people. There is not really any profound change. It is not so important if we work five hours or two. Our problem is social and economic, at the international level.

Q. United Nations Radio is broadcasting to all the corners of the earth, in twenty-seven languages. Since this is a moment of great danger, what word would you have us broadcast to the peoples of the world?

A. Taken on the whole, I would believe that Gandhi's views were the most enlightened of all the political men in our time. We should strive to do things in his spirit...not to use violence in fighting for our cause, but by non-participation in what we believe is evil.



জাতিপক আইনস্টাইনের ট্রিস্টান-আবাসের প্রবেশদ্বারে ইউনাইটেড নেশন্স-এর বেতার স্যারেনিকের মাধ্যমে প্রকাশিত (জুন 16, 1950)

প্রঃ যদি বলি 'পৃথিবীর ভাগ্য আরও একটি দৃক্ক মুহুর্তে কুলছে', তাহলে সত্যকে কি অতিশয়োক্তি বলা যাবে।

উঃ অস্বীকার। মানুষের ভাগ্য সর্বদা সেই অনিশ্চিত-অবস্থায় আচ্ছন্ন থাকে। ভবিষ্যতের অবস্থা তার কখনো জানি।

প্রঃ আপনি কি মনে করেন যুদ্ধের প্রকৃতি আর বিশ্ব-সংগঠনের জন্য একযোগে চিন্তা করা যায়?

উঃ শান্তির অন্বেষণ আর যুদ্ধের প্রকৃতি পরস্পর-বিপরীত। যুদ্ধের, আতঙ্কের ন্যে সেটা আরও বেশি সত্য।

প্রঃ বিশ্বযুদ্ধকে কি আমরা প্রতিরোধ করতে পারব।

উঃ উত্তরটি সহজ ও সরল। যখনই সাহসিকতার সঙ্গে যদি আমরা কৃতসম্মত হই, তাহলে বিশ্বশান্তি আমাদের কবচ হইবে।

প্রঃ পরমাণবিক শক্তি মনো-সম্পদের কী ক্ষমতার প্রকাশ বিস্তার করতে বলে আপনার ধারণা। নরক আগামী দশ-বিশ বছরে।

উঃ এমন প্রকৃতি অসম্ভব। আমরা আর পর্যন্ত যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার আশীর্বাদ লাভ করেছি তা পর্যাপ্ত-অল্প। যদি তা সত্যকৃত হয়।

— কোন কোন বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, আমাদের জীবনব্যয় প্রকৃত পরিবর্তন আসবে...যেমন-মরুত বৈদিক দুই ঘণ্টার পরিমাণে ভবিষ্যতে কমেই হবে বলে—এ বিষয়ে আপনার কী অভিমত।

উঃ আমরা যা ভিলাম তাই অতি, তাই প্রকৃত। কোন বৈদিক পরিবর্তন হয়েছে বলে তো মনে হয় না। বৈদিক কতকগুলি কাজ করি—দুই বা পাঁচ ঘণ্টা—সেটা কোন বড় কথা নয়। সমস্যাটা সামাজিক এল আর্থনৈতিক—আন্তর্জাতিক বিষয়ে।

প্রঃ ইউনাইটেড নেশন্স বেতার কর্তৃপক্ষ পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে সাতাশটি ভাষায় প্রচারকার্য চালিয়ে থাকেন। আর যেসব মনোবৈজ্ঞানিক এক ভাষার কর্মচারীর লক্ষ্যবিন্দু, তাই জানতে চাইছি—বিশ্বমানবকে আপনি আর কোন দাবী দেখানোর ইচ্ছা।

উঃ সব কিছু বিবেচনা করে আমরা তো মনে করি, আমরা সমাজপীত রাষ্ট্রীয় আর্থনৈতিক নেতৃত্বের দ্বারা একত্বের নিয়ন্ত্রণই প্রচলিত। তিনি হচ্ছেনঃ শান্তি।

উঃ নৈতিক নির্দেশে পরিচালিত হওয়াই আমাদের কর্তব্য—লক্ষ্যে। উপনীত হতে আমরা কিছুতেই হিংস্রতা আরম্ভ নেই না। যা অন্যায়, যা অসৎ তাই বিরুদ্ধে অসহযোগ সংগ্রামই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা।

